FUAD
কিশোর থ্রিলার
সেবা
প্রকাশনা
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ৫২
রকিব হাসান
ANIK

ভলিউম ৫২

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা—
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম

তিন গোয়েন্দা।

আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি—
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ভলিউম-৫২

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী
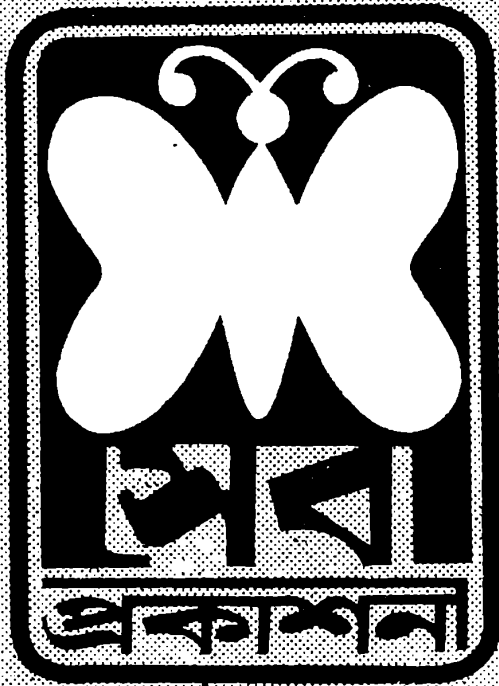
ISBN 984-16-1484-7
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail. Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
Volume-52
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

সেবা
প্রকাশনী

তেত্রিশ টাকা

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১৫ (পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর) ৪১/-
তি. গো. ভ. ১৬ (প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ) ৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৭ (ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ) ৪২/-
তি. গো. ভ. ১৮ (খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড) ৪০/-
তি. গো. ভ. ১৯ (বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ২০ (খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ) ৪১/-
তি. গো. ভ. ২১ (ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার) ৪০/-
তি. গো. ভ. ২২ (চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ২৩ (পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ২৪ (অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ২৫ (জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী) ৪০/-
তি. গো. ভ. ২৬ (ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ২৭ (ঐতিহাসিক দুর্গ, তুষার বন্দি, রাতের আঁধারে) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ২৮ (ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ) ৪৪/-
তি. গো. ভ. ২৯ (আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৩০ (নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মূলা) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩১ (মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৩২ (প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর) ৪২/-
তি. গো. ভ. ৩৩ (শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৪ (যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৫ (নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৩৬ (টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৭ (ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৮ (উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৯ (বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪০ (অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪১ (নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪২ (এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৩ (আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৪ (প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৪৫ (বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৬ (আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা) ৩২/-
তি. গো. ভ. ৪৭ (নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা) ৩২/-
তি. গো. ভ. ৪৮ (হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৯ (মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ) ৩১/-
তি. গো. ভ. ৫০ (কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক) ৩১/-
তি. গো. ভ. ৫১ (পেঁচার ডাক+প্রেতের অভিশাপ+রক্তমাখা ছোরা) ৩২/-

উড়ো চিঠি
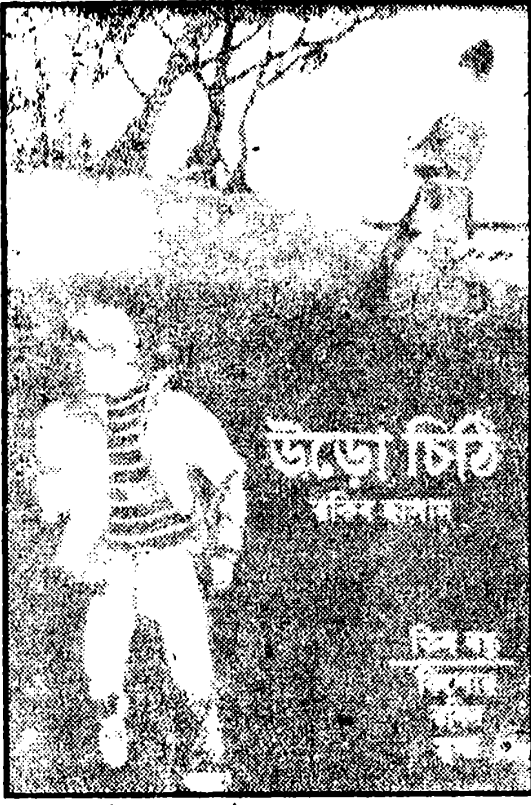
প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

ফারিহার মন বেজায় খারাপ।

প্রায় সাতদিন হতে চলল স্কুল ছুটি হয়েছে, অথচ কিশোরের দেখা নেই। সে এখনও আসছে না।

মুসা আর রবিনেরও ভাল লাগছে না। রোজ ওরা জমায়েত হয় বাগানের কোণের ছাউনিতে। আলাপ-আলোচনা করে। কিন্তু কিশোরকে বাদ দিয়ে কোন কিছুই যেন জমছে না।

রাস্তায় কুকুরের ডাক শোনা গেল। লাফিয়ে উঠল ফারিহা, 'ওই এসে গেছে! নিশ্চয় টিটু!'

দৌড়ে গেটের কাছে এল ওরা।

কোথায় টিটু। অন্য একটা কুকুর।

রাস্তায় লোকজন তেমন নেই। ভ্যান চালিয়ে চলে গেল রুটিওয়ালা। অলস ভঙ্গিতে হেঁটে গেল এক মহিলা। তারপর সাইকেলে চেপে এল সেই অতি পরিচিত মুখটি।

হ্যারিসন ওয়াগনার ফগর‍্যাম্পারকট, ওরফে 'ঝামেলা'। টহলে বেরিয়েছে। ছেলেমেয়েদের দেখেও না দেখার ভান করে পার হয়ে যেতে চাইল।

ডাক দিল মুসা, 'কেমন আছেন, মিস্টার ফগ?'

এই সংক্ষিপ্ত নাম সইতে পারে না কনস্টেবল। গেল রেগে। 'ঝামেলা!' সাইকেল থেকে নেমে বলল, 'ফগর‍্যাম্পারকট!'

'সরি, ফগরম্পারকট।'

'ভাল।' এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বলল ফগ, 'স্কুল ছুটি, না? আরেকজন কোথায়? কোন ঝামেলা-টামেলা করছ না তো?'

তার কথার জবাবেই যেন পাগলের মত ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে মোড় থেকে বেরিয়ে এল আরেকটা সাইকেল। তীব্র গতিতে ছুটে এল।

'মিস্টার ফগ, সরুন, সরে যান!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

টেলিগ্রাফ-বয়ের পোশাক পরা একটা ছেলে সাইকেল নিয়ে এসে হুড়মুড় করে পড়ল ফগের গায়ের ওপর।

চেঁচিয়ে উঠল ফগ, 'অ্যাই, অ্যাই ছেলে! এটা কি হলো!'

'মাপ করবেন, স্যার! দেখতে পাইনি! খুব কি ব্যথা পেয়েছেন?'

ছেলেটার কোমল ব্যবহারে খানিকটা নরম হলো ফগ। জিজ্ঞেস করল, 'টেলিগ্রাম নিয়ে বেরিয়েছ? কোন বাড়ি খুঁজছ?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

পকেট থেকে একটা খাম বের করে ঠিকানা দেখল ছেলেটা। বলল, 'মাস্টার মুসা আমানকে খুঁজছি। টেলিগ্রাম আছে তার।'

'টেলিগ্রাম!' অবাক হয়ে মুসার দিকে তাকাল ফারিহা, 'তোমার নামে টেলিগ্রাম!'

রাস্তার কিনারে উঁচু হয়ে থাকা ফুটপাতের কিনারে সাইকেলের প্যাডাল ঠেকিয়ে সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রাখতে গেল ছেলেটা। ঠিকমত রাখা হলো না। সে ঘুরতে না ঘুরতেই পড়ে গেল ওটা। হ্যান্ডেলের বাড়ি লাগল ফগের হাঁটুর নিচে।

'বাবাগো, মেরে ফেলেছে!' বলে বিকট চিৎকার করে উঠল ফগ।

হেসে উঠেই মুখে হাত চাপা দিল ফারিহা।

'ইস্, কি কাণ্ড! আমার আর আক্কেল হবে না!' বলতে লাগল ছেলেটা। 'দেখি দেখি কতটা লেগেছে! রাগ করবেন না, স্যার, প্লীজ! আমাকে মাপ করে দিন! অফিসে রিপোর্ট করবেন না!'

ফগের লাল মুখ আরও লাল হয়ে গেছে। ছেলেটার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে, হাঁটুর নিচে ডলতে ডলতে ধমক দিয়ে বলল, 'যার টেলিগ্রাম তাকে দিয়ে ভাগো এখান থেকে। যত্তসব ঝামেলা! পোস্টাফিসের সময় নষ্ট করছ!'

'হ্যাঁ, স্যার, তাই যাচ্ছি,' তাড়াতাড়ি বলল ছেলেটা। 'তাহলে মাস্টার মুসা আমান...'

'আমি,' হাত বাড়াল মুসা।

খামটা দেয়া হলো তার হাতে। খামের মুখ ছিঁড়ে ভেতরের কাগজটা বের করল সে। কিশোরের টেলিগ্রাম। জোরে জোরে পড়ল:

> এই ছুটিতে তোমাদের সঙ্গে দেখা
> হবে না, দুঃখিত। হিংকিটিটিংফিং যাচ্ছি
> আমি একটা রহস্যের সমাধান করতে।
> শুভেচ্ছা। কিশোর পাশা।

টেলিগ্রামটা দেখার জন্যে দু-দিক থেকে চেপে এল রবিন আর ফারিহা। কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না, নিজের চোখে দেখতে চায়।

ফগও বিশ্বাস করতে পারল না। হাত বাড়াল, 'দেখি?' প্রায় জোর করেই মুসার হাত থেকে কাগজটা নিল সে।

'সেই মোটকা ছেলেটা পাঠিয়েছে, না?' বলেই ঝট করে টেলিগ্রাফ-বয়ের দিকে তাকাল সে, কিছু মনে করল কিনা দেখল, কারণ এই ছেলেটাও মোটা। 'কিন্তু হিংকি...হিংকি...জীবনেও শুনিনি নামটা!'

'জায়গাটা চীন দেশে,' তাকে অবাক করে দিয়ে বলল টেলিগ্রাফ-বয়। 'আমার এক চাচা থাকে ওখানে। সে-জন্যেই জানি।'

'কিশোর গেল ওরকম একটা জায়গায়!' এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন।

ককিয়ে উঠল ফারিহা, 'এই ছুটিতে আর ওর দেখা পাব না!'

'ভালই হয়েছে,' সন্তুষ্ট চিত্তে টেলিগ্রামটা মুসাকে ফেরত দিয়ে বলল ফগ, 'ঝামেলা থেকে বাঁচা যাবে। এসেই তো খালি যন্ত্রণা। এটাতে নাক গলানো, ওটাতে নাক গলানো, ঝামেলা ছাড়া আর কিচ্ছু করে না। থাক ওখানেই। হিংকি...হিংকি...কি যেন নাম?'

'হিংকিটিটিটিংফিং,' বলে দিল টেলিগ্রাফ-বয়। 'যে পাঠিয়েছে তার কথা আমি শুনেছি। মিস্টার পাশা, খুব বুদ্ধিমান লোক।'

'মিস্টার?' ভুরু কুঁচকে ফেলল ফগ। 'ও তো একটা ছেলে, মিস্টার হলো কি করে? মাস্টার বলতে পারো। ঝামেলা!'

'বার বার ঝামেলা ঝামেলা করেন কেন আপনি, স্যার? মুদ্রাদোষ?' নিরীহ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল টেলিগ্রাফ-বয়।

হেসে ফেলল ফারিহা।

আবার লাল হয়ে গেল ফগের মুখ। কটমট করে তাকাল।

'সরি, স্যার। খারাপ কিছু বলে ফেললাম? তবে যা-ই বলেন, স্যার, কিশোর পাশা বুদ্ধিমান ছেলে। গত বছর দুর্দান্ত একটা রহস্যের সমাধান করেছিল, পুলিশ কিছু করতে পারার আগেই। তাই না?'

কিশোরের সুখ্যাতি শুনতে ভাল লাগল না ফগের। নাক কুঁচকে ঘোঁৎ করে উঠল। 'গল্প করার চেয়ে কাজ করো গে। পোস্টাফিসের সময় নষ্ট করছ।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, স্যার। যাচ্ছি। আচ্ছা, স্যার, আপনার কি মনে হয় হিংকিটিটিটিংফিঙে গিয়ে পুলিশের আগেই রহস্যটার সমাধান করতে পারবে কিশোর?'

'যাও!'

আর দাঁড়ানোর সাহস পেল না টেলিগ্রাফ-বয়। তাড়াতাড়ি সাইকেলে চেপে চলে গেল।

সেদিকে তাকিয়ে কিশোর গোয়েন্দাদের খোঁচা দিয়ে বলল ফগ, 'খুব ভাল ছেলে। বড়দের কথা শোনে। যারা এখনও ভাল হতে পারেনি, ওর কাছ থেকে তাদের শিক্ষা নেয়া উচিত।'

সে-ও সাইকেলে চেপে চলে গেল।

টেলিগ্রামটার দিকে তাকিয়ে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে মুসা বলল, 'কিশোরের ভাগ্যটাই ভাল। তার চাচা-চাচী কিচ্ছু বলে না। আমার মা কোনদিনও একা আমাকে চীন দেশে যেতে দেবে না।'

মুখ-চোখ করুণ করে ফারিহা বলল, 'কিন্তু তাকে ছাড়া যে আমাদের ছুটিটাই মাটি! কোন রহস্যের আর সমাধান করা হলো না এবার!'

'আরে দূর!' হাত নেড়ে বলল মুসা, 'একজন মানুষ না থাকলে কি হলো? রহস্য পেলে তার সমাধান আমরাই করব।'

বলল বটে, কিন্তু রবিন আর ফারিহার মত সে-ও জানে, ওই একজন মানুষ না থাকলেই অনেক কিছু এসে যায়। কিশোরকে বাদ দিয়ে কোন রহস্য ওরা ভেদ করতে পারবে না।

মন খারাপ করে ছাউনিতে ফিরল তিনজনে। কিশোরের হিংকিটিটিংফিং যাওয়া নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

এই সময় আবার শোনা গেল কুকুরের ডাক।

দুই

ডাকটা পরিচিত লাগল ফারিহার কাছে।

টিটু মনে করে আবার ছুটে বেরোল সে। গেটের দিকে তাকিয়েই চিৎকার করে উঠল, 'মুসা,' রবিন, দেখে যাও! টিটু!'

অন্য দু-জনও বেরিয়ে এল। বন্ধ পাল্লার ওপাশে নাচানাচি করছে আর 'খাউ! খাউ!' করছে টিটু।

একটা মুহূর্ত অবাক বিস্ময়ে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। তারপর দিল দৌড়। বুঝতে পারছে না, কিশোরকে বাদ দিয়ে টিটু এল কি করে?

গেট খুলে দিল মুসা।

ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়ল টিটু। কোলে তুলে নিল ওকে ফারিহা। সবাই তাকাল রাস্তার দিকে।

আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে। হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে টেলিগ্রাফ-বয় ছেলেটা। এগিয়ে এল।

'তুমি!' একসঙ্গে প্রশ্ন করল মুসা আর রবিন।

রবিন জানতে চাইল, 'টিটুকে পেলে কোথায়?'

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'ওকেও তোমার কাছে টেলিগ্রাম করে পাঠিয়েছে নাকি কিশোর?'

জবাব দিল না ছেলেটা। ওদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

সবার আগে বুঝে ফেলল ফারিহা। চিৎকার করে বলল, 'কিশোর, তুমি! ওহ্, কি বোকা আমরা! একেবারে চিনতে পারিনি!'

হাঁ হয়ে গেল মুসা। নিচের চোয়াল এতখানি ঝুলে পড়ল, খসে পড়ে যাবে যেন।

কিশোরের কাঁধে থাবা মেরে রবিন বলল, 'আচ্ছা বোকা বানিয়েছ আমাদের। ওই পুলিশটাকেও হাবা বানিয়ে ছেড়েছ। কিশোর, তুমি একটা জিনিয়াস!'

বাগানে ঢুকল কিশোর। রাস্তার দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিল কেউ চোখ রাখছে কিনা। টান দিয়ে খুলে ফেলল একটা পুরু ভুরু। কপালের ওপর থেকে পরচুলাটা সামান্য সরাতেই অন্যেরা দেখতে পেল নিচের কালো কোঁকড়া চুল।

'দুর্দান্ত ছদ্মবেশ নিয়েছ!' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল মুসা। 'একটুও চেনা যায়নি। কিন্তু ঠোঁটের কোণ ঝোলানো, চোখ ছোট ছোট করা, কণ্ঠস্বর বদলে ফেলা, এ সব করলে কি ভাবে?'

'ওটা অভিনয়। তোমাদের তো বলেছিই ছোটবেলায় টিভিতে অভিনয় করেছি

আমি।'

'অভিনয়ও তুমি খুব ভাল পারো,' রবিন বলল। 'কবে এসেছ?'

'আজকেই।'

কথা বলতে বলতে ছাউনির দিকে এগোল ওরা। কিশোরকে পেয়ে সবাই খুশি। বিমর্ষ ভাব দূর হয়ে গেছে।

ফগকে কি ভাবে হেনস্তা করেছে সেটা নিয়ে খুব একচোট হাসাহাসি করল ওরা।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'হিংকিটিটিটিংফিং নামটা জানলে কি করে? ম্যাপ দেখে বের করেছ?'

'নাহ,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'বানিয়ে লিখে দিয়েছি। পোস্ট অফিসের একটা পুরানো খাম জোগাড় করে তাতে ভরে নিয়ে এসেছিলাম টেলিগ্রামটা।'

হাসতে লাগল ফারিহা। 'এ সব উদ্ভট নাম তোমার মাথায় আসে কি করে? ফগ তো উচ্চারণই করতে পারল না।'

ছাউনিতে ঢুকল ওরা।

বাক্সের ওপর বসে কিশোর বলল, 'হ্যাঁ, এবার বলো, কোন রহস্য-টহস্য পেয়েছ নাকি?'

'না, পাইনি,' মুসা বলল। 'ভাবসাব যা দেখছি, এই ছুটিতে পাব বলেও মনে হচ্ছে না।'

'রহস্য কখন এসে হাজির হয়, কেউ বলতে পারে না,' উৎসাহ দিল কিশোর। 'চোখকান খোলা রাখতে হবে আমাদের। কিছু একটা পেলেই গপ্ করে ধরব।'

আরও এক হপ্তা পেরিয়ে গেল। আবহাওয়া ভাল না। মেঘলা থাকে আকাশ, যখন তখন ঝুরঝুর করে বৃষ্টি নামে। প্যাচপেচে কাদা। বাইরে বেরিয়ে আরাম নেই। ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে হচ্ছে ওদের।

মুসাদের বাড়িতেই সময় কাটায় কিশোর আর রবিন।

একদিন মুসা প্রস্তাব দিল, নাটক করবে। অন্যদেরও আপত্তি নেই। অভিনয় করতে গিয়ে এমনই চিৎকার শুরু করল সে, ছুটে এলেন তার মা।

'এই, কি হয়েছে! এত চেঁচামেচি কিসের?'

'কিছু না, মা,' গায়ে জড়ানো লাল কাপড়টা তাড়াতাড়ি খুলতে খুলতে জবাব দিল মুসা, 'নাটকে অভিনয় করছি। রোম সম্রাট সেজেছি আমি। গোলামদের কাজ করার আদেশ দিচ্ছি।'

মুসার হাতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস আমান, 'এই লাল চাদর পেলি কোথায়? মিসেস বিনেরটা নয় তো?'

'হ্যাঁ, তারই। ভাবলাম, কিছু মনে করবে না…'

কয়েক মাস হলো এসেছে মিসেস বিন। বাড়িঘর দেখাশোনা আর বাবুর্চির কাজ করে। আগে এ কাজ যে করত সে অসুস্থ, হাসপাতালে। মিসেস বিন খুব ভাল রাঁধে, কিন্তু ভীষণ বদমেজাজী। ছোটদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তার লেগেই

আছে।

'এক্ষুণি গিয়ে রেখে আয় যেখান থেকে এনেছিস,' ধমক দিয়ে বললেন মিসেস আমান।

মুখ কাঁচুমাচু করে বেরিয়ে গেল মুসা।

খানিক পর ফিরে এসে বসে রইল গুম হয়ে।

ফারিহা বলল, 'এই মহিলাটার ব্যাপারে কিছু করা দরকার।'

'কি করবে?' রবিন বলল। 'আমি তো কোন দোষ দেখি না। আমরা বিরক্ত করি বলেই রাগ করেন। ওটা সবাই করবে।'

'কিন্তু লিলি তাকে ভয় পায়।'

লিলি হলো মিসেস বিনের সহকারী। নানা কাজ করে। বললেই করে, কোন কাজে না করে না। খুব লাজুক।

'তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল মিসেস জারগন,' মুসা বলল। 'রান্নাঘরে ঢুকলে একটা না একটা কিছু হাতে ধরিয়ে দেবেই।'

'কিন্তু সে তো আসে মাত্র দু-দিন,' ফারিহা বলল।

'মিসেস বিনের বদলে মিসেস জারগনকে সব সময়ের জন্যে রেখে দিলে মা ভাল করত।'

এ সব কথায় বিশেষ আগ্রহ নেই কিশোরের। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অলস ভঙ্গিতে হাই তুলে বলল, 'আবার নেমেছে বৃষ্টি। দূর, আর ভাল্লাগে না!'

'একটা কিছু করা দরকার,' রবিন বলল। 'রহস্য ছাড়া আর চলছে না। আমরা বিরক্ত হচ্ছি, ঝামেলা র‍্যাম্পারকট ওদিকে খুশি হচ্ছে, আমরা করার কিছু পাচ্ছি না বলে।'

'সুতরাং তাকে খুশি হতে দেয়া চলবে না,' মুসা বলল। 'চলো, বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়ি।'

ম্যাকিনটশ গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। রহস্য খুঁজতে গেল একটা পোড়ো বাড়িতে। অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এল একজন ভবঘুরে, পিলে চমকে দিল ওদের।

তবে লোকটার মধ্যে, কিংবা বাড়িটাতে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেল না ওরা।

খোঁজাখুঁজি করে হতাশ হয়ে যার যার বাড়ি ফিরে গেল।

মেজাজ খারাপ করে বাড়িতে ঢুকল মুসা। খেপা হয়ে গেছে যেন। ঠিক করেছে এখন মা কোন কথা বললে তার সঙ্গেও ঝগড়া বাধাবে।

কিন্তু সেটা করতে হলো না। পাশের বাড়িতে চায়ের দাওয়াতে গেছেন মিসেস আমান।

চা খেয়ে একা একা ড্রইং রুমে এসে বসল মুসা আর ফারিহা।

ফারিহা প্রস্তাব দিল, 'বসে না থেকে এসো খেলি। লিলিকে ডাকি, কি বলো?'

'মন্দ হয় না,' মুসা বলল।

খুশি হয়েই খেলতে এল লিলি। বয়েস উনিশ, কালো চুল, মোটামুটি আকর্ষণীয়

চেহারার গোবেচারা একটা মেয়ে।

অনেকক্ষণ খেলার পর ফারিহাকে বলল, 'তোমার খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়োগে। বেশি রাত করলে তোমার খালা এসে বকবেন।'

'বকুক!'

এত তাড়াতাড়ি বিছানায় যাওয়ার ইচ্ছে নেই ফারিহার। কিন্তু খালা, অর্থাৎ মুসার আম্মাকে ভীষণ ভয় পায় সে। বসে থাকার সাহস হলো না আর।

খাওয়ার পর নিজের ঘরে ঢুকল মুসা। আকাশের ওপর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। মেঘ করে আছে এখনও, তবে বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে।

তিন

পরদিন সকালে আর বৃষ্টি নামল না।

মুসাদের বাড়িতে হাজির হলো কিশোর আর রবিন।

রবিন বলল, 'চলো বেরিয়ে পড়ি। সঙ্গে খাবার নেব। দুপুরে আর ফিরব না। দূরে কোথাও চলে যাব। কি বলো?'

সবাই রাজি। ঘরে থাকতে থাকতে শরীর পচে গেছে যেন।

'কিন্তু খালা আমাকে দূরে যেতে দিতে রাজি হবে কিনা কে জানে,' ফারিহা বলল। 'গত বছর তো দেয়নি। বলে আমি খুব ছোট।'

'জিজ্ঞেস করে দেখো,' টিটুর ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে বলল কিশোর। 'মুসা, লিলির কি হয়েছে?'

'কি আবার হবে? কিছু না।'

'আসার সময় দেখলাম। মনে হলো কাঁদছে।'

'কাঁদবে কেন? কাল রাতেও তো ভাল ছিল। আমাদের সঙ্গে খেলেছে। হাসাহাসি করেছে। হয়তো মিসেস বিন বকেছে।'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'বরং দেখলাম বোঝাচ্ছে লিলিকে। নরম গলায় কথা বলছে।'

আর বসে থাকতে পারল না ফারিহা। লিলিকে সে পছন্দ করে। হলঘরে এসে দেখল, মেঝে মুছছে মেয়েটা।

'কি হয়েছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল ফারিহা। 'কাঁদছ কেন? কেউ বকেছে?'

'কই, না তো,' হাসার চেষ্টা করল লিলি। 'বকবে কেন?'

সন্দেহ ফুটল ফারিহার চোখে। কিছু একটা ঘটেছে লিলির, চোখ দেখেই বোঝা যায়। কেঁদে কেঁদে লাল করে ফেলেছে।

'খারাপ খবর-টবর পেয়েছ?'

'না। তুমি যাও। আমাকে কাজ করতে দাও।'

অন্যদের কাছে ফিরে এল ফারিহা। জানাল, 'লিলি কেঁদেছে ঠিকই। কেন, বলতে চাইছে না। আমাকে ভাগিয়ে দিল।'

'কেউ কিছু বলতে না চাইলে জোর করে তো আর বলানো যাবে না,' রবিন বলল। 'থাক সে তার মত। আমাদের কাজ আমরা করি। মুসা, তোমার আম্মাকে জিজ্ঞেস করে দেখো, যেতে দেবেন কিনা।'

সারা দিনের জন্যে বেরিয়ে যাচ্ছে ছেলেমেয়েরা, শুনে যেন খুশিই হলেন মিসেস আমান। মুসাকে বললেন, 'গেলে যা। আমিই বরং যাওয়ার কথা বলতে যাচ্ছিলাম। খাবার প্যাকেট করে দিচ্ছি, নিয়ে যা। দুপুরেও আসার দরকার নেই। আমার জরুরী কাজ আছে। অসময়ে এসে বিরক্ত করবি না।'

ফারিহাকেও যেতে দিতে রাজি হলেন তিনি।

ফিরে এল মুসা। বন্ধুদের জানাল সব কথা। বলল, 'মনে হলো আমাদের তাড়াতে চাইছে মা। না যেতে চাইলে জোর করে বের করে দিত, এমনি ভাবসাব। ব্যাপারটা বুঝলাম না। এমন কি জরুরী কাজ?'

'হয়তো আলমারি ঝাড়া দেবে,' ফারিহা অনুমান করল। 'আমরা থাকলে কাজের অসুবিধে করতে পারি, তাই বিদেয় করছে।'

সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। কিশোরের সাইকেলের বাস্কেটে বসে আছে টিটু। পিকনিক তার খুব ভাল লাগে। পিকনিক হলে বনের মধ্যে যাওয়া যায়। আর বন মানেই অগুনতি খরগোশ।

দিনটা সুন্দর। বাতাস উষ্ণ। চমৎকার রোদ। বনে নানা রকম ফুল ফুটেছে। এক ধরনের নীল বুনো ছোট ছোট ফুল যেন বিছিয়ে আছে ঘাসের মধ্যে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় নীল কার্পেট পেতে দেয়া হয়েছে।

হাসি আনন্দে কেটে গেল দিনটা।

এবার বাড়ি ফেরার পালা।

সন্ধ্যা হতে দেরি নেই। গ্রামের গির্জাটার কাছে এসে বিদায় নিয়ে তার বাড়ির দিকে চলে গেল কিশোর। টিটু সাইকেলের বাস্কেটে বসে আছে চুপচাপ। দিনটা এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল বলে যেন দুঃখ হচ্ছে তার। আর কিছুদূর এগিয়ে রবিনও চলে গেল। ফারিহাকে নিয়ে মুসা চলল নিজেদের বাড়িতে।

এতদূর সাইকেল চালিয়ে এসে গলা শুকিয়ে গেছে মুসার। বরফ দেয়া এক গেলাস শরবত পেলে মন্দ হয় না। লিলিকে বললে বানিয়ে দেবে। সাইকেল রেখে ঘরে ঢুকে রান্নাঘরের দিকে এগোল। ফারিহা চলল পেছনে।

রান্নাঘরে নেই লিলি। নিচতলার কোন ঘরেই নেই। ওপরতলায়ও পাওয়া গেল না। শেষে গলা চড়িয়ে ডাক দিল তাকে মুসা।

সাড়া দিলেন মিসেস আমান। মুসাকে ডাকলেন।

'দিনটা কেমন কাটালি?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

অবাক হলো মুসা। মা সাধারণত এমন ব্যবহার করে না। বিশেষ করে পিকনিক করে এলে। মায়ের কাছে ওটা অকারণ সময় নষ্ট। জবাব দিল, 'ভাল।'

'লিলিকে কি দরকার?'

'শরবত বানিয়ে দিত। গলাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে।'

'শরবত বানানো আর কি এমন কঠিন কাজ। নিজেই বানিয়ে নে গে না।'

'আচ্ছা,' বলে আবার রান্নাঘরে চলল মুসা। এককোণে বসে আছে মিসেস বিন। সোয়েটার বুনছে। একটু আগে লিলিকে খুঁজতে যখন ঢুকেছিল, তখন ছিল না। বোধহয় বাথরুম-টাথরুমে গিয়েছিল। মাথা ঘামাল না মুসা। মা যখন ফ্রিজ ধরার অনুমতি দিয়ে দিয়েছে, মিসেস বিনকে আর কেয়ার করে না।

'কি চাই?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল মুসা।

'শরবত। না না, আপনাকে বানিয়ে দিতে বলব না। লিলি থাকলে তাকে বলতাম। আমরাই বানিয়ে নিচ্ছি।'

'থাক, তোমাকে আর সব তছনছ করতে হবে না। আমি বানিয়ে দিচ্ছি।'

'লিলি কোথায়?' ফারিহা জানতে চাইল।

'বাইরে গেছে।' দুটো গেলাস নামাল মিসেস বিন।

'আজ তো বাইরে যাওয়ার দিন নয়?' মুসা বলল।

'কিন্তু গেছে।' ফ্রিজের ডালা খুলে বরফের টুকরো বের করতে লাগল মিসেস বিন।

শরবত বানাতে সময় লাগল না। গেলাস দুটো দু-জনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নীরবে আবার ঘরের কোণে ফিরে গেল সে।

মিসেস বিনকে ধন্যবাদ দিয়ে গেলাস দুটো নিয়ে নিজেদের ঘরে রওনা হলো দু-জনে, আরাম করে খাওয়ার জন্যে।

'লিলির ব্যাপারে মুখ খুলল না কেন মিসেস বিন?' নিজেকেই প্রশ্ন করল মুসা। 'এড়িয়ে গেল মনে হলো।'

ফারিহা বলল, 'মিসেস বিনের অত্যাচারে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যায়নি তো?'

থমকে দাঁড়াল মুসা। 'ভাল কথা বলেছ। চলো, শরবতটা খেয়ে লিলির ঘরে গিয়ে দেখি কাপড়-চোপড়গুলো আছে কিনা।'

ওপরতলায় এসে ঘরটার দরজা খোলা পাওয়া গেল। তালা লাগানো নেই। ঠেলা দিতে খুলে গেল।

হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওরা। একটা জিনিসও নেই। সব নিয়ে গেছে। তারমানে চলেই গেছে লিলি। আর আসবে না।

'হ্যাঁ, চলে গেছে,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল ফারিহা। 'কিন্তু সে যে চলে যাবে আমাদের বলল না কেন? খালাও কিছু বলল না। মিসেস বিনও না। রহস্যটা কি?'

'অবাকই লাগছে। চুরি-টুরি কিছু করেনি তো, যার জন্যে মা তাড়িয়ে দিয়েছে?' নিজেই প্রশ্নের জবাব দিল, 'না, আমার মনে হয় না। ও খুব ভাল। চোর হতে পারে না।'

'খালাকে জিজ্ঞেস করব, এসো।'

বসার ঘরে এল দু-জনে। মিসেস আমান নেই সেখানে। স্টাডিতে এল ওরা। সেখানেও নেই তিনি। বেরোতে যাবে, হঠাৎ মুসার চোখে পড়ল জিনিসটা।

চেয়ারের ওপর পড়ে আছে বড় একটা কালো উলের দস্তানা।

'কার ওটা?' ফারিহাও দেখেছে। 'এ বাড়ির কারও নয়।'

দস্তানার তালুতে লাল সুতো দিয়ে একটা নাম লেখা। নামটা সাংঘাতিক অবাক করল ওদের—

ফগর‍্যাম্পারকট

'ফগ!' নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। 'ওই লোক এখানে কি করছিল? মা'র জরুরী কাজটা এখন আন্দাজ করতে পারছি কিছুটা। ফগের সঙ্গে কথা বলেছে। কি কথা?'

উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে ফারিহা। ককিয়ে উঠল, 'আমি জানি কি কথা! লিলিকে ধরে নিয়ে গেছে! জেলে দেবে!'

'চুপ! আস্তে! মা শুনতে পাবে!'

চেচামেচি শুনে দরজায় উঁকি দিলেন মিসেস আমান। 'কি হয়েছে? মুসা, ওকে মেরেছিস নাকি?'

'না, মারব কেন শুধু শুধু। মা, ফগ এসে লিলিকে ধরে নিয়ে গেছে, তাই না? কি করেছিল ও? চুরি করেছিল?'

'না।'

'তাহলে ফগ এসেছিল কেন? লিলিই বা বাড়ি নেই কেন?'

'ফগ এসেছিল জানলি কি করে?' কিছুটা অবাকই হলেন মিসেস আমান।

দস্তানাটা দেখাল মুসা, 'এটা দেখে। নিশ্চয় ভুলে ফেলে গেছে।'

'লিলিকে নিয়ে যায়নি। এমন একটা ঘটনা ঘটেছে, মুষড়ে পড়েছিল বেচারী মেয়েটা। তাই ওকে ওর খালার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'ফগ এসেছিল কেন?'

'সেটা তোর জানার দরকার নেই,' বদলে গেল মিসেস আমানের চেহারা, কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে উঠল। 'অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবি না। সব কিছুতে রহস্য খুঁজবি না, গোয়েন্দাগিরির দরকার নেই।'

'তারমানে রহস্য একটা আছে!' বলে ফেলল ফারিহা। 'খালা, ফগ ওটা সমাধানের চেষ্টা করছে, না?'

'বললাম না, তোদের জানার দরকার নেই। তোর খালু আর আমি আজ একটা ব্যাপার নিয়ে মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকটের সঙ্গে আলোচনা করেছি। ব্যস। এর বেশি আর জানতে হবে না।'

'আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে এসেছিল?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'তা করবে কেন? কিছু করেছিস নাকি?'

'না না, কিছু করিনি। আমাদের দেখতে পারে না তো, তাই...'

'পারবে কি করে? বড়দের কাজে ছোটদের এত নাক গলানো কেউ পছন্দ করে না।'

মিসেস আমান চলে গেলেন।

দস্তানাটায় হাত ঢোকাল মুসা। 'কত্তো বড় হাতরে বাবা!' ফারিহার দিকে তাকাল। 'কেন এসেছিল ও, আন্দাজ করতে পারো?'

'না। তবে আমার মনে হয় লিলির ব্যাপারেই কিছু। কিশোরকে জানানো দরকার। কি করতে হবে, সে-ই বলবে আমাদের।'

রাত হয়ে গেছে। যাওয়ার সময় আর নেই। পরদিন সকালের জন্যে অপেক্ষা করতেই হবে।

চার

পরদিন সকালে রবিনকে তাদের বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে কিশোরদের ওখানে চলে এল ফারিহা আর মুসা। সব কথা জানাল।

শুনে নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন কয়েকবার চিমটি কাটল কিশোর। তারপর বলল, 'রহস্যটা লিলিকে নিয়েই, আমি শিওর। আশ্চর্য! আমাদের নাকের নিচে এ রকম একটা কাণ্ড ঘটে গেল, আর ঘটার আগে কিছুই জানতে পারলাম না!'

'পারলাম না আর কোথায়? জানতে একটু দেরি হলো আরকি,' রবিন বলল। 'এখন কাজ শুরু করে দেয়া দরকার। কি করব?'

'মুসার আম্মার কাছে গিয়ে লাভ হবে না,' কিশোর বলল। 'একটা কথাও বলবেন না তিনি। বরং ফগের কাছে যাব। এমন ভঙ্গি করব, যেন তার চেয়ে বেশি জানি আমরা। দেখা যাক কিছু বের করতে পারি কিনা?'

'কিন্তু সে তো জানে তুমি চীন দেশে গেছ,' মুসা বলল।

'গিয়েছিলাম,' মুচকি হাসল কিশোর। 'রহস্যটার সমাধান করে চলে এসেছি। আমি একাই যাচ্ছি। তোমরা থাকো। টিটু, আয়।'

ফগের বাড়ি এসে তার দরজায় টোকা দিল সে। মুসাদের বাড়ির মতই এখানেও ঠিকা কাজ করে মিসেস জারগন। কিশোরকে চেনে। দরজা খুলে দিল।

'মিস্টার ফগ আছেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'জরুরী দরকার আছে। তাকে বলুন একটা জিনিস ফেরত দিতে এসেছি।'

ভেতরে চলে গেল মিসেস জারগন। ছোট বসার ঘরে বসে অপেক্ষা করতে লাগল কিশোর।

পেছনের আঙিনায় বসে সাইকেলের টিউব মেরামত করছিল ফগ। উঠে এল। কিশোরকে দেখে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে তার গোল গোল চোখ।

'ঝামেলা! তুমি? তোমার তো চীনে থাকার কথা!'

'হ্যাঁ, চলে এলাম। রহস্যটা সমাধান করতে সময় লাগেনি। হিংকিটিটিটিংফিঙে আপনার কথা খুব মনে হয়েছে, মিস্টার ফগ...'

'ফগর‍্যাম্পারকট!'

'মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট। কাঠি দিয়ে ভাত খেতে দারুণ লাগে। মজা করে খেতে পারতেন।'

'ফালতু কথা শোনার আমার সময় নেই। কি বলতে এসেছ তাই বলো।'

'এই যে, কাল মিসেস আমানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন।'

'ঝামেলা! তুমি জানলে কি করে? কারও তো জানার কথা নয়!'

'এ রকম একটা খবর চেপে রাখবেন কি করে?'

'কি রকম খবর?'

'লিলি। আশা করি খুব শীঘ্রি এর একটা বিহিত করে ফেলতে পারবেন।'

অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছে কিশোর। ফগের চোখ বড় বড় হয়ে যেতে দেখেই বুঝে ফেলল ঢিলটা জায়গামত লেগেছে।

'চিঠিটার কথা কে বলেছে তোমাকে?'

ও, তাহলে একটা চিঠি নিয়ে গণ্ডগোল—ভাবল কিশোর। বলল, 'আপনি তো বুঝেই গেছেন আমরা খারাপ গোয়েন্দা নই। চাইলে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

'ঝামেলা!' ধৈর্য হারাল ফগ। 'এই কথা বলতে এসেছ! যাও ভাগো! তোমাদের ছাড়াই আমি সব করতে পারব। মিসেস আমান কথা দিয়েছেন কাউকে বলবেন না, আমার ধারণা তিনি বলেনওনি। তাহলে জানলে কি করে তোমরা?'

মুচকি হাসল কিশোর। দস্তানাটা বের করে দিল, 'এটা আপনার। কাল মুসাদের বাড়িতে ফেলে এসেছিলেন।'

ফগের মুখ দেখে মনে হলো চোখ উল্টে পড়ে যাবে। 'ঝামেলা!'

খুশি হলো কিশোর। হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। বাড়ি ফিরে চলল।

তার জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে সবাই। কি খবর জেনে এসেছে জানাল ওদেরকে।

'আমার বিশ্বাস,' কিশোর বলল, 'মিসেস বিন কিছু জানে। ফারিহা, তার কাছ থেকে কথাগুলো আদায় করতে পারবে?'

'কি করে? জানলেও কিছুই বলবে না। কালই বুঝে গেছি। লিলির ব্যাপারে কোন কথা বলতে চায়নি।'

'তবু, আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে হবে। বোনাবুনি পছন্দ করে সে। মোজা বা টুপি কিছু একটা বোনার ভান করে চলে যাবে তার কাছে। বলবে, বুনতে পারছ না। সাহায্য চাইবে তার কাছে। কি করে বুনতে হয় দেখিয়ে দিতে বলবে তাকে। এই ফাঁকে কায়দা করে লিলির কথাটা জেনে নেবে।'

'দেখব চেষ্টা করে। সকালে কথাই বলবে না, অনেক কাজ। বিকেলে যাব, যখন অবসর থাকে।'

সুতরাং সেদিন বিকেলে কাঁটা আর উল হাতে রান্নাঘরে রওনা হলো ফারিহা। মিশুক নয় মিসেস বিন। তার সঙ্গে আলাপ জমানোর কথা ভাবতেও অস্বস্তি লাগছে তার।

কিন্তু ভাগ্য খুলে গেল আচমকা, সহজ হয়ে গেল কাজ। রান্নাঘরে ঢুকতে হলো না ফারিহাকে। পেছনের আঙিনা থেকে ভেসে এল দু-জন মহিলার কথা। মিসেস জারগন এসেছে। মিসেস বিনের সঙ্গে কথা বলছে।

'খারাপ লাগবে না তো কি লাগবে,' মিসেস বিনের গলা। 'ওর বয়েসী একটা মেয়ে যদি হঠাৎ এমন বাজে একটা চিঠি পায়, তার গোপন কথাগুলো ফাঁস করে দেয়া থাকে চিঠিতে, ভয় পাবে না? চিঠির নিচে লেখকের নাম নেই। সেটা আরও খারাপ। জঘন্য।'

'হ্যাঁ, এগুলো এক ধরনের ভীরুতা,' হাসি হাসি গলায় বলল মিসেস জারগন, আলোচনাটায় মজা পাচ্ছে মনে হলো। 'আমি বলে দিলাম মিসেস বিন, মনে রাখবেন কথাটা, আরও আসবে এ রকম উড়োচিঠি। যারা এ সব লেখে তারা একবার লিখেই থেমে যায় না। আরও লেখে, আরও লেখে, মানুষকে ভয় পাওয়ানোটা নেশার মত হয়ে যায় তাদের কাছে। এরপর কে পাবে কে জানে। আপনিও পেতে পারেন। অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

কথাটা এড়িয়ে গিয়ে মিসেস বিন বলল, 'বেচারী মেয়েটা একেবারে ভেঙে পড়ল। খালি কাঁদছিল, খালি কাঁদছিল। জোর করে তার কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়লাম। মিসেস আমানকে সব জানাতে বললাম। জানতাম তিনি সাহায্য করবেন। সে-জন্যেই তাঁর কাছে পাঠালাম।'

'তিনি কিছু করেছেন?'

'করেছেন। সাহেবকে দেখিয়েছেন চিঠিটা। সাহেব তখন মিস্টার ফগকে ফোন করলেন। এই কাজটা ঠিক হয়নি। ওই অকর্মা পুলিশটা কিছু করতে পারবে না।'

'মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকটকে অত বোকা ভাববেন না। অনেক দিন ধরে কাজ করছি তাঁর ওখানে, চিনি তাকে। মানুষ তিনি খারাপ না, তবে কেন জানি ওই ছেলেমেয়েগুলোকে একদম দেখতে পারেন না।'

'মুসা আর তার বন্ধুদের কথা বলছেন তো? এই আরেকটা ব্যাপার। সাহেব আর বেগম সাহেবের কাছ থেকে কথা আদায় করে ছেড়েছে ফগ, যাতে চিঠির কথাটা ছেলেমেয়েগুলোর কাছে একদম গোপন রাখে।'

হেসে ফেলল মিসেস জারগন। 'হয়তো ভেবেছে তাঁর আগেই ওরা রহস্যটার সমাধান করে ফেলবে। যাকগে। আচ্ছা, মিসেস বিন, লিলির কাজ এখন কে করবে?'

'সেইটাই তো ভাবনা। ওর ফিরে আসাটা এখন ঠিক হবে না। আমরা নাহয় চুপ থাকলাম, লোকের মুখ তো আর বন্ধ রাখা যাবে না। নানাজনে নানা কথা বলবে। বাইরে বেরোনোই মুশকিল হয়ে যাবে। আপাতত ভাবছি আমার ভাইয়ের মেয়েটাকে খবর দেব। বেগম সাহেবের সঙ্গেও কথা হয়েছে। তিনি রাজি হয়েছেন। খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। আগামী হপ্তা নাগাদ আসবে ও।'

'ঠিক আছে। আজ তাহলে যাই...'

'সে কি। এখনই যাবেন কি। এক কাপ চা খেয়ে যান।'

আর শোনার প্রয়োজন মনে করল না ফারিহা। মোজা বোনা শেখার জন্যে মিসেস বিনের কাছে যাওয়ারও আর দরকার নেই। যা যা জেনেছে মুসাকে জানানোর জন্যে দৌড় দিল।

বাগানে বসে আছে মুসা। সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ফারিহা দেখল, কিশোর আর রবিনও আসছে। নিশ্চয় ও কিছু করতে পেরেছে কিনা জানার জন্যে আসছে ওরা।

উত্তেজিত ফারিহার মুখ থেকে সব শোনার পর কিশোর হেসে বলল, 'উড়োচিঠি, না? আমিও এ রকমই আন্দাজ করেছিলাম। যাক, রহস্য একটা পাওয়া গেল। এখন সূত্র খুঁজে বেড়াতে হবে।'

'কিন্তু কে লিখেছে কি করে বের করবে?' রবিনের প্রশ্ন।

'সমস্যা যখন পাওয়া গেছে, সমাধানও পেয়ে যাব,' ভারিক্কি চালে গাল ফুলিয়ে বলল কিশোর।

পাঁচ

পরদিন কিশোরদের বাড়িতে কিশোরের ঘরে আড্ডা বসল। আলোচনার মূল বিষয় অবশ্যই লিলির উড়োচিঠি।

আগের দিনের প্রশ্নটা করল আবার রবিন, 'কে লিখেছে কি করে বের করব?'

'যাদেরকে সন্দেহ হয় তাদের একটা তালিকা করে ফেলতে হবে,' কিশোর বলল।

'কাদেরকে সন্দেহ করি আমরা তাই তো জানি না,' বলল মুসা।

'জেনে যাব,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল কিশোর। 'তবে সবার আগে চিঠিটা দেখতে হবে আমাদের, কি লেখা আছে তাতে জানতে হবে।'

'কোথায় আছে ওটা?' ফারিহার প্রশ্ন।

'হয়তো মা'র কাছে,' মুসা বলল।

'কিংবা লিলির কাছে,' বলল কিশোর। 'তার কাছে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।'

'তাহলে চলো,' উঠে দাঁড়াল মুসা।

'কোথায়?'

'লিলির কাছে।'

'তার ঠিকানা জানো?'

ধীরে ধীরে আবার বসে পড়ল মুসা। শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল। মাথা নাড়ল, 'না!'

'তাহলে কি করে যাবে?'

'এক কাজ করা যায়। মাকে জিজ্ঞেস করতে পারি।'

'আমি শিওর, তিনি বলবেন না। যতভাবে সম্ভব আমাদের ঠেকানোর চেষ্টা করবেন তিনি। পুলিশের কাজে নাক গলাতে দেবেন না। মিসেস বিনকে জিজ্ঞেস করেও লাভ হবে না।'

'তাহলে বের করব কি করে?'

'আমি পারব!' চেঁচিয়ে উঠল ফারিহা।

সবগুলো চোখ ঘুরে গেল তার দিকে। কিশোরের পায়ের কাছে শুয়ে থাকা টিটুও উঠে বসে তাকাল ওর দিকে। বলল, 'ঘাউ!'

'লিলির একটা বই আছে আমার কাছে। পড়তে নিয়েছিলাম। খালাকে বলব ওটা ফেরত পাঠাতে চাই। ঠিকানা দরকার।'

চটাৎ করে তুড়ি বাজাল কিশোর। 'দারুণ বুদ্ধি! ভাল গোয়েন্দা হতে পারবে তুমি।'

কিশোরের প্রশংসায় বুক আধহাত ফুলে গেল ফারিহার। চোখ ঘুরিয়ে তাকাতে লাগল সবার দিকে, বিশেষ করে মুসার দিকে।

মুখ গোমড়া হয়ে গেল মুসার। বলল, 'একটা বুদ্ধি আমার মাথায়ও এসেছে।'

কিশোর জানতে চাইল, 'কি?'

'একটা খামে সাদা কাগজ ভরে লিলির নাম লিখে আমাদের বাড়ির ঠিকানায় পাঠাতে পারি। মা তখন ওটা লিলির কাছে পাঠাতে চাইবে। নতুন করে ঠিকানা লিখবে। কাছে কাছে থাকব আমি। সুযোগ করে দেখে ফেলব।'

'হ্যাঁ, এই বুদ্ধিটাও ভাল।'

হাসি ফুটল মুসার মুখে। 'তাহলে করব?'

'হ্যাঁ, করো। তুমিও চেষ্টা করো, ফারিহাও করুক। এই নাও, খাম।' একপাতা সাদা কাগজও বের করে দিল কিশোর।

কাগজটা খামে ভরে মুখ বন্ধ করল মুসা। ঠিকানা লিখতে যাবে, বাধা দিল কিশোর, 'দাঁড়াও। লিখবে যে, তোমার হাতের লেখা চিনে ফেলতে পারেন আন্টি।'

'তাই তো! কে লিখবে?'

'আমার কাছে দাও।'

খামটা নিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে ঠিকানা লিখল কিশোর। দেখলে মনে হবে কোন মেয়ে লিখেছে। মিসেস আমান ভাববেন লিলির কোন বান্ধবী।

রবিন বলল, 'তুমি সত্যি অসাধারণ। এমন কোন কাজ নেই পারো না। এত সুন্দর করে লেখা নকল করতে কোনদিনই পারব না আমি।'

হাসল কিশোর।

ঠিক হলো, সেদিন বিকেলে বাড়ি ফেরার পথে চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে যাবে মুসা।

গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারে আপাতত আর কিছু করার নেই।

সময়টা খেলে কাটাল ওরা।

বিকেলে বাড়ি ফিরে সোজা নিজের ঘরে ছুটল ফারিহা। বইটা টেবিলেই আছে। সেটা নিয়ে নেমে এল নিচে।

খালা বসার ঘরে বই পড়ছেন। সাড়া পেয়ে মুখ তুললেন। 'কেমন কাটালি?'

'ভাল। খুব ভাল। কিশোর থাকলে সহজেই সময় কেটে যায়।'

'কি বই? ক্লাসের বই নিশ্চয় নয়?'

'না। লিলির কাছ থেকে পড়তে নিয়েছিলাম। সে তো চলে গেছে, কবে আসে

ঠিক নেই। ভাবলাম ডাকেই ফেরত পাঠিয়ে দিই।'

'আচ্ছা।'

'ঠিকানাটা বলো, পার্সেল করতে হবে।'

'রেখে যা। আমিই করে দেব।'

'তোমার কষ্ট করার দরকার নেই। ঠিকানাটা বলো, আমিই লিখতে পারব।'

'বললাম তো আমি সব করে দেব। তোর চিন্তা করতে হবে না। রেখে যা। খেয়েছিস?'

'খেয়েছি। ইস্কুল ছুটি, অনেক দিন কিছু লিখি না। আমার এখন খুব লিখতে ইচ্ছে করছে। বলো না ঠিকানাটা।'

'তোর লিখতে ইচ্ছে করছে! তোর! লেখার কথা শুনলেই যার আঙুল ব্যথা শুরু হয়! আজব কথা শোনালি! লিলির ঠিকানা লেখার এত আগ্রহ কেন?'

আর চাপাচাপি করার সাহস হলো না। বইটা খালার কাছে রেখে মুখটাকে বর্ষার মেঘে ঢাকা আকাশের মত ভারি করে ঘরে ফিরে এল ফারিহা।

তার মুখে সব শুনে রাগ করে বলল মুসা, 'মা'টা বড় বেশি বেশি করে!'

কিন্তু সামনে গিয়ে কিছু বলার সাহস হলো না।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই গিয়ে আগে লেটার বক্স খুলল সে। পুলকিত হয়ে দেখল আগের দিন তার পাঠানো চিঠিটা আছে অন্যান্য চিঠির সঙ্গে।

চিঠিগুলো নিয়ে এসে বসার ঘরে পেল মা'কে। আগের দিন ফারিহার রেখে যাওয়া বইটা তখনও টেবিলে আছে। তবে পার্সেল করার কাগজে মোড়া। ঠিকানা লেখা হয়নি।

মুসা বলল, 'বই পাঠাচ্ছ নাকি কোথাও?'

'হ্যাঁ। ফারিহা দিয়েছে, লিলিকে পাঠানোর জন্যে।'

'ঠিকানা তো লেখা হয়নি। লিখে দেব?'

ভুরু কুঁচকে ছেলের দিকে তাকালেন মিসেস আমান। 'তোদের দু-জনের হলো কি? ঠিকানা লেখার জন্যে এমন উঠে পড়ে লেগেছিস কেন?'

'ইয়ে...এমনি...মনে হলো...'

'আমিই লিখতে পারব। চিঠিগুলো রেখে, যা।'

চিঠিগুলো টেবিলে রেখে মুসা বলল, 'লিলির একটা চিঠি আছে।'

পায়ে পায়ে ফারিহাও এসে দাঁড়িয়েছে।

তার চোখের দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে মুসা বলল, 'চিঠিটা কি করবে, মা?'

'কি আবার। লিলির কাছে পাঠিয়ে দেব।'

আশায় দুলে উঠল মুসার বুক। এই বুদ্ধিটা তাহলে কাজে লাগতে যাচ্ছে। আরেকটা বুদ্ধি উদয় হয়েছে তার মাথায়। বলল, 'বাইরে বেরোবে নাকি আজ?'

'কেন?'

'না, এমনি। না বেরোলে এগুলো ডাকে দেবে কে? আমরা অবশ্য বেরোব। ইচ্ছে করলে ওগুলোর সঙ্গে তোমার চিঠিপত্রগুলোও আমাদের কাছে দিতে

পারো।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন মা। বললেন, 'ঠিক আছে নিয়ে যাস। কিন্তু আজ চিঠিপত্রের ব্যাপারে অত আগ্রহ কেন সেটাও বুঝতে পারছি না।'

বেফাঁস কিছু বলে বিপদে পড়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে এল মুসা আর ফারিহা। উত্তেজনায় দুরুদুরু করছে বুক।

নাস্তা করতে বসেছে সবাই, এই সময় মিসেস বিন এসে বলল, 'আপনার টেলিফোন, ম্যা'ম।'

ফোন ধরতে গেলেন মিসেস আমান। কয়েক মিনিট পর ফিরে এলেন।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে মুসার বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?'

তাঁর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন মা, এটা নজর এড়াল না মুসার। ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হলো তার কাছে। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হলো না।

খাওয়ার পর মুসা বলল, 'দাও এবার চিঠিগুলো। বেরোব।'

'ওই যে, টেবিলে রাখা আছে,' দেখিয়ে দিলেন মিসেস আমান।

ফারিহা আর মুসা দু-জনেই এগিয়ে গেল।

'বইটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ফারিহা।

লিলির চিঠিটাও দেখতে পেল না মুসা।

মিসেস আমান বললেন, 'ওগুলো আর ডাকে পাঠানোর দরকার নেই। একজন লোক আজ তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। তার হাতেই দিয়ে দেব।'

'কে যাচ্ছে?' মুসা জানতে চাইল। আবদার ধরল, 'মা, তার সঙ্গে আমরাও যাব। লিলিকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কড়া দৃষ্টিতে মুসার দিকে তাকিয়ে রইলেন মিসেস আমান। মাথা দোলালেন। 'তার মানে কোন ফন্দি আছে। যা সন্দেহ করেছিলাম। খবরদার বলে দিচ্ছি, লিলির কোন ব্যাপারে নাক গলাবি না। তোর দেখা করা লাগবে না। যা, বেরো। ইচ্ছে করলে চিঠিগুলো নিতে পারিস, না নিলে নেই। আমিই ফেলে আসতে পারব।'

চুপসে গেল দুই গোয়েন্দা। চিঠি না নিলে যদি মা'র আরও সন্দেহ হয় এই ভয়ে ওগুলো নিয়ে বিরস বদনে বেরিয়ে এল মুসা। সঙ্গে ফারিহা।

'এত চমৎকার দুটো বুদ্ধি মার খেয়ে গেল!' বেরিয়েই ফুঁসে উঠল মুসা, 'মা'টা তো এবার মনে হচ্ছে কিছু করতে দেবে না!'

'কিশোরের কাছে যেতে হবে,' ফারিহা বলল। 'উপায় ঠিকই একটা বের করে ফেলবে সে।'

শুনে গম্ভীর হওয়ার পরিবর্তে খুশি হয়ে উঠল কিশোর। 'কাজটা সহজ করে দিল।'

'মানে?' ভুরু কুঁচকে ফেলল মুসা।

'মানে লিলির সঙ্গে একজন লোকই দেখা করতে যেতে পারে যার নাম বলতে চান না তোমার আম্মা,' হাসল কিশোর। 'ঝামেলা ফগর্যাম্পারকট। এখন আমাদের কি করতে হবে জানি। জলদি রবিনকে খবর দাও। সে হয়তো তোমাদের বাড়িতে গিয়ে বসে আছে।'

'তোমার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না,' বিমূঢ় হয়ে বলল মুসা। 'কি করতে চাও?'

'সময় হলেই দেখবে। রবিনকে বলবে, সাইকেল যেন নিয়ে আসে। তোমাদেরগুলো এনেছ তো?'

'এনেছি।'

'গুড।'

ছয়

আধঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে ফগের বাড়ির কাছে এসে পাতাবাহারের-বেড়ার আড়ালে লুকিয়ে রইল গোয়েন্দারা।

কয়েক মিনিট পর মিসেস জারগনকে আসতে দেখল। হাতে একটা প্যাকেট। কাছে এলে প্যাকেটটা চিনতে পারল মুসা আর ফারিহা। সেই বইটা, লিলি যেটা পড়তে দিয়েছিল। নিশ্চয় মুসার আম্মার কাছ থেকে গিয়ে নিয়ে এসেছে মিসেস জারগন, ফগকে দেয়ার জন্যে। ফগ নিয়ে গিয়ে দেবে লিলিকে।

আরও দশ মিনিট পর বেরোল ফগ। সাইকেলে চেপে রওনা হলো।

কিশোর বলল, 'তোমরা সব পিছে থাকো। সবাই একসঙ্গে পিছু নিলে চোখে পড়ে যেতে পারি।'

'কিন্তু তুমি কোন্ দিকে গেলে জানব কি করে?' রবিনের প্রশ্ন। 'যদি হারিয়ে ফেলি?'

পকেট থেকে চক বের করে দেখাল কিশোর। 'গাছের গায়ে তীর চিহ্ন এঁকে রেখে যাব। সেটা দেখে অনুসরণ করতে পারবে।'

মনে মনে আরেকবার কিশোরের প্রশংসা করতে বাধ্য হলো ফারিহা। সব যেন আগে থেকেই ভেবে রাখে কিশোর।

বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে ফগকে অনুসরণ করে চলল কিশোর। পেছনে ফিরে তাকাল একবার। তার সহকারীদের দেখা যাচ্ছে না। মোড়ের ওপাশে রয়েছে। রাস্তার দু-পাশে এমন ঘন হয়ে গাছ জন্মেছে, বেশি দূর চোখে পড়ে না।

ঝোড়ো বাতাস বইছে। খুব দুলছে গাছের মাথা।

পেছনে একসঙ্গে এগোচ্ছে মুসা, রবিন আর ফারিহা। সামনে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না ওরা।

এক জায়গায় এসে দু-ভাগ হয়ে গেল পথ। কোনদিকে যাবে? চকের চিহ্ন খুঁজতে লাগল ওরা। গাছের গায়ে আঁকা তীরটা রবিনের চোখে পড়ল।

নির্দেশিত দিকে এগোল আবার ওরা।

'মনে হয় ডোভারভিল গায়ে থাকে লিলি,' অনুমান করল মুসা।

ফারিহা এদিকে আসেনি আর। কোন কিছু চেনে না। সে দেখতে দেখতে

চলল।

পাহাড়ী উঁচুনিচু পথ ধরে গাঁয়ে এসে পৌঁছল ওরা। সামনে কিশোর বা ফগ, কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

রাস্তার দু-ধারে গাছের মাথাগুলো নুয়ে এসে এমন করে লেগে গেছে, মনে হয় সবুজ একটা সুড়ঙ্গ।

সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে বেরোতেই চোখে পড়ল কটেজটা। জানালায় লেখা:

এখানে লেমোনেড পাওয়া যায়

'বাহ্, চমৎকার!' মুসা বলল। 'এই জিনিসই খুঁজছিলাম। গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ।'

'কিন্তু লেমোনেড খেতে আসিনি আমরা এখানে,' প্রতিবাদ করল রবিন। 'কিশোর গেল কোথায় দেখা দরকার।'

তার কথার জবাবেই যেন বাড়ির আঙিনা থেকে ভেসে এল কোলাহল। কুকুর-বেড়ালের ঝগড়া, মুরগীর আতঙ্কিত ডাক, আর সেই সঙ্গে ফগের কর্কশ চিৎকার, 'ঝামেলা! এই তোমার কুত্তা সরাও!'

বুঝতে অসুবিধে রইল না কারও, ওই বাড়িতেই ঢুকেছে ফগ। পিছে পিছে গেছে কিশোর। অন্য দিকে মনোযোগ ছিল, এই সুযোগে টিটু গিয়ে ঝগড়া বাধিয়েছে বাড়ির বেড়ালটার সঙ্গে। তারপর ফগকে দেখে তার পায়ে কামড়ে দিতে গেছে। ওই লোকটাকে দেখলেই পায়ে কামড়ানোর জন্যে খেপে যায় যেন কুকুরটা।

কিশোরের গলা শোনা গেল, 'এই টিটু, আয়, আয় বলছি! চাবকে ছাল তুলে ফেলব!'

সাইকেল রেখে বেড়ার কাছে এগিয়ে গেল মুসা, রবিন আর ফারিহা।

আঙিনায় দাঁড়িয়ে কঠোর দৃষ্টিতে কিশোর আর টিটুর দিকে তাকিয়ে আছে ফগ। তার কাছে দাঁড়ানো একজন মহিলা, আর একটা মেয়ে। মেয়েটা ওদের পরিচিত, লিলি, ওকেই খুঁজতে এসেছে ওরা।

ছেলেমেয়েদের সবাইকে চোখে পড়ল ফগের। খেঁকিয়ে উঠল, 'এখানে কি তোমাদের?'

কুঁকড়ে গেল মুসা, জবাব জোগাল না মুখে।

কিন্তু কিশোর ফগের পরোয়া করে না, জবাবও মুখে লেগেই থাকে। বলল, 'গ্রামটা দেখতে এসেছি। গলা শুকিয়ে গেল। লেমোনেড পাওয়া যায়—লেখা দেখে ঢুকেছি।'

'নাকি আমার পেছনে লেগেছ?'

'আপনার পেছনে লাগতে যাব কেন? কিছু করছেন নাকি?'

'ঝামেলা! যাও, ভাগো। আমি এখানে জরুরী কাজে এসেছি। এখানে জ্বালাতন কোরো না।'

'আপনার কাজ আপনি করুন, জ্বালাতন করব কেন? আমরা তো লেমোনেড খেতে এসেছি। পয়সা দিয়ে লেমোনেড কিনে খেতে নিশ্চয় পুলিশের অনুমতি লাগে

না?'

এ কথার জবাব খুঁজে পেল না ফগ। বার দুই অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাত ঝাঁকিয়ে, 'ঝামেলা! ঝামেলা!' করে পাশে দাঁড়ানো মহিলার দিকে ফিরল। বলল, 'যা বলেছি মনে রাখবেন। এ সব কথা আর কাউকে বলবেন না। নতুন কিছু ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন।'

ছেলেমেয়েদের দিকে আরেকবার বিষ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে গটমট করে সাইকেলের দিকে হেঁটে গেল সে।

হাসতে হাসতে ভেতরে ঢুকল মুসা। কিশোরের কাঁধে চাপড় দিয়ে বলল, 'সাবধানে থেকো। যে রকম চটান চটাও, কোন্‌দিন না তোমাকে খুন করে ফেলে ঝামেলা।'

অবাক হয়ে গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে আছে লিলি আর তার খালা।

ছুটে গিয়ে লিলির হাত জড়িয়ে ধরল ফারিহা, 'লিলি, তোমাকে দেখতে এলাম! না বলে তুমি এ ভাবে চলে এলে কেন? তোমার জন্যে খুব খারাপ লাগছিল।'

ফারিহাকেও জড়িয়ে ধরল লিলি।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার খালা। বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'যে ঝামেলা শুরু হয়েছে, আজ আর দোকান খুলতে পারব না দেখছি! দেখি, আমি যাই। লিলি, রান্নাটা যেন সময়মত শেষ হয়। আর পুলিশের লোকটা যা বলে গেল যেন মনে থাকে।'

পুরানো একটা হ্যাট মাথায় পরে, স্কার্ফ গলায় জড়িয়ে কটেজের বাইরের একটা ঘরের দিকে চলে গেল মহিলা। বদমেজাজী মহিলাটা চলে যাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গোয়েন্দারা। শান্তিতে কথা বলতে পারবে লিলির সঙ্গে।

কিশোরকে দেখেনি আর লিলি। তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল মুসা।

ফারিহা বলল, 'লিলি, আমরা জেনেছি একটা ঘটনা বিপদে ফেলে দিয়েছে তোমাকে। আমরা সাহায্য করতে এসেছি।'

ওদের আন্তরিকতা মন ছুঁয়ে গেল লিলির। নিয়ে এল বারান্দার কোণের ছোট একটা ঘরে। কোল্ড ড্রিংক এনে দিল।

সমস্যাটার কথা জিজ্ঞেস করল কিশোর।

চোখে প্রায় জল এসে গেল লিলির। কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, 'বাধ্য হয়ে এখানে এসেছি। খালা আমাকে পছন্দ করে না। কিন্তু গ্রীনহিলসে এখন ফেরত যাওয়াও সম্ভব নয়।'

'কেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'বলতে মানা করা হয়েছে আমাকে।'

'দেখো লিলি, আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই। গোপন কথা, যত গোপনই হোক আমাদের বলতে পারো। কাউকে বলব না আমরা।'

'আমাকে কেউ সাহায্য করতে পারবে না।' এক চোখের পানি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল তার।

'কেন? এমন কি হয়েছে?' কোমল স্বরে বলল রবিন। 'বলেই দেখো কিছু

করতে পারি কিনা?'

হাত দিয়ে চোখের পানি মুছল লিলি। দ্বিধা করল। তারপর বলল, 'একটা পাপ করেছিলাম, তার জন্যে এখনও আমার অনুশোচনা হয়। শোধরানোর জন্যে একটা হোমে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল আমাকে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম জীবনে আর কখনও খারাপ কাজ করব না। হোম থেকে বেরিয়ে তাই গ্রীনহিলসে গিয়ে মুসাদের বাড়িতে চাকরি নিয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে…আমাকে…'

আবার কেঁদে ফেলল লিলি।

'তারপর?' কোমল কণ্ঠে অনুরোধ করল কিশোর, 'থেমো না, লিলি, বলে যাও।'

'তারপর…তারপর…' ফোঁপাতে শুরু করল লিলি, 'আমাকে একটা উড়োচিঠি দিল কে জানি! তাতে লেখা: সে নাকি আমার কথা সব জানে। যেখানে চাকরি করছি সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, নইলে সব ফাঁস করে দেবে।'

'কে দিয়েছে কিছুই আন্দাজ করতে পারো না, না?'

'না। মিসেস বিনের সামনে খুলে ফেলেছিলাম, সে-ও দেখে ফেলল। আমার দুঃখে দুঃখিত হলো। বলল ওটা মুসার আম্মাকে দেখাতে। তিনি একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন। চিঠিটা দেখালাম তাঁকে। আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছেন তিনি। আমাকে বললেন, কয়েক দিন খালার কাছে এসে থাকতে। ইতিমধ্যে পুলিশকে দিয়ে এর একটা বিহিত করাবেন। থাকতে খুব একটা অসুবিধে হত না আমার, খালা যদি এখানে ভাল ব্যবহার করত।'

'তোমার মা-বাবার কাছে চলে যাও না কেন?' ফারিহা বলল, 'ওদের কাছেই তো সবচেয়ে ভাল থাকবে।'

'যেতে পারব না,' আরও বিষণ্ণ হয়ে গেল লিলি।

'কেন? তারা কি বেঁচে নেই?'

'আছে। জেলখানায়।' আবার কাঁদতে লাগল লিলি। 'কোনকালেই ওরা ভাল ছিল না। চুরিদারি নানা রকম অপরাধ করে জেলে গেছে। ওরাই চুরি করা শিখিয়েছিল আমাকে। একদিন একটা দোকানে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লাম। হোমে পাঠিয়ে দেয়া হলো আমাকে। ভাল হতে চাইলাম আমি। হোম থেকে বেরিয়ে একটাও খারাপ কাজ করিনি আর। করবও না। আমি ভাল থাকতে চাই। এই বিপদ থেকে মুক্তি পেতে চাই।'

'অবশ্যই পাবে,' জোর গলায় বলল কিশোর। 'উড়োচিঠি দিয়ে যে তোমাকে বিপদে ফেলেছে সে সাংঘাতিক খারাপ লোক। তাকে আমরা ছাড়ব না।'

অনেকটা শান্ত হলো লিলি। 'শুধু আমাকেই না, গ্রীনহিলসের আরও একটা মেয়েকে এ রকম চিঠি দিয়েছে। মিস কোয়েলারের বাড়িতে চাকরি করে সে। মেয়েটা আমার বন্ধু, নাম নরিনা। ও আমার চেয়ে অনেক সাহসী, ভেঙে পড়েনি। আমাকে বাদে আর কাউকে বলেনি চিঠির কথা।'

'কবে বলেছে?'

'আমি মুসাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর।'

'ফগর‍্যাম্পারকটকে এ কথা বলে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ। পুলিশের লোক, বলাই উচিত। বলল, আজকেই নরিনার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাকড়াও করবে অপরাধীকে।' দু-হাতে মুখ ঢাকল লিলি। 'উফ্‌, আমি যে কি করব এখন! গ্রীনহিলসে আর যেতে পারব না। লোকে সব জেনে যাবে। মুখ দেখাব কি করে!'

'জানার আগেই একটা ব্যবস্থা করে ফেলব। তোমার চিঠিটা কোথায়?'

মুখ তুলল লিলি। 'মিস্টার ফগকে দিয়েছি। বলল, নরিনারটাও নিয়ে নেবে। এগুলো নাকি মূল্যবান সূত্র।'

খবরটা আচমকা ধসিয়ে দিল যেন কিশোরকে। হতাশা চাপা দিতে পারল না সে। একটিমাত্র সূত্র, যেটার আশায় এসেছিল, সেটাও গেল!

সাত

কেন এমন হয়ে গেল কিশোর, কি এমন অন্যায় করে ফেলেছে লিলি বুঝতে পারল না।

তাকে বুঝিয়ে বলল কিশোর, কেন হতাশ হয়েছে।

মাথা নাড়তে নাড়তে লিলি বলল, 'তাহলে তো চিঠিটা দেয়া ঠিক হয়নি। ঠিক আছে, আজ বিকেলে নরিনার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা আছে আমার। ফগের কাছ থেকে চিঠিটা চেয়ে নিয়ে আসব। তোমাদের দেখাব এ কথা বলব না।'

'খুবই ভাল হয় তাহলে। চিঠিটা আমাদের বাড়িতে দিয়ে এসো। আমি থাকব।'

বাড়ির ঠিকানা দিল কিশোর।

লিলির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা।

বিকেল থেকেই বাড়ির গেটের কাছে বসে রইল কিশোর। লিলি আর আসে না। সন্ধ্যা হলো। অস্থির হয়ে গেল কিশোর। তবে কি চিঠিটা দেয়নি ফগ?

অন্ধকার হয়ে গেল। আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? ঘরে ঢোকার কথা ভাবছে কিশোর, এই সময় দেখল হনহন করে হেঁটে আসছে কে যেন। এগিয়ে গেল সে।

লিলিও এসেছে!

'এত দেরি করলে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কি করব। সেই কখন থেকে বসে আছি মিস্টার ফগের বাড়িতে। কোথায় যে বেরিয়েছে, আসার নামই নেই। শেষে তার টেবিল থেকে এগুলো তুলে নিয়ে এসেছি। নাও।'

রবার ব্যান্ডে বাঁধা কয়েকটা খাম বাড়িয়ে দিল লিলি।

নিল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'ফগের বাড়িতে কেউ দেখেনি তোমাকে?'

'না। দরজা খোলা ছিল। ঢুকে বসার ঘরে বসেছিলাম অনেকক্ষণ।'
'বেরোতেও দেখেনি কেউ?'
'মনে হয় না।'
'হুঁ। এগুলো পাওয়াতে সুবিধে হবে। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, লিলি।'
'আর দেরি করতে পারছি না। খালার ওখানে ফিরে যেতে হবে আমাকে। চলি। দরকার পড়লে দেখা কোরো।'
'আচ্ছা।'
অন্ধকারে মিলিয়ে গেল লিলির পদশব্দ।
চিন্তিত মনে ঘরে ফিরল কিশোর। লিলি যে কাজটা করে এসেছে, মোটেও ঠিক হয়নি। ফগ যদি জানতে পারে চিঠিগুলো তার ঘর থেকে চুরি করেছে লিলি, ভয়ানক বিপদে পড়ে যাবে মেয়েটা। এটা তাকে বলেনি কিশোর, আরও বেশি ভয় পেয়ে যাবে বলে।
চিঠিগুলো দেখার পর যে কোন উপায়ে আবার ফগের কাছে ফেরত দিতে হবে, ভাবল সে। কোন ভাবেই ফগকে বুঝতে দেয়া চলবে না যে ওগুলো তার টেবিল থেকে চুরি হয়েছে।
তাড়াতাড়ি করতে হবে।
সোজা নিজের ঘরে চলে এল কিশোর। মোট পাঁচটা চিঠি। এতগুলো এনেছে কেন লিলি? আনার কথা তো একটা, নরিনারটা ধরলে বড় জোর দুটো। অন্যগুলো কার? হাতের কাছে যা পেয়েছে সবই নিয়ে এসেছে বোধহয় মেয়েটা। বোকামি করেছে। মস্ত বোকামি। ফগ জানতে পারলে...যাতে না জানে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।
ঘরে এসে চিঠি পরীক্ষা করতে বসল সে। দেখে অবাক হলো, পাঁচটা চিঠিই উড়োচিঠি। বড় বড় করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে লেখা। বিভিন্নজনকে। সত্তর বছরের এক বৃদ্ধকেও লেখা হয়েছে একটা। তার নাম মিস্টার হ্যারিসন। গ্রীনহিলসেই থাকে।
কয়েকটা মূল্যবান তথ্য জানা গেল চিঠিগুলো থেকে:
*সব ক'টা চিঠি গ্রীনহিলসের লোককে লেখা;
*পোস্ট করা হয়েছে ডিয়ারহিলস থেকে;
*প্রতিটি চিঠি ডাকবাক্সে ফেলা হয়েছে সোমবারে।
আর কিছু দেখার নেই। তথ্যগুলো নিয়ে গবেষণা পরেও করতে পারবে, আপাতত চিঠিগুলো জায়গামত রেখে আসা দরকার।
ছদ্মবেশ নিতে শুরু করল সে। কাজ সেরে উঁকি দিয়ে দেখে এল মেরিচাচী কি করছেন। বসার ঘরে মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছেন।
মুচকি হাসল কিশোর। সারা বছর ইয়ার্ডের কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে এখন একেবারে অলস সময় কাটাচ্ছেন। এখনকার এই মানুষটিকে দেখলে কেউ কল্পনাই করতে পারবে না, দিনে রাতে কি পরিমাণ খাটতে পারেন তিনি। এবং খাটিয়ে মারেন ইয়ার্ডের প্রতিটি লোককে।

রোজ সন্ধ্যায় স্থানীয় সরাইখানায় ডার্ট খেলতে যায় ফগ, জানা আছে কিশোরের। বাড়ি থাকে খালি। সেই সুযোগে চিঠিগুলো রেখে আসার সিদ্ধান্ত নিল সে।

কিন্তু আসতে দেরি করে ফেলেছে। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই দেখে হেলেদুলে এগিয়ে আসছে ফগ।

দ্রুত চিন্তা করে নিল কিশোর। সোজা গিয়ে ধাক্কা লাগাল ফগের গায়ে। আরেকটু হলে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল তাকে।

'অ্যাই, কে, কে!' বলে চিৎকার করে উঠল ফগ। 'চোখে দেখতে পাও না!'

'মাপ করবেন, স্যার,' হাতজোড় করে বলল টেলিগ্রাফ-বয়ের ছদ্মবেশী কিশোর। 'মাপ করে দেবেন। ইদানীং কি যে হয়েছে আমার, মানুষের সঙ্গে খালি ধাক্কা লাগে। আমি সত্যি দুঃখিত, স্যার।'

এত কাকুতি-মিনতির পর আর কিছু বলার থাকে না। ফগ বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, দেখে চলবে।'

'থ্যাংক ইউ, স্যার। এখন থেকে রাতে টর্চ না জ্বেলে আর পথ চলব না,' বলে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল কিশোর। মাটিতে টর্চের আলো ফেলে দেখছে। ডাক দিয়ে বলল, 'স্যার, শুনুন, শুনুন। এগুলো বোধহয় আপনার।'

ফিরে তাকাল ফগ। চিঠিগুলো দেখে বড় বড় হয়ে গেল চোখ। 'এখানে এল কি করে! সঙ্গে নিয়ে তো বেরোইনি!'

'তাহলে কি অন্য কারও? ঠিক আছে, খোঁজ করতে হবে।'

'না না, দাঁড়াও,' থাবা দিয়ে কিশোরের হাত থেকে চিঠিগুলো নিয়ে নিল ফগ। 'এগুলো আমারই।'

'পকেট থেকে পড়ল নাকি?'

'হবে হয়তো,' অনিশ্চিত শোনাল ফগের কণ্ঠস্বর।

আর দাঁড়াল না কিশোর। সরে গেল।

চিঠিগুলো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল ফগ, এখানে এল কি করে? সাথে নিয়ে বেরোয়নি, এটা ঠিক। নাকি বেরিয়েছিল, মনে করতে পারছে না আর এখন? কি জানি! মাথাটাই গুলিয়ে যাচ্ছে না তো! স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে?

বাড়ি ফিরে বাসের টাইম টেবল, ম্যাপ আর রেফারেন্স বই খুলে বসল কিশোর। জানতে পারল, গ্রীনহিলস থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে একটা গ্রাম আছে, সেটার নাম ডিয়ারহিলস। সোমবারে হাট বসে সেখানে। পাহাড়ী এলাকা। বাস চলাচল আছে, তবে খুব কম। সোমবারে সকাল ১০-১৫ মিনিটে একটা বাস ছাড়ে গ্রীনহিলস থেকে, ডিয়ারহিলসে পৌঁছায় ১১-০১ মিনিটে। অনুমান করল, গ্রীনহিলস থেকে কেউ গিয়ে যদি ওখানে চিঠি পোস্ট করতে চায়, তাহলে এই বাসেই যায়। এমন হতে পারে, ডিয়ারহিলসে বিশেষ কোন কাজ থাকে তার সোমবারে। এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়ে যায়—চিঠিও পোস্ট করে, কাজও সারা হয়ে যায়।

সুতরাং সোমবার সকালে ডিয়ারহিলসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর।

আট

পরদিন সকালে উঠেই বন্ধুদের খবরটা জানাতে ছুটল কিশোর। কিন্তু সোমবারের আগে কিছুই করার নেই এ ব্যাপারে। তাই কেবল আলোচনার পর আলোচনা চলল।

প্রচণ্ড উত্তেজনার মাঝে সোমবার সকাল এল। দল বেঁধে বাস স্টপেজে চলল ওরা।

'ওই যে, বাস আসছে,' ফারিহা বলল। 'অনেকেই তো উঠে বসে আছে।'

'স্টেশন থেকে উঠেছে,' বলল রবিন। 'চলো, উঠি।'

স্টপেজে থামল বাস। হুড়াহুড়ি করে উঠে পড়ল ছেলেমেয়েরা।

যাত্রী মোট পাঁচজন। একজনের ওপর চোখ পড়তে থমকে গেল ওরা। লোকটাও গোল চোখ বড় বড় করে ফেলল।

আর কেউ নয়, স্বয়ং ফগর্‍্যাম্পারকট!

'সর্বনাশ!' ভাবল কিশোর। 'এই লোক বাসে কেন? সে-ও কি ডিয়ারহিলসে চলেছে? ওদের মত একই উদ্দেশে? তারমানে যতটা বোকা ওকে ভাবি, ততটা ও নয়!'

আগেই কথা হয়েছে, বাসে উঠে যাত্রীদের ওপর কড়া নজর রাখবে গোয়েন্দারা। কে কোথায় নামে, কি করে দেখবে। সুযোগ থাকলে পাশে বসে ওদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবে।

পুরো বাসই প্রায় খালি। যেখানে ইচ্ছে বসতে পারে ওরা। ফগের পাশে বসার ইচ্ছে কারও নেই। টিটু তো লোকটাকে দেখেই খেপে গেল। কিশোরের হাত থেকে ছুটে গিয়ে কামড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল।

মহাবিরক্ত হয়ে ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে ফগ বলল, 'এখানে তোমাদের কি? যেখানেই যাই এ ভাবে জোঁকের মত লেগে থাকো কেন?'

'আমরা ডিয়ারহিলসের হাট দেখতে যাচ্ছি, মিস্টার ফগ...'

'ফগর্‍্যাম্পারকট!'

'ও হ্যাঁ, ফগ। সরি...'

'ফগর্‍্যাম্পারকট!'

'পুরোটা বলতে মনে থাকে না। হ্যাঁ, মিস্টার ফগর্‍্যাম্পারকট। আপনার রেগে যাওয়ার কিছু নেই। বেআইনী কিছু করছি না আমরা। আপনি যাচ্ছেন কেন?'

'সেটা আমার ব্যাপার!' রাগে ফুঁসে উঠল ফগ। টিটুর দিকে তাকাল ভয়ে ভয়ে। যতটা সম্ভব সরিয়ে নিল পা।

ফগকে বাদ দিয়ে বাসে লোক আছে চারজন। ইচ্ছে করলে প্রত্যেকের পাশে

একজন করে বসতে পারে গোয়েন্দারা।

চারজনের তিনজনকেই চেনে ওরা। একজন মুসাদের পাশের বাড়ির লেডি মরগাননের অ্যাসিসটেন্ট মিস টোমার। নাক থেকে খালি চশমা খুলে খুলে পড়ে তার। সেটা দেখতে খুব ভাল লাগে ফারিহার। কয়বার পড়ল গুণতে আরও ভাল লাগে।

এই মহিলা উড়োচিঠির লেখক হতেই পারে না। তার সঙ্গে পরিচয় আছে ওদের।

দ্বিতীয় মহিলা মিসেস হ্যাগ। মিষ্টির দোকানের মালিক। সুন্দর ব্যবহার। ভাল মানুষ বলেই জানে গোয়েন্দারা। ওকেও সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়া যায়।

বাকি দু-জন অবশ্য সন্দেহজনক। একজনের হালকা-পাতলা শরীর, চোয়াল বসা, গম্ভীর হয়ে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। মাঝে মাঝে নাক কুঁচকাচ্ছে। মুদ্রাদোষ। ফারিহার মনে হলো এই লোককে দিয়ে যে কোন খারাপ কাজ সম্ভব।

বাকি রইল একটা মেয়ে। বয়েস আঠারো মত হবে। সুন্দর চেহারা। কোঁকড়া চুল। হাতে ছবি আঁকার সরঞ্জাম। এই বয়েসী মেয়েরা অনেক সময় বোকার মত কাজ করে বসে। একে সন্দেহ করা যেতে পারে।

তবে সবচেয়ে বেশি সন্দেহ হয় গোমড়ামুখো লোকটাকে। তার পাশে বসল কিশোর।

রবিন বসল মিস টোমারের পাশে। ফারিহা বসল মিসেস হ্যাগের পাশে, আর মুসা মেয়েটার।

'গুড মরনিং, মিস টোমার,' কথা শুরু করল রবিন। 'অনেক দিন দেখা হয় না। হাটে যাচ্ছেন? ডিয়ারহিলসের নাম শুনেছি অনেক, যাওয়ার সুযোগ হয়নি।'

'বাজারটা সত্যি সুন্দর, দেখার মত,' নড়েচড়ে বসতে গিয়ে নাক থেকে চশমা খসে পড়ল মিস টোমারের। তুলে আবার জায়গা মত বসাল। মিসেস হ্যাগের সঙ্গে কথা বলার কথাই ভুলে গেল ফারিহা, তাকিয়ে আছে মিস টোমারের দিকে। সে গুণল, 'একবার।'

'আপনি প্রায়ই যান নাকি ওখানে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'নাহ্। মাঝেসাঝে। তোমার আম্মা কেমন আছেন?'

'ভাল। আপনার আম্মা কেমন? আপনার সঙ্গে একবার দেখেছি, মনে আছে।'

'না, শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না।'

'অসুখ? ও। তিনি ডিয়ারহিলসেই থাকেন?'

'হ্যাঁ। রোজ তো দেখতে যেতে পারি না। সোমবারে আমার ছুটি থাকে, সেদিন যাই। কিছু দিন ধরে প্রতি সোমবারেই যেতে হচ্ছে।'

'এই বাসেই?'

'না, যখন যেটা ধরতে পারি।'

তারমানে মিস টোমার সন্দেহ থেকে বাদ, উড়োচিঠির লেখক নয়। কিশোরের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে ইশারা করে সেটা বোঝাল রবিন।

ইতিমধ্যে ফারিহার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলেছে মিসেস হ্যাগ। কথা বেশির ভাগ মহিলাই বলছে, চকলেট আর ক্যান্ডি তৈরির কথা।

এক সময় জিজ্ঞেস করল ফারিহা, 'ডিয়ারহিলসে বাজার করতে যান আপনি?'

'হ্যাঁ। মাখন আর ডিম কিনতে। আমার বোনের ফার্ম আছে। তার কাছ থেকে কিনলে অনেক সুবিধে, গ্রীনহিলসের চেয়ে সস্তাও অনেক। মাখন মাপে বেশি দেয়, ডিমও দেয় বড় বড় দেখে। তুমি কিনতে গেলে আমার কথা বোলো, তোমাকেও বেছে বেছে দেবে।'

'খুব ভাল মনে হচ্ছে তাকে।'

খুশি হলো মিসেস হ্যাগ। হাসল। 'আসলেই ভাল।...আমার ব্যাগটা রাখলাম কোথায়? এই যে, পেয়েছি।' ব্যাগ হাতড়ে একটা প্যাকেট বের করল মহিলা। সেটা থেকে ক্যান্ডি বের করে ফারিহাকে দিল, 'নাও, খাও। পয়সা লাগবে না। এমনি দিলাম।'

'এত ভাল একজন মানুষ কখনোই উড়োচিঠি লিখতে পারে না,' ভাবল ফারিহা।

পাশে বসা মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'ছবি আঁকতে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ,' হেসে জবাব দিল মেয়েটা। 'ডিয়ারহিলস মার্কেটের ছবি। সকালে ওখানে খুব সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। হাঁস-মুরগী-ভেড়া, ডিম আর মাখনের দোকান, আরও কত কি।'

'পোস্ট অফিসটা কোথায় চেনেন?'

আবার হাসল মেয়েটা। 'না। যাই ছবি আঁকতে, পোস্ট অফিস দিয়ে কি করব? পোস্ট অফিসের ছবি আঁকতে আমার ভাল লাগবে না। ছোট্ট জায়গা। নিশ্চয় কারও বাড়িতে অফিস বসে। আলাদা কোন পোস্ট অফিস আছে বলে মনে হয় না।'

সন্তুষ্ট হলো মুসা। যে পোস্ট অফিসই চেনে না সে চিঠি পোস্ট করবে কি করে? এই মেয়ে উড়োচিঠির লেখক নয়।

তার কাজ শেষ। বাসের অন্যান্য যাত্রীদের দিকে তাকাল মুসা। একটিমাত্র লোককেই সন্দেহ করা যায় এখন, সে ওই গোমড়ামুখো লোকটা। চকিতের জন্যে আরেকটা ভাবনা উদয় হলো তার মনে। আচ্ছা, ফগ এই কাজ করছে না তো! চিঠি লিখে বেড়াচ্ছে না তো মানুষকে? পরক্ষণেই ঝেড়ে ফেলে দিল ভাবনাটা। অসম্ভব! এ হতে পারে না।

নয়

লোকটার হাতের পত্রিকার দিকে তাকিয়ে কিশোরের মনে হলো ঘোড়া আর কুকুরের খবর ছাড়া আর কিছু নেই ওটাতে।

লোকটার গোড়ালির কাছে শুঁকল টিটু। গন্ধটা মোটেও পছন্দ হলো না তার।

খোঁৎ খোঁৎ করে বার দুই নাক ঝেড়ে কয়েক সীট সামনে বসা ফগের দিকে তাকাল লোলুপ দৃষ্টিতে।

'ইয়ে, স্যার,' শুরু করল কিশোর, 'আমার কুকুরটা নিশ্চয় আপনাকে বিরক্ত করছে না?'

জবাব দিল না লোকটা।

কিশোর ভাবল, কানে কম শোনে। কণ্ঠস্বর চড়িয়ে বলল, 'আমার কুকুরটা কি আপনাকে বিরক্ত করছে, স্যার?'

চোখমুখ কুঁচকে তাকাল লোকটা। 'অত চিৎকার করছ কেন? আমি কি কালা?'

কুকুরের কথা নিয়ে আলোচনার আর সাহস পেল না কিশোর। আরও আকর্ষণীয় কোন বিষয় দরকার। 'ঘোড়া খুব মজার প্রাণী, তাই না?'

চুপ করে আছে লোকটা।

জোরে জোরে আর বলবে কিনা দ্বিধা করতে লাগল কিশোর। কণ্ঠস্বর চড়িয়ে আবার ধমক খেতে চায় না। বলল, 'ঘোড়া খুব মজার প্রাণী, আপনার কি মনে হয়, স্যার?'

'হ্যাঁ,' আবার পড়তে লাগল লোকটা।

আলোচনা চালানোর সুযোগই দিচ্ছে না লোকটা। বাসের যাত্রীদের মধ্যে একেই অপরাধী বলে মনে হয়। অথচ এর সঙ্গেই কথা বলা যাচ্ছে না। অপরাধীরা এমনই হয়, চালাক হয়।

'ক'টা বাজে, স্যার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

জবাব নেই।

'স্যার, সময়টা বলবেন?' আবার বলল সে।

'না, বলব না। কারণ তোমার হাতেও একটা ঘড়ি দেখতে পাচ্ছি, এবং সেটা চলছে।'

নিজেকে লাথি মারতে ইচ্ছে করল কিশোরের।

খানিক পর জানালা দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'দেখুন, দেখুন, একটা নতুন ধরনের এরোপ্লেন।'

'থাকগে। আমার কি?' জবাব এল। জানালার দিকে ফিরেও তাকাল না লোকটা।

'আমি ডিয়ারহিলসে যাচ্ছি, বাজার দেখতে। আপনিও যাচ্ছেন?'

জবাব নেই।

কিশোরের ইচ্ছে হতে লাগল, টিটুকে বলে লোকটার গোড়ালিতে কামড়ে দিতে, তাতে যদি খানিকটা মুখ খোলে লোকটা। গোয়েন্দাগিরিতে মেজাজ খারাপ করলে চলে না, ধৈর্য ঠিক রাখতে হয়, নিজেকে বোঝাল সে। একটা গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছে বাস। জিজ্ঞেস করল, 'এই গ্রামটার নাম কি?'

'জানি না! আমি এখানে নতুন। ডিয়ারহিলসের কিছুই চিনি না। ওখানে আমার ভাই থাকে। আমি গেলে আমাকে তুলে নেবে। তারপর আরও দূরে একটা জায়গায়

নিয়ে যাবে। তোমার মাথায় যত প্রশ্ন আছে সবগুলোর জবাব পেয়েছ? দয়া করে বকবকানিটা বন্ধ করে আমাকে এবার রেহাই দেবে?'

সামনের সীট থেকে ফগের হাসি শোনা গেল। ফিরে তাকিয়ে বলল, 'তুলে দিন ওখান থেকে, নাহলে রেহাই দেবে না। একেকটা ঝামেলার ডিপো এগুলো।'

'ওঠো এখান থেকে!' কিশোরকে ধমক লাগাল লোকটা। 'কুত্তাটাকে সরাও! নইলে লাথি মেরে দেব বাস থেকে ফেলে!'

ঘেউ ঘেউ করে উঠল টিটু, যেন বুঝে ফেলেছে লোকটার কথা। তার দিকে তাকিয়ে কুঁকড়ে গেল লোকটা।

তার কাছ থেকে কথা আদায়ের আর কোন সম্ভাবনা নেই। অহেতুক গণ্ডগোল না করে উঠে এসে একেবারে পেছনের সীটে বসল কিশোর। প্রচুর জায়গা আছে। মুসা, রবিন আর ফারিহাও চলে এল তার পাশে।

কে কি জেনেছে কিশোরকে জানাল ওরা।

নিচু স্বরে কিশোর বলল ওদের, 'আমাদের অপরাধী এই বাসে নেই বলেই মনে হচ্ছে। গোমড়ামুখো লোকটাও নয়। নতুন লোক। গ্রীনহিলসের লোক চেনার কথা নয়। কে কোন বাড়িতে থাকে, অতীতে কি করেছিল, সে-সব জানার তো প্রশ্নই ওঠে না।'

'প্রতি সোমবারেই আসে নাকি?' মুসার প্রশ্ন।

'ও কথা জিজ্ঞেসই করার সুযোগ দেয়নি। আসে বলে মনে হয় না। তাহলে অনেক কিছু চিনত।'

সামনের স্টপেজে থামল বাস। আরেকজন যাত্রী উঠল। তার দিকে একবার তাকিয়েই সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিল কিশোর। গির্জার পাদ্রী।

আরও কিছুদূর এগোনোর পর প্রায় খাড়া রাস্তা বেয়ে উঠতে লাগল বাস। অন্য পাশে এসে তেমনি খাড়া ঢাল বেয়ে নামতে লাগল। এগারোটা প্রায় বাজে। স্পারহিলস এসে গেছে।

বড় বড় কয়েকটা গাছের নিচে বাস থামল। কানে এল হাঁস, মুরগী, ভেড়ার মিশ্র চিৎকার আর মানুষের কথা বলা। হই-হট্টগোল হচ্ছে খুব। হাট বসেছে বোঝা যায়।

সবার আগে তাড়াহুড়ো করে নেমে পড়ল গোয়েন্দারা। হাটের দিকে চলেছে একজন লোক। তাকে জিজ্ঞেস করতেই দেখিয়ে দিল পোস্ট অফিসটা।

দলবল নিয়ে দ্রুত সেদিকে এগোল কিশোর। নিচু স্বরে বলল, 'শুধু আমি থেকে পাহারা দেব। একসঙ্গে সবাই থাকলে ফগের সন্দেহ হবে। তোমরা সব বাজার দেখতে চলে যাও।'

পোস্ট অফিসের কাছে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকলেও ফগের সন্দেহ হবে, তাই একটা খাম কিনে ঠিকানা লিখতে শুরু করল কিশোর। ভান করল কোথাও চিঠি পাঠাচ্ছে। একটা চোখ রেখেছে বাসের যাত্রীদের দিকে।

মিসেস হ্যাগ চলে গেল বাজারে, তার বোনকে খুঁজতে।

মিসেস টোমার আর ছবি আঁকিয়ে মেয়েটার কেউই চিঠি পোস্ট করতে এল না। পোস্ট অফিসের ধারেকাছেও এল না দু-জনে।

পাদ্রী চলে গেল তার পথে।

গোমড়ামুখো লোকটা অস্থির ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে বাস স্টেশনের কাছে। মিনিট দুয়েক পরে একটা গাড়ি এসে তুলে নিয়ে গেল তাকে।

ফগ তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে। চোখে সন্দেহ।

দেখেও দেখল না কিশোর। ফগ তাকেই উড়োচিঠির লেখক বলে সন্দেহ করছে না তো? দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। খামটা বাক্সে ফেলতে গিয়ে যেন চোখ পড়ল ফগের ওপর, চমকে ওঠার ভান করল। পারলে যেন বাক্স থেকে আবার বের করে নেয় চিঠিটা। কিন্তু সে-সুযোগ নেই। দ্বিধা করল এক মুহূর্ত। তারপর বারান্দা থেকে নেমে আরেকবার ফগের দিকে তাকিয়ে রওনা হয়ে গেল বাজারের দিকে, বন্ধুদের খুঁজতে।

কোন লাভ হলো না ডিয়ারহিলসে এসে, সুন্দর একটা দিন কাটানো ছাড়া। উড়োচিঠির লেখকের কোন হদিস করতে পারল না।

শেষ বাসে গ্রীনহিলসে ফিরে চলল ওরা।

দশ

পরদিন সকালে মুসাদের বাড়িতে জমায়েত হলো সবাই।

আগের দিনের ঘটনা নিয়ে আলোচনায় বসল।

মুসার বাবা-মা বাড়ি নেই। জরুরী কাজে বাইরে গেছেন। একা কেবল মিসেস বিন আছে। খানিক পর এসে মুসার ঘরে উঁকি দিল সে। বলল, 'তোমরা থাকো। আমি বেরোচ্ছি। কসাই ব্যাটা এখনও মাংস পাঠাল না। রাঁধব কি? আমি যাই, দেখে আসিগে কি হলো। বাড়ি খালি রেখে বেরোবে না কিন্তু। তোমরা বরং কসার ঘরে গিয়ে খেলো। ফোনটোন এলে ধরতে পারবে।'

মিসেস বিন বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই ফোন বাজল। মুসা গিয়ে ধরল।

ওপাশ থেকে কথা বলল মিসেস জারগন। সাংঘাতিক একটা খবর দিল সে। তার বোনকে নাকি উড়োচিঠি দেয়া হয়েছে। অস্থির হয়ে পড়েছে তার বোন। সেখানে তাকে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছে মিসেস জারগন। আজ আর মুসাদের বাড়িতে কাজে আসতে পারছে না। মুসাকে অনুরোধ করল, মিসেস বিনকে যেন খবরটা দিয়ে দেয়।

মুসা জানতে চাইল, তার বোন চিঠিটা তাকে দেখতে দেবে কিনা?

মিসেস জারগন বলল, 'জানি না। এ সব চিঠি তো লোকে দেখাতে চায় না। তবে বলে দেখতে পারি। তোমরা তো আবার গোয়েন্দা। লেডি অরগাননের বেড়ালটা কি সুন্দর বের করে দিয়েছিলে। হয়তো এই উড়োচিঠির লেখককেও ধরতে পারবে। তাহলে একটা কাজের কাজ হবে।'

'যাক, বুঝতে পেরেছেন। সেই জন্যেই তো আপনার সাহায্য চাইছি,' তেল দেয়ার সুরে বলল মুসা। 'আপনার বোনের ঠিকানাটা বলুন? নাম কি? এখুনি রওনা হচ্ছি।'

ঠিকানা বলল মিসেস জারগন। লিখে নিল মুসা। যাকে চিঠি দেয়া হয়েছে তার নাম মিসেস উইলমার।

টেলিফোনে মুসার কথা থেকেই অনেক কিছু আন্দাজ করে ফেলেছে কিশোর। বাকিটা শুনল মুসার মুখে। বলল, 'তোমরা থাকো, আমি যাচ্ছি।'

'আমি গেলে ক্ষতি কি?' মুসা বলল।

'তোমার বাড়িতে থাকা দরকার, খালি বাড়ি। আন্টি এসে তোমাকে না দেখলে রাগ করতে পারেন। সবার একসঙ্গে যাওয়াও উচিত নয়। ফগের চোখে পড়ে যেতে পারি। সে তো যাবেই ওখানে, জানা কথা।'

বাড়িটা খুঁজে বের করতে কষ্ট হলো না।

দরজা খুলে দিল মিসেস জারগন। 'ও, তুমি এসেছ। মুসা এল না?'

'বাড়ি খালি। ও পাহারা দিচ্ছে।'

'এসো। ভেতরে এসো।'

মিসেস উইলমার মোটাসোটা মহিলা। সারা মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। চোখ লাল, চারপাশ ফুলে আছে। মাথায় হাত দিয়ে মুখ মলিন করে বসে আছে।

কিশোরকে বলল মিসেস জারগন, 'চিঠিটা দেখতে এসেছ তো? আমি বলেছি আমার বোনকে। দেখাতে কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু এ চিঠি বড়দের, তোমাকে দেখানো যাবে না।'

খুব হতাশ হলো কিশোর। 'ঠিক আছে পড়ব না। শুধু হাতের লেখাটা দেখব।'

মাথা নাড়ল মিসেস উইলমার, 'না, তা-ও দেখানো যাবে না। সত্যি বলছি, দেখানোর মত হলে দেখাতাম। তুমি অনেক ছোট। বড় হলে দেখাতে পারতাম।'

'ও। খামটা দেখাতে কোন আপত্তি আছে?'

'না, তা নেই।'

খামটা বের করে দিল মিসেস উইলমার।

আগ্রহের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে নিল কিশোর। অবাক হলো। কোনো পোস্ট মার্ক নেই। বিড়বিড় করে বলল, 'ডাকে আসেনি! কে দিয়ে গেল?'

'জানি না,' মিসেস উইলমার বলল। 'সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে দরজার নিচ দিয়ে কে যেন ফেলে দিয়ে গেছে। টের পেয়েছি ঠিকই, ভেবেছি খবরের কাগজওয়ালা। তাই বিছানা থেকে উঠলাম না। সাড়ে আটটার সময় উঠে দেখি এই চিঠি। তাড়াতাড়ি আমার বোনকে ফোন করলাম,' মিসেস জারগনকে দেখাল সে।

মিসেস জারগনের দিকে তাকাল কিশোর, 'মিস্টার ফগকে জানিয়েছেন?'

'নিশ্চয়।'

সতর্ক হলো কিশোর। এখানে আর কিছু দেখার নেই। ফগ চলে আসার আগেই কেটে পড়ার তাগিদ অনুভব করল। খামের ওপরের ঠিকানা আরেকবার ভালমত দেখল। আগের পাঁচটা খামে যে হাতের লেখা দেখেছে এটাতেও ঠিক একই রকম। বড় বড় করে লেখা পেঁচানো পেঁচানো অক্ষর।

খামটা মিসেস উইলমারকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমি এখন যাই। চিন্তা করবেন না মিসেস উইলমার, এ চিঠি যে লিখেছে তাকে আমরা ধরবই। আমাদের ওপর ভরসা করতে পারেন।'

'নিশ্চয় করবে,' মিসেস জারগন বলল। 'তোমরা যে খুব ভাল গোয়েন্দা আমি বলেছি আমার বোনকে। সেবার লেডি অরগাননের বেড়ালটা যে ভাবে বের করে দিলে সত্যি আশ্চর্য!'

মিসেস জারগনকেও ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়ল কিশোর।

সবে দরজা খুলে বেরিয়েছে, আর অমনি একেবারে বাঘের মুখে।

দরজার বেল বাজাতে হাত বাড়িয়েছিল ফগ। কিশোরকে দেখে থমকে গেল। পরক্ষণেই থাবা দিয়ে চেপে ধরল হাত, 'ঝামেলা! এখানে কি?'

কিশোরও সামলে নিল। 'ছাড়ুন ছাড়ুন, হাত ছাড়ুন! ব্যথা লাগছে!'

'এখানেও এসেছ নাক গলাতে! কেন এসেছ, বলো?'

'ও নাক গলাতে আসেনি,' দরজার কাছ থেকে জবাব দিল মিসেস জারগন। 'চিঠিটার কথা শুনে দেখতে এসেছে। খারাপ কিছু করেনি।'

কঠিন দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল ফগ। 'কাল তোমাকে ডিয়ারহিলসের পোস্ট অফিস থেকে চিঠি পাঠাতে দেখেছি? কার কাছে পাঠিয়েছ?'

'সেটা আপনার ব্যাপার নয়। যার কাছে ইচ্ছে চিঠি পাঠাতে পারি আমি।'

'সাবধানে কথা বলবে!' ধমকে উঠল ফগ। 'যেখানে ইচ্ছে পাঠাতে তুমি পারো না! মানুষের শান্তি নষ্ট করার কোন অধিকার তোমার নেই! যদি বলি মিসেস উইলমারকে উড়োচিঠি তুমিই লিখেছ?'

'তাহলে হদ্দ বোকা প্রমাণিত হবেন...'

'খবরদার!'

'শুধু শুধু ছেলেটাকে ধমকাচ্ছেন কেন?' মিসেস জারগন বলল। 'ও এ সব লিখতে যাবে কেন? তা ছাড়া ডাকে আসেনি ওটা।'

'ডাকে আসেনি!'

'না,' মাথা নাড়ল মিসেস জারগন। 'কে জানি দরজার ফাঁক দিয়ে ফেলে গেছে।'

কিশোরকে ফাঁসাতে পারল না বলে বড়ই হতাশ হলো ফগ। 'ঝামেলা! তাই নাকি?' আপনাআপনি কিশোরের হাত থেকে আঙুলগুলো খুলে গেল তার। 'চলুন তো, দেখি।'

কিশোরও আর দাঁড়াল না ওখানে। হাসিমুখে সাইকেলের দিকে রওনা হলো। বোকা বানাতে চেয়েছিল ফগকে, সফল হয়েছে। আগের দিন তাকে ডিয়ারহিলসে চিঠি পোস্ট করতে দেখে ঠিকই সন্দেহ করেছে—উড়োচিঠি লেখা কিশোরের কাজ। কিন্তু ফগ তো আর জানে না, নিজের নামেই গতকাল খামটা পোস্ট করেছিল সে।

…রে চিঠিপত্র কিচ্ছু ছিল না।

এগারো

পাশাদের বাড়িতে ফিরে এল কিশোর।

ফগের বোকা বনার কাহিনী শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল সবাই। অবাক হলো চিঠিটা ডাকে আসেনি শুনে।

রবিন বলল, 'তারমানে কোনো কারণে গতকাল ডিয়ারহিলসে যায়নি চিঠি যে লিখেছে। কিংবা হয়তো টের পেয়ে গেছে, অথবা কোনো ভাবে জেনে গেছে আমরা না ফগ সোয়া দশটার বাসে করে যাব। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে আর তাই যায়নি। আজ সকালে নিজেই গিয়ে চিঠিটা দিয়ে এসেছে মিসেস উইলমারের বাড়িতে।'

'হ্যাঁ, এটা হতে পারে,' একমত হলো কিশোর।

'আচ্ছা, একটা কাজ তো করতে পারি আমরা,' উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন। সোয়া দশটার বাসের কন্ডাকটারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারি, সোমবারে গ্রীনহিলস থেকে নিয়মিত কে কে ডিয়ারহিলসে যায়।'

'না, সেটা উচিত হবে না। হাজারটা কৈফিয়ত দিতে হবে তাকে। তা ছাড়া তার চেয়ে ভাল উপায় যখন আছে, তার কাছে যাব কেন?'

'কি? কি উপায়?' প্রায় একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল রবিন, মুসা আর ফারিহা।

হাসল কিশোর। 'মিস টোমার নিয়মিত ডিয়ারহিলসে যায়। তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারি সোমবারে আর কেউ যায় কিনা।'

'ঠিক, ঠিক!' আবার একসঙ্গে বলল তিনজনে।

'চলো, এখুনি,' তর সইছে না মুসার।

'কিন্তু বাড়ি খালি…' বলতে গেল কিশোর।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ফারিহা বলল, 'ওই যে, মিসেস বিন ফিরেছে।'

বেরোতে আর কোন বাধা নেই। টিটুকে ছাউনিতে আটকে রেখে দেয়াল ডিঙিয়ে লেডি অরগাননের বাগানে চলে এল ওরা।

ভাগ্য ভাল, মিস টোমারকে বাগানেই পাওয়া গেল। দামী বেড়ালগুলোকে দেখাশোনা করে যে মেয়েটা, আইলিন, তার সঙ্গে কথা বলছে।

ছেলেমেয়েদের সাড়া পেয়ে ঝটকা দিয়ে মাথা ঘোরাতে গিয়ে নাক থেকে চশমা খসে পড়ল মিস টোমারের।

সঙ্গে সঙ্গে গুণল ফারিহা, 'একবার!'

'তোমরা?' মিস টোমার বলল। 'এসো, এসো। ড্যাফোডিলগুলো যে ফুটেছে

দেখতে এসেছ বুঝি?'

'না, আমরা…' বলতে গিয়ে গোড়ালিতে কিশোরের লাথি খেয়ে আঁউ করে উঠল মুসা। চুপ হয়ে গেল।

এগিয়ে গেল কিশোর, 'ফুলগুলো নিশ্চয় খুব সুন্দর?'

'হ্যাঁ, খুব,' জবাব দিল মিস টোমার। 'এসো, দেখাব।'

হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আপনার আম্মা কেমন আছেন?'

'ভাল না,' আলতো হোঁচট খেলো মিস টোমার। গেল নাক থেকে চশমা খসে। ফারিহা জোরে জোরে গুণল দুই। তার দিকে তাকাল মহিলা। বিরক্ত হলো মনে হলো, তবে কিছু বলল না। 'তবে আমাকে দেখে আম্মা খুব খুশি হয়েছে।'

'ডিয়ারহিলস জায়গাটা কিন্তু খুব সুন্দর,' আলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে বলল কিশোর। 'আপনার ভাল লাগে না?'

'লাগে।'

'অনেকেরই লাগে মনে হয়। বাসে করে আরও অনেকেই তো যায় দেখলাম। যারা যায় সবাইকে চেনেন নাকি?'

'না, সবাইকে চিনি না। অনেক অচেনা লোকও যায়। কাল যেমন গিয়েছে একজন।'

কার কথা বলল মিস টোমার বুঝতে পারল কিশোর, গোমড়ামুখো লোকটা।

'তবে গ্রীনহিলস থেকে যারা যায়, তাদেরকে চিনি। সোমবারে নিয়মিত যায় তিনজন, কাল অবশ্য তাদের একজনও যায়নি।'

'তারা কারা?'

কিশোরকে অতটা আগ্রহী হতে দেখে থমকে দাঁড়াল মিস টোমার। নাক থেকে চশমা খসে পড়ল। ফারিহাও গুণল, 'তিন!' এইবার চটে গেল মিস টোমার। বলল, 'এত গোণো কেন?'

লজ্জা পেয়ে কুঁকড়ে গেল ফারিহা। মিস টোমার যে এ ভাবে রেগে যাবে ভাবেনি। বলল, 'সরি! আর গুণব না!'

'তারা কারা, মিস টোমার?' আবার জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আবার কি কোনো নতুন কেস পেয়েছ?' পাল্টা প্রশ্ন করল মিস টোমার।

'না না,' তাড়াতাড়ি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল কিশোর, 'কেস নয়। জানতে চাইছি আমরা তাদের চিনি কিনা?'

'কি জানি, না-ও চিনতে পারো। একজনের নাম মিস ব্যাটার। দরজি। মেয়েদের পোশাক বানায়। পোশাক বেচতে যায় ডিয়ারহিলসের বাজারে।'

'ও। আপনার বন্ধু নাকি?'

'আরে নাহ্! ও কারও বন্ধু হতে পারবে না। খালি মানুষের গোপন কথা খুঁজে বেড়ায়, বদনাম ছড়ায়, এর কথা ওর কাছে বলে, ওর কথা তার কাছে। আমার একেবারে ভাল লাগে না এই স্বভাব।'

হ্যাঁ, এই মহিলার পক্ষে উড়োচিঠি লেখা সম্ভব—ভাবল গোয়েন্দারা।

'ওই দেখো, কি রকম ফুটেছে,' ড্যাফোডিলগুলো দেখা যেতে বলল মিস

টোমার। 'খুব সুন্দর, না?'

'দারুণ!' রবিন বলল। 'সত্যি সুন্দর।'

সবাইকে নিয়ে ঘাসের ওপর বসল মিস টোমার।

কিশোর বলল, 'মিস ব্যাটারের কথা বলুন। আর কি জানেন তার সম্পর্কে?'

'লেডি অরগাননের পোশাক বানানোর প্রয়োজন হলে তাকে খবর দেয়া হয়। আসে; এসেই শুরু করে এর-ওর বদনাম। কথা বলতে গেলেই যন্ত্রণা। এমন সব প্রশ্ন করবে, জবাব দিতে গেলে মানুষের কুৎসা হয়ে যাবে। এ হপ্তায় আসার কথা আছে। ও বাড়িতে ঢোকার আগেই পালাব আমি। কে যায় ফালতু প্যাচাল পাড়তে।'

'ওকে আপনি দেখতে পারেন না,' ফারিহা বলল।

নাক কুঁচকাতে গিয়ে চশমা খসে গেল মিস টোমারের। আড়চোখে চট করে একবার ফারিহার দিকে তাকিয়ে, সেটা তুলে আবার নাকে বসাতে বসাতে বলল, 'না পারি না। ও রকম মানুষকে কেউই দেখতে পারে না।'

মনে মনে না গুণে থাকতে পারল না ফারিহা, 'চার!'

'যাওয়া দরকার,' বলল কিশোর, কিন্তু ওঠার সামান্যতম লক্ষণ দেখাল না সে। 'হ্যাঁ, আরও দু-জনের কথা যে বললেন তারাও মহিলা নাকি?'

'একজন পুরুষ, বুড়ো নরিস। মাঠের ধারে একটা ক্যারাভানে বৌকে নিয়ে থাকে। নাকটা এত বড় আর বাঁকা, মনে হয় ঈগলের ঠোঁট। ঝোলা গোঁফ। আনমনে কি জানি বিড়বিড় করতে থাকে সারাক্ষণ। দুনিয়ার সব ব্যাপারেই যেন আগ্রহ। দেখা হলেই আমাকে প্রশ্ন করতে থাকে। আমার কথা জিজ্ঞেস করে, আমার মায়ের কথা জিজ্ঞেস করে, লেডি অরগাননের কথা জানতে চায়। নানা কথা। ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে। এমনকি মালীকে কত বেতন দেন লেডি অরগানন সেটা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে।'

চট করে সবার দিকে তাকিয়ে নিল একবার কিশোর। অর্থাৎ, এই লোককেও সন্দেহ করা যেতে পারে। লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন? এই যার স্বভাব, সে মজা দেখার জন্যেও মানুষকে ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখতে পারে।

'আর অন্যজন?' জানতে চাইল কিশোর।

মুসার দিকে তাকাল মিস টোমার, 'তোমার তো জানা থাকার কথা, মুসা। তোমাদের মিসেস বিন। সে যে ডিয়ারহিলসে যায় জানো না?'

রীতিমত চমকে গেল গোয়েন্দারা।

মুসা বলল, 'সোমবারে তার ছুটি থাকে। কোথায় যায়, কি করে, জানব কি ভাবে?'

'তাহলে কাল যায়নি কেন?'

'আমাদের আরেকজন কাজের মানুষ কয়েক দিনের জন্যে ছুটি নিয়েছে। সে-জন্যেই বোধহয় এই সোমবারে মিসেস বিনকে ওভারটাইম করে দিতে অনুরোধ করেছে মা।'

'ও।'

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'এই তিনজন বাদে গ্রীনহিলসের আর কেউ যায় না, না?'

'না। আর কেউ না।' সরাসরি রবিনের চোখের দিকে তাকাল মিস টোমার, 'কিন্তু ওই বাস আর যাত্রীদের ব্যাপারে বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছ। ব্যাপারটা কি বলো তো?'

'না...এমনি...আরও...' সাহায্যের আশায় কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'মুসা, তোমার বেড়াল না খুঁজে বসে আছো কেন? দেখো না, কোথায়?'

অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা।

চোখ টিপল কিশোর।

বুঝল মুসা, মিস টোমারের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার জন্যেই চালাকিটা করছে কিশোর। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল সে বেড়াল খোঁজার জন্যে। দেখাদেখি রবিনও উঠল।

ফারিহাকে বলল কিশোর, 'তুমি বসে আছ কেন?'

সবাই উঠে বেড়াল খুঁজতে শুরু করল।

মিছেমিছি কয়েক মিনিট খোঁজাখুঁজি করে বলল মুসা, 'না, এখানে বোধহয় আসেনি। চলো, বাড়ি যাই।'

মিস টোমারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যত জলদি সম্ভব সেখান থেকে সরে এল ওরা।

দেয়াল টপকে অন্য পাশে নেমেই ফারিহা বলে উঠল, 'মিসেস বিন হতেই পারে না। লিলির জন্যে কত কিছু করল। না, ও হতে পারে না। কি বলো, কিশোর?'

'হয়তো,' চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। 'মিস ব্যাটার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বুড়ো নরিসকেও বাদ রাখা উচিত না। যাই হোক, তদন্ত করার জন্যে আরও কিছু তথ্য পাওয়া গেল। সন্দেহ করার মত তিনজন।'

'কি তদন্ত করবে?' রবিনের প্রশ্ন।

'জানার চেষ্টা করব আজ সকাল সাড়ে ছ'টায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল কোনজন। কার পক্ষে মিসেস উইলমারের দরজার নিচ দিয়ে চিঠি ঠেলে দেয়া সহজ ছিল?'

বারো

সবাইকে নিয়ে বেরোলে ঝামেলা হতে পারে ভেবে এবারও একাই তদন্ত করতে বেরিয়ে গেল কিশোর।

অপেক্ষা করতে লাগল মুসা, ফারিহা আর রবিন। টিটুও চুপ। ফারিহার পায়ের কাছে চুপ করে শুয়ে আছে। কি করে জানি বুঝে গেছে খেলা করার সময় নয় এটা।

আর খেলা এখন খেলবে না কেউ।

এক ঘণ্টা পেরোল...সোয়া এক...দেড়...

বসে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। হঠাৎ জানালা দিয়ে তাকিয়ে ফারিহা বলে উঠল, 'ওই যে, আসছে।'

হুড়মুড়িয়ে উঠে দাঁড়াল টিটু। বলল, 'ঘাউ!'

হুড়াহুড়ি করে মুসা আর রবিনও জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। কিশোরের সাইকেলে চেপে আসছে কসাইয়ের দোকানের একটা ছেলে। সাইকেলটা না চেনা থাকলে, আর ইদানীং কিশোরের ঘন ঘন ছদ্মবেশ নেয়ার কথা জানা না থাকলে তাকে চিনতেই পারত না ওরা।

মুসার ঘরের নিচে এসে সাইকেল রেখে ওপরে তাকিয়ে নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'ঘরে আর কেউ আছে?'

মুসা জানাল, 'নেই। উঠে এসো।'

কসাই-বালকের ছদ্মবেশ নিয়ে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকতে চাইল না কিশোর। কেউ দেখে ফেললে ঢুকতে দেবে না। দেবে নিজের পরিচয় দেয়ার পর। তখন দিতে হবে হাজারটা কৈফিয়ত। অত ঝামেলায় কে যায়। তার চেয়ে জানালা দিয়ে ঢুকে পড়াটাই নিরাপদ।

কিশোর ঘরে ঢুকতেই রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কি জেনে এলে? ছদ্মবেশ নিয়েছ কেন?'

'আরে বাবা একটু দম নিতে দাও। অনেক কিছু জেনেছি।'

চেয়ারে বসল কিশোর। মিনিটখানেক চুপ করে দম নিল। মুসার মনে হলো, এটা তার একটা শয়তানি। ওদেরকে অস্থির করে তোলার জন্যেই এই আচরণ করছে কিশোর।

যাই হোক, অবশেষে বলল কিশোর, 'ছদ্মবেশ নিয়েছি লোকের সঙ্গে সহজে মেশা যাওয়ার জন্যে। কসাইয়ের দোকানের ছেলে যদি গিয়ে লোকের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে থাকে, কেউ সন্দেহ করবে না। ভাববে খদ্দের জোগাড়ের চেষ্টা করছে।'

'বুঝলাম,' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল মুসা। 'তা জেনে এলে কি?'

তাকে আরও অধৈর্য করে দিয়ে ধীরে সুস্থে ছদ্মবেশ খুলল কিশোর। তারপর বলল, 'বুড়ো নরিস সাড়ে ছয়টার আগেই তার কুত্তাটাকে নিয়ে হাঁটতে বেরিয়েছিল। যে রাস্তা ধরে গিয়েছিল সেই রাস্তাতেই মিসেস উইলমারের বাড়ি। ফিরেছে আটটায়।'

স্তব্ধ হয়ে শুনছে সবাই। পিনপতন নীরবতা।

'মিস ব্যাটারও বেরিয়েছে কুত্তা নিয়ে,' বলতে থাকল কিশোর, 'সাড়ে ছয়টায়। একই রাস্তা ধরে গিয়েছে। মিসেস উইলমারের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে পথের পাশেই তার বাড়ি। একটা লাল শাল গায়ে ছিল তার।

'মিসেস বিনও আজ খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেছে। বুড়ো নরিসের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেছে।' মুখ তুলে বন্ধুদের দিকে তাকাল কিশোর। 'তারপর,

গোয়েন্দারা, কি বুঝলে? তিনজনের যে কেউ দরজার ফাঁক দিয়ে চিঠিটা ফেলে আসতে পারে, তাই না?'

'তুমি এত সব জানলে কি করে?' তাজ্জব হয়ে গেছে ফারিহা।

'সহজ। মিসেস উইলমারের বাড়ির পাশে যে মাঠ আছে সেখানে ভেড়া চরায় বুড়ো হারপিক। ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে ভেড়া চরাতে নিয়ে যায়। বসে বসে তো আর কোনো কাজ নেই, তাকিয়ে থাকে রাস্তার দিকে। মানুষ দেখে। শকুনের চোখ বুড়োটার। কোনো কিছু এড়ায় না। মাংস দেয়ার লোভ দেখিয়ে তার কাছ থেকেই আদায় করলাম সমস্ত কথা।'

'আর কি বলল?' জানতে চাইল রবিন।

'বলল, খুব ভোরে ওঠে বুড়ো নরিস। কুত্তা নিয়ে বেরোয়। বনে যায়। প্রায়ই শিকার নিয়ে ফেরে। ফাঁদ পেতে শিকার ধরে, কখনও কাঠবেড়ালি, কখনও খরগোশ। সে-সব বিক্রি করতে যায় ডিয়ারহিলসে। মিস ব্যাটারও রোজ সকালে কুত্তা নিয়ে হাঁটতে বেরোয়। নিয়মিত। তাতে অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়নি হারপিকের। মনে হয়েছে কেবল মিসেস বিনের বেলায়। তাকেই ওখানে প্রথম দেখা গেছে।'

'তারমানে সে-ই আমাদের আসামী!' বলে উঠল মুসা।

'চুপ!' সাবধান করল রবিন, 'আসছে!'

দরজায় উঁকি দিল মিসেস বিন। গোমড়ামুখে বলল, 'হাতমুখ ধুয়ে এসো। খাবার রেডি।'

ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল মুসা, 'মিসেস বিন, আজ ভোরবেলা নাকি মিসেস উইলমারের বাড়ির সামনে দিয়ে গিয়েছিলেন?'

থমকে গেল মিসেস বিন। ঘরে ঢুকে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। 'কে বলেছে?'

বোকামিটা করে ফেলায় নিজেকে লাথি মারতে ইচ্ছে হলো মুসার। কিন্তু তীর ফসকে গেছে, আর ফেরানো যাবে না। বলল, 'বুড়ো হারপিক।'

'ওই শকুনটা! খালি লোকের ওপর নজর রেখে বেড়ায়! একদিন ওর মাথাটা ভাঙব আমি! হ্যাঁ, গিয়েছিলাম, তাতে কি? বুড়ো নরিসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। মা'র সঙ্গে কাল দেখা করতে যেতে পারিনি, কোন খবরও দিতে পারিনি। চিন্তা করবে। নরিস তো প্রায়ই যায় ডিয়ারহিলসে। জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম আজও যাবে কিনা। গেলে মা'র জন্যে কিছু খাবার পাঠাতাম।'

'ও।'

'কেন, আমি কোথায় গেলাম না গেলাম তার জন্যে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি?'

'না না···এত সকালে তো কখনও ওঠেন না···তাই ভাবলাম···'

'ভাবাভাবি বাদ দিয়ে খেতে এসো। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আর গরম করে দিতে পারব না।'

মুসা আর ফারিহা খেতে চলে গেল।

কিশোর আর রবিন বেরিয়ে এল। ওদেরকেও খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি করেছে

মুসা, কিন্তু ওরা রাজি হয়নি। দুপুরের খাওয়া বাড়িতে খেতে বলে দেয়া হয়েছে। ছদ্মবেশের জিনিসগুলো সাইকেলের বাস্কেটে রাখল কিশোর। টিটুর তাতে অসুবিধে হয়ে গেল। সাইকেলের পাশে পাশে দৌড়ে যেতে হবে। বেচারাকে কষ্ট দিতে চাইল না বলে হেঁটে চলল কিশোর।

রবিনও চলল পাশাপাশি। বলল, 'কিশোর, মিসেস বিনই অকাজটা করছে, কি বলো?'

'হতে পারে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'শুধু যদি লিলিকে লিখত, তাহলে শিওর হতে পারতাম। ভাবতাম, ওকে তাড়িয়ে ভাইঝিকে আনার জন্যে ফন্দি করেছে। কিন্তু চিঠি তো আরও অনেকে পেয়েছে। তাদেরকে খোঁচানোর অর্থটা কি?'

'হ্যাঁ, তা-ও তো বটে!'

এক জায়গায় এসে মোড় নিয়ে আরেক দিকে চলে গেল রবিন, কিশোর চলল তার পথে।

দুপুরের খাওয়া শেষে, কথামত বেলা আড়াইটায় আবার মুসাদের বাড়িতে হাজির হলো দু-জনে। ঢুকতেই দেখা উত্তেজিত মুসা আর ফারিহার সঙ্গে।

ফারিহা বলল, 'ঝামেলা এসেছে! ঝগড়া করছে মিসেস বিনের সঙ্গে!'

'কেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'ফগ জেনে গেছে লিলি যে হোমে ছিল সেটাতে চাকরি করত মিসেস বিন। সাংঘাতিক বদমেজাজী ছিল। প্রায়ই তার নামে নালিশ যেত। লিলিও নাকি একবার তার নামে নালিশ করেছিল ম্যাট্রনের কাছে। খোঁজ নিয়ে সেটা জেনে ফেলেছে ফগ। জিজ্ঞেস করতে ছুটে এসেছে মিসেস বিনের কাছে।'

রান্নাঘরের দিকে দৌড় দিল কিশোর। পেছনে তার দলবল। খোলা জানালার নিচে দাঁড়িয়ে ভেতরের সব কথা শোনা যায়। ওখানেই আড়ি পাতল ওরা।

চিৎকার করছে মিসেস বিন, 'অহেতুক আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন, মিস্টার ঝামেল্যাম্পারকট!'

'না, করছি না। আপনি ভুল করছেন। আমি কেবল কয়েকটা সাধারণ প্রশ্ন করতে এসেছিলাম। আপনিই অহেতুক চেঁচামেচি করছেন। কাজটা ভাল করছেন না।'

'কী, আমাকে হুমকি দিচ্ছেন!'

'দেয়ার প্রয়োজন পড়লে তাই দেব। এখনও পড়েনি। আপনার এই আচরণের কথা আমার মনে থাকবে। চলি, গুড বাই।'

একদৌড়ে রান্নাঘরের কাছ থেকে সরে গেল গোয়েন্দারা।

বাইরে বেরিয়ে সাইকেলে চড়ল ফগ। ওদের দেখতে পেল না। ঘাড়, মুখ টকটকে লাল হয়ে গেছে তার। ভীষণ রাগা রেগেছে।

কথা বলার জন্যে ছাউনিতে চলে এল ওরা।

বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ কথা শুনতে পেল। একজন মহিলা বলছে, 'আর পারবেন না, মিসেস বিন। কাপড়ও বানাতে জানে না। বললাম, অত টাইট

পোশাক ভাল না। তা-ও শুনবে না। বানাবেই। আমি লেডি অরগাননের কথা বলছি।'

বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল গোয়েন্দারা। দেয়ালের ওপাশ থেকে মাথা উঁচু করে আছে একজন মহিলা। চিনতে পারল কিশোর। মিস ব্যাটার। নিশ্চয় লেডি অরগাননের পোশাকের মাপ নিতে এসেছে। কোনভাবে টের পেয়েছে সজি বাগানে আছে মিসেস বিন, ব্যস, চলে এসেছে কুৎসা গাইতে।

ফগের সঙ্গে ঝগড়া করে মেজাজ খারাপ হয়ে আছে মিসেস বিনের। বলল, 'আমার গাউনটাও তো ঠিক হয়নি। কতবার বললাম, একটু ঠিক করে দিতে। সেই যে বানিয়ে দিয়ে চলে গেলেন, আর দেখা নেই। আজকে দেবেন?'

'আজ তো সময় নেই,' উসখুস করতে লাগল মিস ব্যাটার। বুঝল আলাপ জমবে না। 'সময় করে আরেকদিন এসে করে দেব। ওই যে, মিস টোমার ডাকছে। চলি।'

গজগজ করে কি বলল মিসেস বিন, বোঝা গেল না। কিছু লেটুস আর গাজর তুলে নিয়ে চলে গেল বাড়ির দিকে।

তেরো

পরদিন সকালে কসাই-বালকের ছদ্মবেশে মুসাদের বাড়িতে এল কিশোর। যদি কোন তদন্তের প্রয়োজন পড়ে, এ জন্যে পোশাকটা পরে তৈরি হয়েই এসেছে।

জানালা দিয়ে তাকে এক ঝলকের জন্যে চোখে পড়ল মুসার আম্মার। ভাবলেন, ভালই হলো। মিসেস বিনকে আর কষ্ট করে কসাইয়ের দোকানে যেতে হবে না। কসাই তার সহকারীকে দিয়ে মাংস পাঠিয়ে দিয়েছে।

আসলে তো রান্নাঘরে গেল না কিশোর। জানালা দিয়ে মুসার ঘরে ঢুকল।

সে ঢুকেও সারতে পারল না, প্রচণ্ড হই-চই বেধে গেল। কি ব্যাপার? জানা গেল, মিসেস বিনও একটা উড়োচিঠি পেয়েছে। মহা চেঁচামেচি করে মুসার আম্মাকে জানাচ্ছে সে-কথা।

অনেক কষ্টে তাকে শান্ত করে ফগকে ফোন করলেন মিসেস আমান।

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা করছে গোয়েন্দারা। এ রকম কিছু ঘটবে কল্পনাই করতে পারেনি ওরা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সাইকেলে করে হাজির হলো ফগ। বসার ঘরে ঢুকল। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে সবই দেখল গোয়েন্দারা।

আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে। মুসার আম্মাকে জানাল ফগ, উড়োচিঠি একটা তাকেও দেয়া হয়েছে। নানা আজেবাজে কথা লেখা হয়েছে তাতে। মাথামোটা আর বলদ বলে গাল দেয়া হয়েছে।

শুনে হেসে ফেলল ফারিহা আর মুসা।

শব্দ শুনে ওপর দিকে তাকিয়ে ওদের দেখে ফেললেন মিসেস আমান আর ফগ।

ধমক খেয়ে সরে আসতে হলো গোয়েন্দাদের।

সবার পেছনে ছিল কিশোর। ভাবতে লাগল, 'আমাকে দেখে ফেলল না তো ফগ? কসাই-বালকের ছদ্মবেশে? তাহলে বেকায়দা হয়ে যাবে!'

বোধহয় দেখেনি ফগ, উড়োচিঠির ব্যাপারটা নিয়ে মশগুল। দেখলে উঠে আসত। রান্নাঘরে গেল মিসেস বিনের সঙ্গে কথা বলতে।

কথা বোঝা গেল না পরিষ্কার, তবে ঝগড়া যে বেধে গেছে আবার সেটুকু বোঝা গেল। খানিক পর রেগেমেগে গটমট করে বেরোতে দেখা গেল ফগকে।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইলেন মিসেস আমান।

'নাহ্, কোন রকম সহযোগিতার মনোভাব নেই মিসেস বিনের! ঝামেলা!...মিসেস আমান, আপনি কোন সাহায্য করতে পারেন? অপরিচিত কাউকে আজ বাড়িতে ঢুকতে দেখেছেন?'

'একটা ছেলে এসেছিল একটু আগে, বোধহয় কসাইয়ের দোকান থেকে। মোটাসোটা, লাল চুল...'

'লাল চুল?'

'হ্যাঁ, লাল চুল। কেন?'

'না, এমনি। ইদানীং বড় বেশি লাল চুলওয়ালা ছেলেদের দেখা যাচ্ছে এই গাঁয়ে। টেলিগ্রাফ-বয় ছেলেটার চুল লাল, কসাইয়ের ছেলেটার চুল লাল...নাহ্, খোঁজ নিতে হচ্ছে দেখছি!'

আরও দু-চারটা টুকটাক কথার পর বেরিয়ে গেল ফগ।

পরদিন খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল ফগ আর কিশোর। দু-জনের দুই কাজ। ফগ বেরোল লাল চুল ছেলেগুলোকে খুঁজতে। আর কিশোর বেরোল সন্দেহভাজন লোকজনের হাতের লেখা জোগাড় করতে।

আজ বেরোল মেসেঞ্জার-বয়ের ছদ্মবেশে। মাথায় লাল পরচুলাই পরল। ফগ দেখলে যাতে আরও দ্বিধায় পড়ে যায়।

প্রথমে গেল বুড়ো নরিসের কাছে। ক্যারাভানের বাইরে অলস ভঙ্গিতে বসে ঢুলছে বুড়ো। সাইকেলের ঘণ্টা শুনে চোখ মেলে তাকাল। 'কি চাই?'

'আপনার নামে একটা পার্সেল আছে।'

'আমার নামে পার্সেল? কে পাঠাল?'

'তা জানি না। নিন। নিয়ে এই কাগজটায় সই করে দিন।'

প্যাকেটটা নিয়ে শুঁকে দেখল নরিস। দামী তামাকের চমৎকার গন্ধে চোখ চকচক করে উঠল তার। খুলতে গেল।

বাধা দিল কিশোর, 'মাল বুঝে পেয়েছেন আগে এ কথা লিখুন। নাম-ঠিকানা লিখে সই করে দিন। কাগজটা আমাকে জমা দিতে হবে অফিসে। নইলে চাকরি থাকবে না।'

'আমি সই করতে পারব না!'
'তাহলে আমিও প্যাকেট দিতে পারব না।'
'আমার জিনিস আমাকে দেবে না কেন?'
'আপনারই বা সই করতে এত আপত্তি কেন?'
চেঁচামেচিতে ক্যারাভান থেকে বেরিয়ে এল বুড়োর বউ। জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'
জানাল কিশোর।
'বেশ, দাও, আমিই সই করে দিচ্ছি।'
'আপনার সইতে হবে না। যার নাম আছে ফর্মে, তাকে করতে হবে।'
'কেন, আমি দিলে হবে না কেন? আমরা তো একই পরিবারের মানুষ।'
'যার নামে এসেছে তার সই করার নিয়ম।'
'আমি করতে পারব না!' গোঁ ধরে রইল বুড়ো নরিস। ওদিকে প্যাকেটও ফেরত দেবে না।
কিশোরের হাত ধরে একপাশে টেনে নিয়ে গেল বুড়ি। 'আসল কথা শোনো। ও লেখাপড়া জানে না। সই করবে কি করে?'
এইবার দ্বিধায় পড়ে গেল কিশোর। ভেবে নিয়ে বলল, 'কি আর করা। দিন তাহলে সই করে।'
এরপর মিস ব্যাটারের কাছে যাবে। ভাবতে ভাবতে চলল সে, বুড়ো সত্যিই যদি লেখাপড়া না জানে সন্দেহের তালিকা থেকে সে পুরোপুরি বাদ।
কে তাকে উপহার পাঠাল ভেবে অবাক হলেও মিস ব্যাটার কোন গণ্ডগোল করল না। রঙিন সুতোর প্যাকেটটা বুঝে নিয়ে সই করে দিল।
মিসেস বিনের কাছে চলল এরপর কিশোর।
মহিলার যা স্বভাব, ত্যাঁদড়ামি খানিকটা করলই। নাম-ঠিকানা লিখে সই করল বটে, তবে উল্টোপাল্টা। প্রতিটি শব্দের মধ্যে কিছু অক্ষর লিখল বড় হাতের, কিছু ছোট হাতের। কেন করল এ কাজ, কিশোর জানতে চাইলে খেঁকিয়ে উঠল, 'লেখার অভ্যেস নেই আমার! সেই যে ছোটবেলায় ইস্কুলে লিখেছি, তারপর থেকে বাদ। লেখাপড়া অত জানি না।'
কিন্তু কিশোরের মনে হতে লাগল, এটা স্রেফ শয়তানি। অভ্যাস না থাকলে হাতের লেখা খারাপ হতে পারে; দুই রকমে মিশিয়ে দেবে কেন?
যাই হোক, লেখা জোগাড় করতে পেরে খুশি হলো সে। রবিনদের বাড়ি চলল।
মুসাদের বাড়িতে যখন-তখন ফগ এসে হাজির হয়, তাই এখানে আড্ডা দেয়া নিরাপদ নয় ভেবে আজ রবিনদের বাড়িতে জমায়েত হয়েছে সবাই। মুসা আর ফারিহাও চলে গেছে সেখানে।
রাস্তায় বেরিয়ে নিশ্চিন্ত মনে শিস দিতে দিতে সাইকেল চালাল কিশোর। সতর্ক থাকলে অবশ্য অঘটনটা ঘটত না। মোড় ঘুরতেই ধাক্কা লাগিয়ে দিল আরেকটা সাইকেলের সঙ্গে। আর সেই সাইকেলের আরোহী স্বয়ং ফগর্যাম্পারকট।
লাল চুলওয়ালা ছেলের সন্ধানে বেরিয়েছিল সে। পোস্ট অফিসে গিয়ে ওরকম কোন টেলিগ্রাফ বয়ের দেখা পায়নি। পোস্ট মাস্টার সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তেমন

চোবার কোন কর্মচারী নেই তাঁদের অফিসে। গ্রামে কসাই আছে দু-জন। তাদের সহকারীও আছে। কিন্তু একটা ছেলেরও লাল চুল নেই। ব্যাপারটা বিস্মিত করেছে ফগকে। তার ধারণা হয়েছে, মুসাদের বাড়িতে কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে—যেহেতু মুসার আম্মা কসাই-বালকটাকে দেখেছেন। সুতরাং সেদিকেই চলেছিল সে, পথের মধ্যে এই সংঘর্ষ।

সাইকেল সোজা করে কিশোরের দিকে তাকাল সে। লাল চুলওয়ালা মেসেঞ্জার-বয়কে দেখে চোখ কপালে উঠল। আবার লাল চুল! এবং অপরিচিত ছেলে! নিশ্চয় অন্য দুটো ছেলের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে। আর যাবে কোথায়। কিশোরকে ধরে ফেলল সে। কোনমতেই ছুটতে পারল না কিশোর। সাইকেল সহ তাকে পাকড়াও করে নিজের বাড়িতে নিয়ে এল ফগ। ওপরের চিলেকোঠায় বন্দি করে রাখল। জরুরী টেলিফোন সারতে নিচে নামল। কাজ সেরে গিয়ে তারপর জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তেমন বুঝলে কিঞ্চিত ধোলাই দিতেও ছাড়বে না। অনেক জ্বালান জ্বালাচ্ছে তাকে লালচুলো ছেলেগুলো!

চোদ্দ

মাথা গরম করল না কিশোর। এ রকম বিপদে আরও পড়েছে। প্রথমেই এল জানালার কাছে। এদিক দিয়ে বেরোনো যাবে না, বুঝতে পারল। রাস্তার ধারে বাড়ি। লোক চলাচল আছে। জানালা দিয়ে বেরোতে গেলে কারও না কারও চোখে পড়ে যাবে। চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হবে। আবার ধরা পড়ে যাবে সে।

দরজার তালাটা পরীক্ষা করল। তালা লাগানো, তবে চাবিটা রয়েছে তালার ফুটোতে। বিচিত্র হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। পকেটে প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব নেই। গোয়েন্দাগিরি করে। এ সব রাখতে হয়।

খুঁজেপেতে ঘরের কোণ থেকে একটা খবরের কাগজ নিয়ে এল। দরজার নিচের ফাঁক দিয়ে বাইরে ঠেলে দিল সেটা। পকেট থেকে একটুকরো তার বের করে তালার ফুটোতে লাগিয়ে ঠেলা দিতে ওপাশে চাবিটা খসে পড়ল কাগজের ওপর। আস্তে করে কাগজটা ভেতরে টেনে আনতেই চাবিটাও এল তার ওপরে। তালা খুলে এখন বেরিয়ে যাওয়াটা কিছুই না। এই চালাকি করে দরজা-বন্ধ ঘর থেকে অনেক বেরিয়েছে সে।

কাগজটা আবার আগের জায়গায় ফেলে রাখল কিশোর। দরজা খুলে বেরিয়ে আবার আগের মত বন্ধ করে দিল। তালা লাগিয়ে ফুটোতে রেখে দিল চাবিটা। সিঁড়ি বেয়ে নেমে দেখল ফোন করতে ব্যস্ত ফগ। পা টিপে টিপে সরে এল বাথরুমের দিকে। দ্রুতহাতে পরচুলা খুলে, ছদ্মবেশ মুছে হয়ে গেল আবার কিশোর পাশা। পাশের দরজা খুলে রান্নাঘরে উঁকি দিল। মিসেস জারগন নেই। বোধহয় আসেনি এখনও। দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল।

ফোনে ওপরওয়ালাকে সেদিনকার কাজের রিপোর্ট দিচ্ছিল ফগ।

দেয়া শেষ করে উঠে এল চিলেকোঠার কাছে। দরজার তালার চাবিতে মোচড় দিয়ে তালা খুলে ভারিক্কি ভঙ্গিতে ভেতরে পা রাখল। বরফের মত জমে গেল যেন মুহূর্তে।

নেই ছেলেটা! উধাও! একটা অসম্ভব ব্যাপার মনে হলো তার কাছে। কাঠের ভারি দরজা ভেদ করে যেতে পারে না কোন মানুষ। এমনিতেই টেলিগ্রাফ-বয় আর কসাই-বালকের গায়েব হওয়ার ব্যাপারটা বিস্মিত করে রেখেছে তাকে। এখন ঘর থেকে জলজ্যান্ত একজন মানুষ বাতাসে মিলিয়ে যাওয়াটা হতবাক করে দিল তাকে। ভাবতে লাগল, মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে তার। কিংবা ব্যাপারটার মধ্যে জাদুটাদু কিছু আছে।

বাথরুমে ঢুকে মাথায় ঠাণ্ডা পানি দিল সে। বেরিয়ে এসে ফ্রিজ খুলে দেখল কোল্ড ড্রিংক আছে কিনা। নেই। মিসেস জারগনও আসেনি। সুতরাং ড্রিংক কেনার জন্যে তাকেই বেরোতে হবে।

ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে তখন চোখ রাখছে কিশোর। সাইকেলটা রয়েছে এমন জায়গায়, যেখান থেকে নেয়ার সাহস হচ্ছে না তার। ফগ দেখে ফেলতে পারে। কি করবে ভাবছে, এই সময় ফগকে বেরোতে দেখল সে। ভাবল, এইবার হয় সাইকেলটা ভেতরে নিয়ে যাবে ফগ, নয়তো তালা দিয়ে রাখবে।

কিন্তু কোনটাই করল না ফগ। ঘোরের মধ্যে যেন হাঁটতে হাঁটতে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলল।

কোথায় যাচ্ছে সে, বুঝতে পারল না কিশোর। প্রয়োজনও মনে করল না। সুযোগ পেয়ে মুহূর্ত দেরি করল না আর। উঠে গিয়ে সাইকেলটা স্ট্যান্ড থেকে নামিয়েই চেপে বসল। গেট দিয়ে বেরিয়ে ফগ যেদিকে গেছে তার উল্টোদিকে চালাল পুরোদমে।

ড্রিংক নিয়ে ফিরে আসার পর সাইকেলটার কথা মনে পড়ল ফগের। মস্ত ভুল হয়ে গেছে। ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখা উচিত ছিল। গেট খুলে ভেতরে ঢুকে সাইকেলটা যেখানে ছিল সেদিকে তাকিয়েই আরেকটা ধাক্কা খেতে হলো তাকে। নেই ওটা!

দিনেদুপুরে এ ভাবে উধাও হয়ে যাচ্ছে মানুষ, সাইকেল...রহস্যটা কি? তার কি মাথাটা সত্যি খারাপ হয়ে গেল? অলৌকিক সব কাণ্ড ঘটতে দেখছে সে-জন্যে? ওপরওয়ালাকে কি রিপোর্ট দেবে ভেবে মাথা আরও গরম হয়ে গেল তার। বসে পড়ল ওখানেই, ঘাসের ওপর।

সেদিন বিকেলে মুসাদের ছাউনিতে জরুরী আলোচনা সভা বসল গোয়েন্দাদের। আলোচনার বিষয়বস্তু অবশ্যই সেই উড়োচিঠি।

রবিন বলল, 'অদ্ভুত কাণ্ড! সন্দেহ হচ্ছে অনেকের ওপর, তারপর এক এক করে আবার তাদেরকে তালিকা থেকে বাদ দিতে হচ্ছে। সবাই তো সন্দেহের বাইরে চলে গেছে, কিশোর; কেউ নেই আর।'

'হুঁ,' আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'বুড়ো নরিস বাদ, কারণ সে লেখাপড়াই জানে না। মিস ব্যাটারের হাতের লেখার সঙ্গে চিঠির লেখা মেলে না। আর মিসেস বিনের লেখার সঙ্গে তো একেবারেই মেলে না। তা ছাড়া মিসেস বিনকে আরও একটা কারণে সন্দেহ থেকে মুক্তি দেয়া যায়; সে নিজেও একটা উড়োচিঠি পেয়েছে।'

'সাংঘাতিক জটিল একটা রহস্য!' নিরাশ কণ্ঠে বলল মুসা। 'এর কোন মাতামাথাই পাচ্ছি না। সমাধান করব কি করে?'

'সূত্র দরকার,' বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বলল ফারিহা। 'তাই না কিশোর?'

'হ্যাঁ। সত্যিকারের সূত্র এখনও তেমন কিছু পাইনি আমরা, একমাত্র চিঠিগুলো ছাড়া।'

'চলো, বরং নদীর ধার থেকে ঘুরে আসি,' প্রস্তাব দিল মুসা। 'মাথাটা গরম হয়ে গেছে।'

প্রস্তাবটা মন্দ না। বদ্ধ ছাউনিতে বসে থাকতে আর ভাল লাগল না কারও। বেরিয়ে পড়ল।

বেরিয়েই দেখল সাইকেল ঠেলে ভেতরে ঢুকছে ফগ। ওরা লুকিয়ে পড়ার আগেই দেখে ফেলল সে। এগিয়ে এল। গলা লম্বা করে জিজ্ঞেস করল, 'লালচুলো ছেলেগুলোকে দেখেছ? কোন সম্পর্ক আছে তোমাদের সঙ্গে? থাকলে এখনও বলো। আমি ধরতে পারলে কিন্তু ভাল হবে না।'

'বলেন কি! ভয় লাগছে!' চোখ বড় বড় করে বলল কিশোর।

'দেখো ছেলে, ডেঁপোমি করবে না! ঝামেলা! তোমার কুত্তাটাকে সরাও! এই, যাও, সর্, সর্!'

ফগের প্যান্ট কামড়ে দেয়ার তাল করছে টিটু, পায়ের চারপাশে চক্কর দিচ্ছে। কিশোর ডাকল, 'অ্যাই টিটু, আয়।'

এল না টিটু। একই ভাবে ঘুরে ঘুরে সুযোগ খুঁজতে লাগল কামড় বসানোর।

'এই মিষ্টি ডাকে কি আর ওই শয়তান কুত্তা সরবে নাকি? জোরে ডাকো,' ফগ বলল।

একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল কিশোররা চারজনেই, 'এই টিটু, আয়!'

এত জোরে শব্দ হলো, ফগ পর্যন্ত চমকে উঠল। লাফ দিয়ে সরে গেল টিটু। তাকে ধরে রাখল কিশোর।

ছাউনিটার দিকে সন্দিহান দৃষ্টিতে তাকাল ফগ। 'ওখানে কি করছিলে?'

'গল্প করছিলাম,' নিরীহ স্বরে জবাব দিল কিশোর।

'শুধু গল্প?'

'তো আর কি?'

'হুঁ।'

'এখন কোথায় যাচ্ছ?'

'নদীর ধারে।'

আর কিছু না বলে বিষ-দৃষ্টিতে কুকুরটার দিকে আরেকবার তাকিয়ে বাড়ির দিকে চলে গেল ফগ। বোধহয় মিসেস বিনের সঙ্গে কথা বলতে।

নদীর ধারে চলে এল ওরা। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। একটা বড় ঝোপের ধারে গা এলিয়ে বসল সবাই। বড় একটা হাঁস উড়ে এসে ঝপাস করে পড়ল পানিতে। নদীর পাড়ের বড় ঘাসের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আরও দুটো ছোট আকারের হাঁস। পানিতে পড়ে সাঁতার কাটতে শুরু করল।

চমৎকার দৃশ্য। অন্য সময় হলে প্রাণ ভরে উপভোগ করত ওরা। কিন্তু এখন মাথায় রহস্যটার চিন্তা। মুক্ত বাতাসে এসেও জট পাকিয়ে রইল মাথার মধ্যে। এখানেও সেই আলোচনাই উঠে পড়ল।

বেশ কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে ঘেউ ঘেউ করে উঠল টিটু।

মাথা উঁচু করে সবাই দেখল ঘাস মাড়িয়ে এগিয়ে আসছে ফগ।

অবাক হলো ওরা। ওর এখানে কি?

ছুটে যেতে চাইল টিটু। ধরে রাখল কিশোর।

কাছে এসে হাতের একটা পুঁটুলি ওদের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'ছাউনিতে এটা লুকিয়ে রেখেছ কেন? আমার জন্যে? মনে করেছ সূত্র ভেবে লুফে নেব আমি?'

পুঁটুলিটার দিকে অবাক হয়ে তাকাল সবাই।

কিশোর বলল, 'কি বলছেন? আমরা লুকাতে যাব কেন?'

'হয়েছে, আর অবাক হওয়ার ভান করতে হবে না। এত বোকা ভেবো না আমাকে। এ সব ফালতু সূত্র আর আমার দরকার নেই। আসল অপরাধী কে জেনে ফেলেছি। লাল পরচুলাটা কেবল এখন খুঁজে বের করতে হবে আমাকে।' স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল ফগ। 'তাহলে তুমি জানো না ওই টেলিগ্রাফ-বয়, কসাই-বালক আর মেসেঞ্জার-বয়টা কে?'

'না, জানি না।'

'বেশ, জানবে খানিক পরই। ক্যাপ্টেন রবার্টসনকে আসতে ফোন করে দিয়েছি। চলে আসবেন। এইবার আর বাঁচতে পারবে না তুমি, কিশোর পাশা। এই কথাটাই বলতে এলাম। শয়তানির শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। অনেক জ্বালান জ্বালিয়েছ আমাকে।'

বলে বিজয়ীর মত গর্বিত পা ফেলতে ফেলতে ঘাস মাড়িয়ে চলে গেল ফগ।

তার আচরণে অবাক হলো সবাই।

হাত বাড়িয়ে পুঁটুলিটা টেনে নিল কিশোর। সুতো দিয়ে বাঁধা বইপত্র মনে হলো। সুতো খুলে কাপড়ের মোড়ক সরাতেই বেরিয়ে পড়ল কয়েকটা বই। প্রথমটা ডিকশনারি। দেখেই চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'আরি! এটা তো আমার! হারিয়ে গিয়েছিল, খুঁজে পাচ্ছিলাম না কিছুদিন যাবৎ।'

পাতা ওল্টাতে শুরু করল কিশোর। মলাটের নিচে প্রথম পাতাতেই মুসার নাম লেখা। ভেতরে বেশ কিছু শব্দের নিচে বলপেন দিয়ে দাগ দেখা গেল। মুসা বলল

...গুলো সে দেয়নি।

একটা কপি বুকও আছে।

হাসল রবিন। 'কে জি ক্লাসের কোন ছেলের বই। মুসার ডিকশনারির সঙ্গে ... রাখল কে?'

'আল্লাই জানে,' মুসা বলল।

গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে। পাতা ওল্টাল দুটো ...য়েরই। কপি বুকের অক্ষরের লাইনগুলো দেবে গেছে, বহুবার তার ওপর পেন্সিল ... বলপেন বোলালে যেমন দাগ হয়, তেমনি। তৃতীয় বইটার দিকে হাত বাড়াল ... একটা পুস্তিকা, বাসের টাইম-টেবল। দেখা গেল, গ্রীনহিলস থেকে ...রহিলসের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া সোমবারের সোয়া দশটার বাসের নিচে দাগ ... আছে।

'এগুলো আসল সূত্র!' বিড়বিড় করে বলল কিশোর। 'আর ফগটা মনে করেছে ...কে বোকা বানানোর জন্যে আমরা ইচ্ছে করে রেখেছি। তার কাছে এখন বেশি ...ী লাল পরচুলা। তাহলেই আমাকে পাকড়াও করতে পারে।'

বইগুলো আবার ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল সে। ডিকশনারির ভেতর থেকে পড়ল ...টুকরো ছেঁড়া কাগজ। বিচিত্র কিছু শব্দ লেখা তাতে। মনে হয় কাঁচা বাজারের ... করা হয়েছিল, সেটা থেকে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে।

উত্তেজিত হয়ে পড়ল কিশোর। চকচক করতে লাগল চোখ। প্রায় চেঁচিয়ে ...ল, 'বুঝে গেছি!'

'কী?' প্রায় একসঙ্গে জানতে চাইল অন্য তিনজন।

'আসল অপরাধী কে?'

'কে?' আবারও একসঙ্গে প্রশ্ন।

'বুঝতে পারছ না?'

...একসঙ্গে তিনজনের মাথা নাড়ানো।

'চলো, এখনই গিয়ে মুসার আম্মাকে সব জানাব। ক্যাপ্টেন রবার্টসন এসে ... ভাল, নইলে আমরাই তাকে ফোন করব আসার জন্যে।'

'কিন্তু অপরাধীটা কে?' জানতে চাইল মুসা।

...নলই না যেন কিশোর। উঠে পড়েছে। টিটুকে বলল, 'আয়, টিটু ...বাড়ি যেতে হবে!'

...নেরো

... ভেতরে ঢুকেই ক্যাপ্টেন রবার্টসনের বড় কালো গাড়িটা দেখতে পেল ওরা ...খানে এসে গেছেন তিনি।

...জার ঘণ্টা বাজাল মুসা।

...লে দিলেন মিসেস আমান। ছেলেমেয়েদের দেখে বললেন, 'ভাল হয়েছে এসে

পড়েছ। নইলে মিস্টার ফগকে আনতে যেতে হত তোমাদের। এসো, ভেতরে।'

বড় একটা সোফায় বসে আছেন ক্যাপ্টেন রবার্টসন। কোণের দিকের চেয়ারে মাথা উঁচু করে বসেছে ফগ। ছেলেমেয়েরা ঢুকতেই ঘাড় বাঁকিয়ে এমন ভঙ্গিতে তাকাল, যেন বিশ্ব বিজয় করে এসেছে।

হাসিমুখে তাকালেন ক্যাপ্টেন। তার দিকে ছুটে গেল ফারিহা। হাত মেলাতে মেলাতে বলল, 'অনেক দিন পর এলেন, ক্যাপ্টেন!'

'হ্যাঁ। কেমন আছ তোমরা?'

'ভাল।'

টিটু এসে বসল ক্যাপ্টেনের পায়ের কাছে। আদুরে ভঙ্গিতে কুঁই কুঁই করতে লাগল। তার মাথা চাপড়ে দিলেন ক্যাপ্টেন।

অভ্যর্থনার পালা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন মিসেস আমান। তারপর বললেন, 'ছেলেমেয়েরা, শোনো। তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছেন, মিস্টার ফগ। একজনের বিরুদ্ধে তো গুরুতর অভিযোগ।' কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি।

কেউ কিছু বলল না। চুপ করে রইল চারজনেই।

ফগের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। 'তোমার যা বলার বলো, ফগর‍্যাম্পারকট।'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল ফগ। 'হ্যাঁ, স্যার, বলছি। আপনার ধারণা এই ছেলেমেয়েগুলো খুব ভাল। মাপ করবেন, স্যার, আপনার ধারণা ভুল। এরা বড় বেশি যন্ত্রণা দেয়। বিশেষ করে এই কিশোর ছেলেটা তো পদে পদে বাধার সৃষ্টি করে, পুলিশকে তার কাজ করতে দেয় না ঠিকমত।'

'অত ভণিতা না করে যা বলার খোলাখুলি বলে ফেলো।'

'ইয়ে, স্যার, উড়োচিঠি লেখার জন্যে এই ছেলেটাকে দায়ী করছি আমি।'

'প্রমাণ আছে?'

'আছে, স্যার। ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওর চাচীকে বলেছি, বিশেষ কারণে কিশোরের ঘরটা আমি একবার চেক করতে চাই। তিনি অনুমতি দিলেন। সেখানে খুঁজে পেয়েছি এটা,' পকেট থেকে লাল পরচুলাটা বের করল ফগ। 'এটা পরে প্রথমে টেলিগ্রাফ-বয় সেজেছে সে, তারপর কসাই-বালক, এবং সব শেষে মেসেঞ্জার-বয়।'

মুখ দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে ফারিহা। মুসা আর রবিনের মুখও কালো হয়ে গেছে। সে-সব দেখে মুখ আরও উজ্জ্বল হলো ফগের।

কিন্তু কিশোর নির্বিকার। জিজ্ঞেস করল, 'উড়োচিঠিগুলোর লেখার সাথে আমার হাতের লেখা মিলিয়ে দেখেছেন আশা করি?'

'দেখেছি। মেলে না। অনেক খাতা আছে তোমার ঘরে। নানা রকম হস্তাক্ষর আছে ওগুলোতে। সব তোমার। তারমানে হাতের লেখা নকলে তুমি ওস্তাদ। উড়োচিঠিগুলো তোমারই লেখা, তবে ভিন্ন হস্তাক্ষরে লিখেছ।'

ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকালেন মিসেস আমান। তিনি

...লেন, 'পরচুলাটা তোমার?'

'হ্যাঁ।'

'ছদ্মবেশ নিতে গেলে কেন?'

'বড় হয়ে নামকরা গোয়েন্দা হওয়ার ইচ্ছে আমার। গোয়েন্দাদের জন্যে ছদ্মবেশ জরুরী। তাই এখন থেকেই প্র্যাকটিস করছি। তবে চিঠিগুলো আমি লিখিনি।'

'কে লিখেছে?' কড়া গলায় জানতে চাইল ফগ।

'সূত্রগুলোকে হেলাফেলা না করলে আপনিও এতক্ষণে জেনে ফেলতেন।'

'সূত্র?'

'হ্যাঁ, নদীর পাড়ে গিয়ে আমাদের যেগুলো দিয়ে এসেছেন। আমাদের ধমকাতে গিয়ে আসলে একটা মস্ত উপকার করে এসেছেন। সূত্রগুলো বয়ে নিয়ে গিয়ে দিয়ে এসেছেন আমাদের। ছাউনিতে খোঁজার কথা ভাবতামও না আমরা, পেতামও না। ... আমাদের শয়তানি না ভেবে একটু ভাল করে ভাবলেই রহস্যটার সমাধান করে ফেলতে পারতেন। এই একটি বার আপনার কাছে হেরে যেতাম আমরা।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল ফগের। 'ঝামেলা! ওই কে. জি. ক্লাসের বই আর ... একটা ডিকশনারি সূত্র!'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ, সূত্র।' কাপড়ের মোড়কটা আবার খুলে বইগুলো ... সাজিয়ে রাখল সে।

গভীর আগ্রহ নিয়ে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন। 'উড়োচিঠি কে ... জানতে পেরেছ তুমি?'

'পেরেছি, স্যার।'

সামনে গলা বাড়িয়ে দিল ফগ।

সোজা করে বসলেন ক্যাপ্টেন।

... দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছেন মিসেস আমান।

... পিনপতন নীরবতা।

কিশোর জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেনকে, 'সব কথা আপনাকে বলেছেন, মিস্টার ... ক্যাপ্টেন? বাসে করে ডিয়ারহিলসে যাওয়া, তিনজন সন্দেহভাজনের নাম, এ ...

...বলেছে।'

...। সময় বেঁচে গেল তাহলে। পুরো গল্পটা আর বলতে হচ্ছে না আমাকে।' ... আমানের দিকে তাকাল কিশোর, 'আন্টি, রান্নাঘরের বেলটা একটু বাজাই?'

'বাজাও।'

... গিয়ে ঘণ্টার বোতাম টিপল কিশোর।

... ঢুকল মিসেস বিন। এত লোক দেখে অবাক হলো। মিসেস আমানকে ... বলল, 'আমাকে ডেকেছেন?' গলা সামান্য কেঁপে গেল তার।

'আমি না, কিশোর ডেকেছে।'

...র দিকে তাকালও না কিশোর। ক্যাপ্টেনকে বলল, 'নিন, স্যার,

উড়োচিঠির লেখককে হাজির করে দিলাম।'

স্তব্ধ হয়ে গেলেন মিসেস আমান। ঘোঁৎ করে উঠল ফগ। চোখ কপালে উঠল মুসা, রবিন আর ফারিহার। কেবল ক্যাপ্টেনের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মিসেস বিনের মুখ। কিশোরের দিকে তাকিয়ে ফুঁসে উঠল, 'কি বলছ তুমি!'

'কেন, আপনি ঐ কথা অস্বীকার করছেন?' কঠিন স্বরে প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন।

'হ্যাঁ, করছি!' চিৎকার করে উঠল মিসেস বিন।

'আস্তে কথা বলুন। বসুন চুপ করে। কিশোর কি বলে শুনি।'

'আমি একটা চিঠিও লিখিনি!' আবার চেঁচিয়ে উঠল মিসেস বিন, আস্তে কথা যেন বলতেই পারে না।

কিশোর বলল, 'হ্যাঁ, আপনি লিখেছেন।'

'তুমি তো একটা দুষ্টু ছেলে...'

'চুপ!' ধমক দিয়ে মিসেস বিনকে থামিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। 'কোন কথা বলবেন না আর। আপনাকে যখন প্রশ্ন করা হবে, শুধু জবাব দেবেন। কিশোর, বলো তোমার কথা।'

'আপনি তো জেনেছেন, স্যার, প্রতি সোমবারে ডিয়ারহিলস থেকে চিঠি পোস্ট করা হত। অপরাধীকে ধরার জন্যে সোয়া দশটার বাসে করে সেখানে গেলাম আমরা। কাউকে চিঠি পোস্ট করতে দেখলাম না। ফিরে এসে আরও খোঁজ-খবর করলাম। জানতে পারলাম, আরও তিনজন নিয়মিত যায় সেখানে। তারা হলো বুড়ো নরিস, মিস ব্যাটার আর মিসেস বিন।'

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। 'জানি। ফগর্যাম্পারকটও এই লাইনেই কাজ করেছে।'

ঘোঁৎ জাতীয় একটা শব্দ করে এ কথা মেনে নিল ফগ। কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, 'পোস্ট মার্কটা যে ডিয়ারহিলসের জানলে কি করে? নিশ্চয় খামগুলো দেখেছ কি করে দেখলে?'

'সেটা বলার দরকার মনে করছি না,' লিলিকে বাঁচিয়ে দিতে চাইল কিশোর। 'আপনার না জানলেও চলবে। তাতে অপরাধী ধরতে কোন অসুবিধে হবে না আপনার। যাই হোক, পরদিন মঙ্গলবার ঠিকই উড়োচিঠি পেল গ্রীনহিলসের আরেকজন, মিসেস উইলমার। খামটাতে কোন পোস্ট মার্ক নেই। ডাকে না পাঠিয়ে সরাসরি দরজার ফাঁক দিয়ে ফেলে আসা হয়েছে। সন্দেহভাজন ওই তিনজনের প্রতি নজর দিলাম। সকাল সাড়ে ছয়টায় কে কোথায় ছিল খোঁজ নিলাম।'

'কি বুঝলে, ফগর্যাম্পারকট?' ক্যাপ্টেন বললেন, 'এই কাজটা করার কথা একবারও মনে এল না কেন তোমার? তাহলে অনেক এগিয়ে যেতে পারতে। হ্যাঁ, কিশোর, বলে যাও।'

'জানতে পারলাম,' কিশোর বলল, 'তিনজনেই ওই সময় রাস্তায় বেরিয়েছিল।

পড়ে গেলাম বেকায়দায়। একমাত্র হাতের লেখা যাচাই করে দেখা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না।'

'ভাল বুদ্ধি,' স্বীকার করলেন ক্যাপ্টেন, 'তবে কিছুটা জটিল।'

'হ্যাঁ। লাল পরচুলা পরে মেসেঞ্জার-বয়ের ছদ্মবেশে তিনটা প্যাকেট নিয়ে বেরোলাম। একটা দিলাম বুড়ো নরিসকে। মাল বুঝে পেয়েছে যে সে-কথা লিখে সই দিতে বললাম। জানলাম, সে লেখাপড়া জানে না। তারপর গেলাম মিস ব্যাটারের কাছে। তার হাতের লেখার সঙ্গে চিঠির লেখার কোন মিলই দেখলাম না। বাকি রইল মিসেস বিন। গেলাম তার কাছে। উল্টোপাল্টা করে ছোট হাতের বড় হাতের অক্ষর মিলিয়ে লিখে দিল মিসেস বিন, যাতে আমি ধরতে না পারি।'

'ইনটারেস্টিং! তারপর?'

'খুব বেকায়দায় পড়ে গেলাম। মনে হলো, কেসটার সমাধান বুঝি আর করতেই পারব না। মিসেস বিনকে সন্দেহ তেমন করিনি, তাহলে হয়তো অন্য কোন উপায় পেয়ে যেতাম। তার ওপর নজর রাখলেই কিছু একটা বেরিয়ে যেত। তবে সমাধানটা সে নিজেই করে দিল একটা ছোট্ট বোকামি করে, ছাউনিতে লুকিয়ে রাখতে গেল বইপত্রগুলো। সে স্বপ্নেও ভাবেনি, সেখানে খুঁজতে যাবেন মিস্টার গ্র্যাম্পারকট। আর আমরাও ভাবিনি খুঁজতে গিয়ে আমাদের জন্যে কাজটা এত সহজ করে দেবে।'

আবার ঘোঁৎ করে উঠল ফগ, 'যাই হোক, আমাকে চিঠিটা নিশ্চয় তুমিই লিখেছ। মাথামোটা, বলদ বলে গাল দিয়েছ...'

'না, ওটাও মিসেস বিনই লিখেছে। সেই সঙ্গে নিজেকেও একটা লিখেছে তার ওপর থেকে সন্দেহ সরিয়ে নেয়ার জন্যে।'

'আমি লিখিনি!' চিৎকার করে উঠল মিসেস বিন। 'মিথ্যে কথা বলছে দুষ্টু ছেলেটা!'

কঠোর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। তাতেই চুপ হয়ে গেল মিসেস বিন। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি করে বুঝলে মিসেস বিনই লিখেছে, সেটা বলো।'

'এখানে একটা ডিকশনারি আছে, স্যার, মুসার ডিকশনারি। এটা দেখে আন্দাজ করলাম পত্রলেখক ওদের বাড়িতেই থাকে। ভেতরে অনেকগুলো শব্দের নিচে দাগ দেয়া, যে সব শব্দ চিঠিতে দেখেছি। বুঝলাম বানান জানে না, শব্দগুলো ঠিক করে লেখার জন্যে ডিকশনারির সাহায্য নিয়েছে পত্রলেখক। তারমানে লেখাপড়া খুব একটা জানে না সে।'

বিড়বিড় করল ফগ, 'ঝামেলা!' মুখ লাল হয়ে গেছে তার। নিজের হাতে নিয়ে গিয়ে পত্রগুলো শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে এসেছে সে বোকার মত, এ কথা ভেবে মনে মনে একশো একটা লাথি মারছে নিজেকে।

'তারপর আছে একটা কপি বুক,' বলে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল কিশোর।

'কপি বুক কেন?' জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন।

'লেখা নকল করার জন্যে। নিজের হাতের লেখা তো সাংঘাতিক খারাপ।

তাই কপি বুকের অক্ষরের ওপর কাগজ ফেলে একটা একটা করে অক্ষর পাশাপাশি সাজিয়ে লিখে শব্দ তৈরি করেছে। অনেক পরিশ্রম করেছে মিসেস বিন। অক্ষরগুলো বড় হওয়াতে চিঠির কাগজের সাইজও অনেক বড় হয়ে গেছে। চিঠিটা দেখতে হয়েছে বিচিত্র। রহস্যময়ই বলা চলে। তবে তাতে অন্য রকম হয়ে গেছে হাতের লেখা। খুব সুন্দর হয়েছে, যদিও খানিকটা অদ্ভুত, কারণ সমস্ত শব্দগুলোই হয়েছে বড় হাতের, আর পেঁচানো। মনে হয়েছে যে লিখেছে অক্ষর সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান। ভুলেও মিসেস বিনকে কেউ সন্দেহ করবে না। ফাঁকিতে পড়েছিলাম আমরাও।'

'এবং রহস্যটাও জমাট বেঁধেছিল,' যোগ করলেন ক্যাপ্টেন।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। শেষ বইটা দেখাল সে। 'এটা বাসের টাইম টেবল। সোয়া দশটার বাসের নিচে দাগ দেয়া আছে। বইগুলো সব পেলেও সন্দেহ থেকে যেত, চট করে অপরাধীকে চিনে নিতে পারতাম না, যদি এই কাগজের টুকরোটা না পেতাম।'

'কি এটা?'

'বাজারের লিস্ট। কাগজটা ছিঁড়ে নিশ্চয় বইয়ের পাতায় চিহ্ন দিয়ে রেখেছিল মিসেস বিন। মুসাদের বাজার-সদাই সে করে। লিস্টটাও তারই লেখা। কয়েকটা অক্ষর খুব পরিচিত লাগল। মনে করতে পারলাম এ ভাবে কে লেখে। সুতরাং কাগজটা দেখে বুঝতে আর বাকি থাকল না আমার, পুঁটুলিটা ছাউনিতে কে লুকিয়ে রেখেছে।'

'নাও এগুলো, ফগর‍্যাম্পারকট। রেখে দাও। প্রমাণ হিসেবে কাজে লাগবে। দেখলে তো, বুদ্ধিটা হলো আসল জিনিস। নইলে যে কাজটা তোমার করার কথা ছিল, তোমাকে টেক্কা দিয়ে তোমারই বোকামির কারণে এই ছেলেমেয়েগুলো সেটা করে ফেলল। অথচ সূত্রগুলো তুমিই বয়ে নিয়ে গিয়ে দিয়ে এলে ওদের।'

কিশোরের কাছে থেকে বইগুলো নিয়ে গেল ফগ। তার মুখের অবস্থা দেখার মত। বলল, 'আসলে, স্যার, রাগে মাথাটা গুলিয়ে গিয়েছিল আমার।'

'সেই জন্যেই অহেতুক রাগ করা উচিত না। মাথায় রাগ বাসা বেঁধে থাকলে চিন্তার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।' মিসেস বিনের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন, 'মিসেস বিন, আমাদের সঙ্গে যেতে হবে আপনাকে।'

প্রতিবাদ করল না আর মিসেস বিন। অ্যাপ্রনের একটা কোণ মুখে চাপা দিয়ে ফোঁপাতে শুরু করল।

'এ কাজ কেন করলেন?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'বলতে পারব না,' কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিল মিসেস বিন। 'দুনিয়ার সব মানুষের ওপরই রাগ আমার। ছোটবেলায় মানুষ আমাকে অনেক অত্যাচার করেছে। তারপর থেকেই তাদের ওপর রাগ। সুযোগ পেলেই প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করে।'

'হুঁ!' এই প্রথম মহিলার দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকালেন ক্যাপ্টেন। বুঝতে পারলেন দীর্ঘদিন মাথায় রাগ পুষে রাখতে রাখতে মানসিক রোগী হয়ে গেছে মিসেস বিন।

মায়ের দিকে তাকাল মুসা, 'মা, কেসটা হাতে নিয়েছিলাম বলে আশা করি এবার আমাদের ওপর খুশি হবে তুমি?'

'না,' সাফ জবাব দিয়ে দিলেন মিসেস আমান। 'কাজটা পুলিশের, তাদেরকেই করতে দেয়া উচিত ছিল। তবে কিশোর বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে।'

কিশোর বলল, 'আমি একা সমাধান করতে পারতাম না এ কেসের, এরা সাহায্য না করলে,' বন্ধুদের দেখাল কিশোর। 'তবে আপনার সাহায্যটাই ছিল আসল, কি বলেন, মিস্টার ফগর্যাম্পারকট?'

লাল মুখ আরও লাল হয়ে গেল ফগের। ঝাঁঝাল স্বরে জবাব দিল, 'ঝামেলা!'

****

স্পাইডারম্যান

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

একদিন স্কুলে ক্লাস করছে তিন গোয়েন্দা। টীচার হিউগ জনসন বায়োলজি পড়াচ্ছেন, 'প্রকৃতিতে মাকড়সার জাল হলো একটা অতি বিচিত্র জিনিস। বিস্ময়কর তার গঠন…'

কিন্তু বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীরই পড়ায় মন নেই। মাকড়সার জালের বিচিত্র কাহিনীর চেয়ে ওদের কাছে ওই মুহূর্তে বড় আকর্ষণ হলো টেরিয়ার ডয়েল ওরফে শুঁটকি টেরি। তিন গোয়েন্দার চিরশত্রু। পাজির পাঝাড়া।

মাকড়সার জাল আঁকার জন্যে ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে ঘুরেছেন মিস্টার জনসন। এই সুযোগে নিচু হয়ে হাতের পেন্সিলটা জানালার দিকে গড়িয়ে দিল টেরি। ক্লাসের পড়ালেখা বাদ দিয়ে এক মহাশয়তানি করার মতলব এঁটেছে সে।

টাকি ও কডির দিকে তাকাল টেরি। শঙ্কিত হলো, হেসে না ফেলে ওরা। তাহলে তার প্ল্যান বরবাদ হয়ে যাবে।

দু'জনেই টেরির বন্ধু। টাকির উচ্চতা কম। মোটাসোটা দেহ। লম্বা লম্বা চুল। নাকের ওপর মস্ত এক আঁচিল। আর কডির রেশমের মত লাল চুল। দেখলে মনে হবে রঙ উঠে গেছে। দাঁতের সঙ্গে চোখেরও সমস্যা। চশমা পরতে হয়। দাঁতে ব্রেইস লাগানো।

'বড় একটা মাকড়সার জালে কমপক্ষে তেরো হাজার টুকরো সুতো থাকে,' পড়াচ্ছেন মিস্টার হিউগ জনসন। চমক দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে জাল আঁকতে শুরু করলেন তিনি। 'প্রতিটি টুকরোতেই ভালমত লাগানো থাকে এক ধরনের আঠা, শিকার ধরার জন্যে।'

ডেস্ক থেকে নেমে গেল টেরি। পেন্সিল তোলার ছুতোয় জানালার কাছে চলে গেল সে । উবু হয়ে পেন্সিলটা তুলে নিল। খাতা দিয়ে পিটিয়ে জানালার কার্নিসে বসা তিনটে মাছি মারল। ওগুলোর মধ্যে বেশ বড় চকচকে একটা সবুজ মাছিও রয়েছে। তখনও পুরোপুরি মারা যায়নি মাছিটা, পা নাড়ছে।

মাছিগুলোকে নিয়ে ফিরে এসে একটা কাগজের টুকরো ভাঁজ করে খামের মত বানাল টেরি। তার মধ্যে রেখে দিল মাছিগুলোকে। তারপর এক সুযোগে মিস্টার জনসনের অলক্ষে খামটা চালান করে দিল সামনের দিকে। টাকির কাছে। টাকির কাছ থেকে পৌঁছাল একেবারে সমনের সারির সীটে বসা কডির কাছে।

টেরির পরিকল্পনার প্রথম পর্ব শেষ। এবার দ্বিতীয় পর্ব।

'তাহলে তোমরা বুঝতে পারছ,' মিস্টার জনসন বলছেন, 'মাকড়সার জাল কতখানি শক্ত আর কাজের জিনিস। দেখতেও ভারি সুন্দর। গ্রীষ্মের সকালে

মাঠের মধ্যে শিশিরে ভেজা মাকড়সার জালের শোভা দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়।'

মিস্টার জনসনের আবার ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে ফেরার অপেক্ষা করছে টেরি। তার আশা পূর্ণ হলো। নিঃশব্দে সীট ছেড়ে পা টিপে টিপে মিস্টার জনসনের টেবিলের কাছে চলে গেল সে। যে মগটা দিয়ে চা খান তিনি, সেটার মধ্যে ফেলে দিল মাছিগুলোকে। দ্রুত ফিরে গেল নিজের সীটে।

টেরির পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্বও শেষ। এবার তৃতীয় পর্বের অপেক্ষা।

'আজকের আলোচনা শেষ করার আগে পাঁচ নম্বর চ্যাপ্টার থেকে একটা কুইজ দেব।' ছেলেমেয়েদের দিকে তাকাতে লাগলেন মিস্টার জনসন। 'পাঁচ নম্বর চ্যাপ্টারটা সবাই পড়েছ তোমরা, তাই না?'

গুঙিয়ে উঠল ক্লাস ভর্তি ছেলেমেয়ে। প্রতিদিনই এ রকম কুইজ করতে দেন তিনি ওদেরকে। ছেলেমেয়েদের তাঁকে দেখতে না পারার এটাও একটা বড় কারণ। সে-জন্যেই টেরির শয়তানি নীরবে দেখে যায় ওরা। বাধাও দেয় না, মিস্টার জনসনকেও সাবধান করে না।

মিস্টার জনসন ওদের আসল টীচার নন। আসল সাইন্স টীচার মিস্টার ক্রেগ; তিনি ছুটিতে। গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে পা ভেঙেছেন। দু'তিন মাস আসতে পারবেন না। ওই কয় মাস পড়ানোর জন্যে মিস্টার ক্রেগের জায়গায় সাময়িক ভাবে চাকরিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে মিস্টার জনসনকে।

এ ধরনের বিকল্প টীচারদের ওপর ভক্তি-শ্রদ্ধা কিছুটা কমই থাকে অনেক ছেলেমেয়ের। আর টেরি ও তার বন্ধুদের মত হলে তো কথাই নেই। পড়ালেখা বাদ দিয়ে টীচারকে খালি জ্বালায়। বিকল্প স্যারেরা হোমওঅর্কও তেমন দেন-টেন না। তবে মিস্টার জনসন তাঁদের মত নন। তিনি বরং বাড়তি খাটাতে চান। ক্লাসের পড়ার বাইরেও পড়া দেন। পোকা-মাকড়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ। তিনি চান ছাত্রছাত্রীরাও এ ব্যাপারে মনোযোগী হোক।

যাই হোক, কুইজটা কিসের ওপর, জানা আছে সবার। মাকড়সার ওপর। এবং তাদের ধারণা ভুল হলো না।

ডেস্কে বসলেন মিস্টার জনসন। যেমন লম্বা তিনি, তেমনি পাতলা–ছিপছিপে একেবারে তালপাতার সিপাই। রোগাটে দেহ। দেহের তুলনায় মাথাটা ছোট। পুরু লেন্সের বিশাল ফ্রেমের বেমানান চশমা। মাথার তিন পাশ ঘিরে খাড়া খাড়া চুল।

অপেক্ষা করছে ক্লাসভর্তি ছেলেমেয়ে। মগে মাছি দেয়ার ব্যাপারটা স্যারকে বলে দেবে কিনা ভাবছে কিশোর। কারণ মিস্টার জনসনের চা খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। ফ্লাস্ক থেকে এখন মগে চা ঢালবেন তিনি।

কিন্তু চা না ঢেলে একটা মোটা বই টেনে নিলেন মিস্টার জনসন। অবশ্যই মাকড়সার ওপর। পড়তে শুরু করলেন।

কুইজের প্রশ্নের জবাবগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল মুসা। বেশির ভাগ জবাবই জানা নেই। পোকা-মাকড়ে তেমন আগ্রহ নেই ওর। মাকড়সা নিয়ে বেশি পড়াশোনা করেনি। জবাবগুলো যে কি হবে, শিওর হতে পারল না। অনুমানে জবাব দেয়া ছাড়া কিছু করার নেই। এ ভাবে আন্দাজে পরীক্ষা দিতে ভাল লাগে

না তার।

রবিন আর কিশোরের দিকে তাকাল সে। রবিন প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। কিশোর লিখে যাচ্ছে।

পারে না কি আর করবে। চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে রইল মুসা। নিজেকে বোঝাল, কি হবে মাকড়সাবিশেষজ্ঞ হয়ে? তারচেয়ে বরং কুইজ বাদ দিয়ে টেরির দিকে নজর দেয়া যাক। টেরি আর দোস্তরা কি করে দেখতে লাগল সে।

দলা পাকানো একটা কাগজ গিয়ে পড়ল টেরির মাথায়। ছুঁড়ে মেরেছে টাকি।

'আউক!' করে উঠল টেরি। ব্যথায় নয়, চমকে গিয়ে।

'টেরিয়ার, কিছু বলবে?' মিস্টার জনসন জিজ্ঞেস করলেন।

'কে, আমি?' বোকার মত জুলজুল করে তাকাতে লাগল টেরি।

ওর দিকে তাকিয়ে ফ্যাকফ্যাক করে হাসতে লাগল টাকি। টেরির বিব্রতকর অবস্থা দেখে মজা পাচ্ছে।

'শব্দ কোরো না,' শান্তকণ্ঠে মিস্টার জনসন বললেন। 'কুইজ দিয়েছি। করো।'

মগের দিকে হাত বাড়ালেন তিনি।

দুই

নিশ্চয় মগে এখন চা ঢালবেন মিস্টার জনসন—ভাবছে কিশোর। মাছিগুলো কি দেখতে পাবেন? না পেলে বলে দেবে, ঠিক করল কিশোর। টেরির শয়তানিতে যোগ দিয়ে শিক্ষককে মাছি খাওয়ানোর কোন যুক্তি নেই।

মগে চা ঢাললেন মিস্টার জনসন।

কোনও প্রতিক্রিয়া না দেখে অবাক হয়ে গেল কিশোর। মাছিগুলো কি তিনি দেখতে পাননি? আশ্চর্য! রেগে উঠে ফেটে পড়া তো দূরের কথা, দেখতেই যেন পাননি। এই ভদ্রলোককে নিয়ে শুরু থেকেই একটা কৌতূহল ছিল কিশোরের। সেদিন সেটা আরও বাড়ল। কিছুই না বলে চুপ করে রইল। দেখতে চাইল তিনি কি করেন।

বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মগে চুমুক দিলেন মিস্টার জনসন।

দম বন্ধ করে ফেলল কিশোর নিজের অজান্তেই। ফিরে তাকিয়ে দেখল নীরব হাসিতে ফেটে পড়ছে টেরি।

ঘন ঘন কয়েকবার মগে চুমুক দিয়ে মগটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন মিস্টার জনসন। গভীর মনোযোগে পড়ছেন।

ভীষণ অবাক লাগছে তখন কিশোরের। কিছুটা অস্বস্তিও। যে ভাবে মগের দিকে সরাসরি তাকিয়ে চা ঢেলেছেন তিনি, মাছিগুলোকে না দেখার কথা নয়। আর যদি কোন কারণে না-ই দেখে থাকেন, চা খাওয়ার সময় জিভে অবশ্যই

লাগার কথা। কারণ মরা মাছি চায়ের ওপরেই ভেসে থাকে।

আনমনে আবার হাত বাড়িয়ে মগটা তুলে নিলেন মিস্টার জনসন। চুমুক দিলেন কয়েকবার। এবার আর শেষ না করে টেবিলে রাখলেন না। কিছুই ঘটল না। কোন রকম প্রতিক্রিয়া হলো না তাঁর। রেগে উঠলেন না। ফেটে পড়লেন না। বরং মুখ তুলে শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, লেখা হয়েছে তোমাদের? যাও, ক্লাস শেষ। কাগজগুলো আমার টেবিলে জমা দিয়ে যাও। আর হ্যাঁ, পরের চ্যাপ্টার, অর্থাৎ ছয় নম্বর চ্যাপ্টারটা কাল পড়ে আসবে। ভুলো না কিন্তু।'

সারি দিয়ে মিস্টার জনসনের টেবিলের দিকে এগোল ছেলেমেয়েরা। কিশোরের কাগজটা টেবিলে রাখল। প্রচণ্ড কৌতূহল দমাতে না পেরে চা খাওয়ার মগটার ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে উঁকি দিল। চায়ের তলানি পড়ে আছে। কিন্তু একটা মাছিও নেই।

বিজ্ঞান ক্লাসটাই সেদিনের শেষ ক্লাস। এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। বারান্দায় বেরিয়ে এসে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াল, দিনের বাকি সময়টা কি ভাবে কাটাবে সেটা নিয়ে মুসা ও রবিনের সঙ্গে আলোচনার জন্যে। আলোচনার এক পর্যায়ে অবশ্যই মাছির কথা উঠল।

'মাছিগুলোকে কি খেয়ে ফেলেছেন মিস্টার জনসন, কি মনে হয় তোমার?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'জানি না!' বিমূঢ়ের মত জবাব দিল কিশোর। 'না খেলে গেল কোথায়?'

'আমার মনে হয় মাছি খেতে পছন্দ করেন তিনি,' রবিন বলল। 'আজব লোক! গতকাল কি বলেছিলেন মনে আছে? মাছি, তেলাপোকা এগুলো নাকি পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষের প্রিয় খাবার।'

'মাকড়সা খায় না তো কেউ?' মুসার প্রশ্ন।

'খেলে খাকগে। মাকড়সার কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। ওরা চালাক, ওরা সুন্দর, ওরা হেন, ওরা তেন...' চোখ বড় বড় করে তাকাল রবিন। 'ওই দেখো, মাকড়সার কথা বলতে না বলতেই মাকড়সা এসে হাজির।'

ভুরু কুঁচকে তাকাল মুসা। 'হুঁ, দেখা যাক, এটা কি রকম চালাক।'

ছোট একটা বাদামী রঙের মাকড়সা হুড়হুড় করে দ্রুত উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। মাকড়সাটার দিকে এক পা বাড়িয়ে দিল মুসা। মুহূর্তে ঘুরে গিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে রওনা দিল মাকড়সাটা। ঝট করে আরেকটা পা সেদিকে বাড়িয়ে দিয়ে মাকড়সাটার যাওয়ার পথ আটকে দিতে চাইল সে।

একটা সেকেন্ড নিথর হয়ে রইল মাকড়সাটা। যেন কোনদিকে যাবে বোঝার চেষ্টা করছে। তারপর হঠাৎ করেই দৌড়ে এসে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল মুসার জুতোর ডগায়। পা বেয়ে দৌড়ে উঠে আসতে শুরু করল।

'খাইছে!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'চালাকই তো! ভীষণ চালাক!'

ঝাড়া দিয়ে পা থেকে মাকড়সাটাকে ফেলার চেষ্টা করল সে।

পড়ল না মাকড়সাটা। একই ভাবে উঠে আসতে থাকল।

হাত দিয়ে তখন ঝেড়ে ফেলে দিল ওটাকে।

সিঁড়িতে পড়ল মাকড়সাটা।

'কি ব্যাপার, ভয় পাচ্ছ নাকি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ভয় যতটা না পাচ্ছি, তারচেয়ে বেশি লাগছে অস্বস্তি,' জবাব দিল মুসা। 'বিচ্ছিরি প্রাণীগুলোকে দু'চোখে দেখতে পারি না আমি।'

পা দিয়ে মাড়িয়ে মাকড়সাটাকে ভর্তা করে দিল সে।

ঠিক এই সময় একটা লম্বা কালো ছায়া এসে পড়ল ওদের ওপর।

চমকে ফিরে তাকাল তিনজনেই।

তিন

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে ঠিক ওদের মাথার পেছনে দাঁড়িয়েছেন মিস্টার জনসন। ছায়াটা তাঁরই।

এমনিতে তাঁকে বড়ই নিরীহ মনে হয়। কিন্তু ওই মুহূর্তে ভয়ঙ্কর লাগল তাঁকে। ঠোঁট সরে গেছে মাঢ়ীর ওপর থেকে। বেরিয়ে পড়েছে চোখা চোখা দাঁতগুলো। গলা দিয়ে অদ্ভুত একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরোতে থাকল।

কঙ্কালের মত হাড্ডিসার আঙুল দিয়ে মুসার একটা হাত চেপে ধরলেন তিনি। টান দিয়ে বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে!'

তাঁর কথা বলার ভঙ্গি আর কণ্ঠস্বর শিরশিরে কাঁপুনি তুলল কিশোরের মেরুদণ্ডে। ওদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাদের ব্যবস্থা পরে করব আমি।'

মুসাকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেলেন মিস্টার জনসন।

'কি করব!' রবিন বলল। 'বাড়ি চলে যাব?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'উঁহু, মুসাকে কি করেন, না দেখে যাব না। চলো, ওপাশ দিয়ে ঘুরে মিস্টার জনসনের ঘরের কাছে চলে যাই। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখব।'

স্কুল বিল্ডিঙের পাশ ঘুরে অন্য পাশে চলে এল দু'জনে। মাথা নিচু করে নিঃশব্দে গুড়ি মেরে হেঁটে এসে দাঁড়াল জানালাটার নিচে। খুব সাবধানে ধীরে ধীরে মাথা তুলে তাকাল।

নাহ্, খারাপ কিছুই ঘটছে না। অন্তত দেখে সে-রকম মনে হলো না। ডেস্কে দুই কনুই রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে আছেন মিস্টার জনসন। মুসাকে বসিয়ে রেখেছেন তাঁর মুখোমুখি। চিৎকার করছেন না। ধমক দিচ্ছেন না। ছোট একটা ঘড়িকে টেবিলে রেখে আঙুল দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে নিচু স্বরে কথা বলছেন মুসার সঙ্গে। তাঁর কথায় একমত হয়েই যেন ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাচ্ছে মুসা। সায় দিচ্ছে মিস্টার জনসনের কথায়। কথাগুলো এতই নিচু স্বরে হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারল না কিশোররা।

বারান্দার সিঁড়িতে আর ফিরে গেল না। গেটের কাছে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। অবশেষে গেট দিয়ে বেরিয়ে এল মুসা। এগিয়ে এল ওদের দিকে।

'মিস্টার জনসন কি বললেন তোমাকে?' জানার জন্যে তর সইছে না রবিনের।

'টেরি যে তাঁর চায়ের মগে মাছি ফেলল, এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করেছেন নাকি?' জানতে চাইল কিশোর।

তার কথার ধার দিয়েও গেল না মুসা। একঘেয়ে কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলল, 'মাকড়সারা আমাদের বন্ধু। অতি উপকারী প্রাণী। কখনও…কখনও…কখনোই ওদের ক্ষতি করা উচিত না আমাদের।'

'রসিকতা করছ নাকি?' হাসল রবিন।

'কখনও…কখনও…কখনোই মাকড়সাদের ক্ষতি করা উচিত না আমাদের,' একই রকম ভঙ্গিতে একঘেয়ে কণ্ঠে বলল মুসা। 'ওরা বড়ই বুদ্ধিমান প্রাণী। জানো তোমরা? ওরা আমাদের বন্ধু।'

'যখন তোমার পা বেয়ে ওঠে, তখনও? পায়ে সুড়সুড়ি দেয়, কুট করে কামড়ে দেয় চামড়ায়, তখনও বন্ধু?' জিজ্ঞেস করল রবিন। হাসি মুছে গেছে মুখ থেকে।

'কখনও…কখনও…কখনোই মাকড়সাদের ক্ষতি করা উচিত না আমাদের,' রবিনের কথা যেন শুনতেই পায়নি মুসা।

হাঁটতে হাঁটতে মোড়ের দিকে এগোল ওরা।

মোড়ের কাছে পৌঁছে কিশোর বা রবিন কাউকে কিছু না বলে ঘুরে সোজা বাড়ির পথ ধরল মুসা।

'ও তো রোবটের মত আচরণ করছে,' অবাক হয়ে বলল কিশোর।

'রোবট না। জোম্বি,' রবিন বলল। 'ওই যে, যারা…'

'যারা কি?'

'যারা, জেগে থেকেও থাকে না, মনে হয় ঘোরের মধ্যে রয়েছে, তাদের মত। কিন্তু মুসা ওরকম আচরণ করল কেন? মগজ ধোলাই করে দিয়েছেন নাকি মিস্টার জনসন? সম্মোহিত করেছেন?'

'সেটাই জানতে হবে আমাদের,' চিন্তিত স্বরে বলল কিশোর। 'মিস্টার জনসনের বাড়ি যাব। তাঁর ওপর নজর রাখতে হবে।'

'লাভটা কি? কি পাব ওখানে?'

'জানি না। তবে একটা জিনিস বুঝতে পারছি, মিস্টার জনসন একজন অতি অদ্ভুত মানুষ। আর মুসার মগজ ধোলাই করে তার স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি উধাও করে দিয়েছেন তিনি। আমাদেরকেও ছাড়বেন না। বলেছেনই তো, আমাদের ব্যবস্থা তিনি পরে করবেন। তার আগেই তাঁকে ঠেকাতে হবে।'

'তিনি কোথায় থাকেন জানো নাকি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'জানি। ওয়ারনার জুন রোডের পুরানো বাড়িটাতে।'

'বনের মধ্যের সেই পোড়ো বাড়িটা!' রবিন অবাক।

'হ্যাঁ। ঠিক সাতটার সময় আমাদের বাড়িতে চলে এসো। অন্ধকার হলেই বেরিয়ে পড়ব আমরা। ভয় লাগছে?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল রবিন। 'সময় মত পৌঁছে যাব তোমাদের বাড়িতে। চলি এখন।'

চার

শহর থেকে ওয়ারনার জুন রোডটা বেশি দূরে না। তবে ঘন বন একেবারে রাস্তায় এসে ঠেকেছে। সব কিছুই ছায়ায় ঢাকা। পাইন বনের মাথার ওপর দিয়ে গুঙিয়ে ফেরে ঝোড়ো বাতাস।

মূল রাস্তা থেকে নেমে একটা কাঁচা রাস্তা ধরে এগোল কিশোর আর রবিন। বাড়িটার কাছে পৌঁছাল।

'লোকটা পাগল নাকি?' না বলে পারল না কিশোর। 'এ রকম একটা জায়গায় বাস করেন! নিশ্চয় কোন কারণ আছে। অদ্ভুত কিছু ঘটাচ্ছেন বাড়িটার ভেতর। কারণ ছাড়া এ রকম একটা জায়গায় পাগলেও থাকতে আসবে না।'

ড্রাইভওয়েতে মিস্টার জনসনের গাড়িটা দেখতে পেল দু'জনে। বাড়ির পেছনের ঘন ঝোপের ভেতর দিয়ে পা টিপে টিপে এগোল, কোন রকম শব্দ না করে।

'অদ্ভুত এক অনুভূতি হচ্ছে আমার,' ভয়ে ভয়ে বলল রবিন। গলা কাঁপছে তার।

'আমারও,' বলল কিশোর। 'সমস্ত ঝোপঝাড়গুলো মাকড়সার জালে ভরা, লক্ষ করেছ? সবখানে আছে। চোখেমুখে লাগছে।'

চোখেমুখে মাকড়সার জাল লাগলে ভীষণ বিরক্ত লাগে। লেগে গেলে ছাড়ানো কঠিন। আটকে থাকে। খুলতে গেলে আরও বেশি করে জড়ায়। হাত নেড়ে নেড়ে, ঝাড়া দিয়ে ওগুলো খোলার চেষ্টা করতে থাকল কিশোর আর রবিন। আর তা করতে গিয়ে বড় বেশি শব্দ করে ফেলতে লাগল। কারও চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল ঘন বনের মধ্যে।

'পেছন দিয়ে বারান্দায় উঠে পড়লে ভাল হবে,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'উঁকি দিয়ে ঘরের ভেতরে দেখতে সুবিধে হবে।'

আবার এগিয়ে চলল বাড়িটার দিকে। আগে আগে রয়েছে কিশোর। পৌঁছে গেল বারান্দার সিঁড়ির কাছে। বেয়ে উঠতে গিয়ে কাঠের সিঁড়ি ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল সে। কাঁটা দিতে লাগল গায়ে। তার প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রবিন।

দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল দু'জনে।

কিছুই ঘটল না।

বারান্দায় উঠল ওরা।

মাথা নুইয়ে রেখে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে জানালার দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। জানালার কাছে গিয়ে আস্তে করে মাথা তুলে উঁকি দিল ভেতরে। জানালার কাঁচে ময়লা লেগে আছে। তবে ভেতরটা দেখা যায় তার মধ্যে দিয়ে।

ঘরের ভেতরে কিছুই নেই। কিচ্ছু না।

আসবাব নেই। বাতি নেই। ঘর ভর্তি রয়েছে শুধু জাল আর জাল। মাকড়সার জাল। মানুষ বসবাসের কোন চিহ্নই নেই।

তাই বলে অসাবধান হলো না ওরা। এ ঘরে নেই, অন্য ঘরে থাকতে পারে। গাড়িটা যেহেতু আছে, মিস্টার জনসনও আছেন। এগিয়েছিল যেমন করে, তেমনি নিঃশব্দেই আবার পা টিপে টিপে বারান্দা থেকে নেমে এল ওরা।

মিস্টার জনসনকে না দেখে খানিকটা হতাশই লাগছিল। বনের দিকে ফিরে যাচ্ছে, এই সময় আলো চোখে পড়ল। বেসমেন্ট অর্থাৎ মাটির নিচের ঘর থেকে আসছে। জানালা দিয়ে।

পাঁচ

ঝোপের ভেতরে ভেতরে এগোল দু'জনে।

ছোট্ট জানালাটার কাছে গিয়ে থামল।

জানালার কাঁচে এত ময়লা, তার মধ্যে দিয়ে অন্যপাশে দেখাটা কঠিন। যতখানি নজরে এল, তাতে অনুমান করতে অসুবিধে হলো না, কোন ধরনের গবেষণাগার রয়েছে ঘরটাতে। ওদের স্কুলের সাইন্স ল্যাবরেটরিটার মত।

কি নিয়ে গবেষণা হচ্ছে দেখার আর সুযোগ হলো না। উঁকি দেয়ার দু'তিন সেকেন্ডের মধ্যেই একটা দরজা খোলার শব্দ কানে এল ওদের। ভারী পদশব্দ এগিয়ে আসতে লাগল বারান্দা ধরে।

'কে ওখানে?' চিৎকার করে উঠলেন মিস্টার জনসন। মোটেও খুশি মনে হলো না তাঁকে।

বরফের মত জমে গেল যেন কিশোর আর রবিন।

দুপদাপ করে পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন মিস্টার জনসন। ওদের ভাগ্য ভাল, উল্টো দিকে ঘুরে গেলেন তিনি। কিশোররা কোনখানে রয়েছে বুঝতে না পেরে অন্য দিকে খুঁজতে গেলেন।

এই সুযোগে দ্রুত পিছিয়ে গিয়ে আবার ঘন ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়ল দু'জনে। তারপর পা টিপে টিপে পিছিয়ে যেতে শুরু করল বাড়িটার কাছ থেকে।

কিছুদূর গিয়ে মিস্টার জনসন কোনদিকে গেছেন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে চাইল কিশোর। মাটিতে পড়ে থাকা টিনের পুরানো বালতিটা দেখতে পেল না। হাঁটতে গিয়ে পা লাগল তাতে। লাথি লেগে কাত হয়ে গেল বালতিটা। নীরবতার মাঝে বিকট শব্দ তুলে গড়াতে শুরু করল ঢাল বেয়ে।

'থামো! দাঁড়াও!'

কর্কশ আদেশ শোনা গেল।

অদ্ভুত কণ্ঠটা! যেন মানুষের কণ্ঠই নয়!

'এসো এখানে। জলদি এসো! অ্যাই, এসো বলছি!' আবার আদেশ শোনা গেল। মিস্টার জনসনের নয়।

ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলল কিশোরের মাথায়।

কি করবে? থামবে? এগিয়ে যাবে? নাকি পিছাবে?

কিছুই করল না। বরং সাড়া না দিয়ে চুপ করে রইল দু'জনে।

আরও কয়েকবার ডেকে জবাব না পেয়ে চুপ হয়ে গেল লোকটা।

কিশোররাও আর তাঁর গবেষণাগারে উঁকি দেয়ার সাহস করল না সেদিন। বাড়ি ফিরে গেল।

*

পরদিন স্কুলে গিয়ে ভয়ে ভয়ে রইল দু'জনে, কখন ধরে বসেন মিস্টার জনসন। রাতে ওরা তাঁর বাড়িতে গিয়েছিল নাকি–জিজ্ঞেস করলে কি জবাব দেবে ভাবতে লাগল কিশোর। তবে ক্লাসে ঢুকে ওদের দু'জনের দিকে তাকালেনই না তিনি। পড়ানো শুরু করলেন।

মুসা তার সেই 'জোম্বি' অবস্থাতেই রয়েছে। কোন রকম ভাবান্তর নেই চেহারায়। চুপচাপ। অন্য দিনের মত আলাপ জমানোর চেষ্টা করল না কিশোর বা রবিনের সঙ্গে। মাকড়সা ছাড়া আর কোন কথা নেই যেন ওর মুখে। দুই গোয়েন্দা নিশ্চিত হলো, আসলেই কিছু একটা হয়েছে ওর। ওর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই।

'কিছু কিছু লোক আছে, আমাদের মাকড়সা বন্ধুদের পাত্তাই দিতে চায় না,' লেকচার শুরু করলেন মিস্টার জনসন। তাঁর মুখেও মাকড়সা ছাড়া যেন আর কিছু নেই। আর কোন বিষয় নেই পড়ানোর।

'যেহেতু প্রাণীগুলো ছোট,' বলে যাচ্ছেন তিনি। 'কিছু কিছু লোক আছে, অকারণে ওদেরকে ঝাড়া দিয়ে ফেলে দেয়। পা দিয়ে মাড়ায়।'

তাঁর নির্বিকার ভাবভঙ্গি দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর আর রবিন। ওদেরকে তিনি সন্দেহ করেননি। বুঝতে পারেননি, আগের রাতে ওরাই তাঁর বাড়িতে গিয়েছিল।

'মাকড়সাদের খাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব,' ক্লাসের এ মাথা ওমাথা জুড়ে হেঁটে বেড়াতে শুরু করলেন মিস্টার জনসন। 'মাকড়সারা কখনও মড়া খায় না। ওদের পছন্দ জ্যান্ত প্রাণী।' রবিনের কানের কাছে ঝুঁকে শেষ কথাটা এমন করে বললেন তিনি, সীট থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠল রবিন।

'হ্যাঁ, শুধু জ্যান্ত প্রাণীই খায় ওরা। জালের ফাঁদ পেতে পোকা ধরে। শিকার জালে পড়া মাত্র ছুটে যায় মাকড়সা। সিল্কের সুতো দিয়ে জড়িয়ে ফেলে শিকারকে। গতকাল ওই সুতোর কথা কি বলেছিলাম, মনে আছে, কিশোর?'

চশমার পুরু কাঁচের ভেতর দিয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। চোখ দুটো জ্বলছে।

মরিয়া হয়ে মনে মনে জবাব খুঁজতে লাগল কিশোর। স্মৃতিটা ফাঁকা হয়ে থাকল। মাকড়সার সিল্কের সুতোর ব্যাপারে কি বলেছিলেন মিস্টার জনসন, মনে করতে পারল না।

'মনে নেই, স্যার,' সত্যি কথাটাই বলল কিশোর।

'আমি বলেছিলাম, এই সুতো ভীষণ শক্ত,' মিস্টার জনসন বললেন। 'নাইলনের চেয়ে শক্ত, ইস্পাতের চেয়ে মজবুত, মানুষের তৈরি যে কোন জিনিসের চেয়ে টেকসই। কাজেই যদি একবার মাকড়সার জালে জড়িয়ে যায় কোন পোকা, তার আর মুক্তি নেই।'

মাকড়সাদের শিকারের বর্ণনা দিতে গিয়ে ভাবভঙ্গি বদলে গেল মিস্টার জনসনের। ভয়ঙ্কর লাগছে এখন তাঁকে।

'সেই ভয়ানক মজবুত সিল্কের সুতোয় আটকে পড়ার পর কি ঘটে, বলো তো?' ক্লাসকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আমি জানি, স্যার,' হাত তুলল মুসা। 'পোকাটার গায়ে দাঁত ফুটিয়ে দেয় মাকড়সাটা।'

'গুড বয়, মুসা,' মিস্টার জনসন বললেন। 'ঠিক বলেছ। পোকাটার গায়ে দাঁত ফুটিয়ে দিয়ে জ্যান্ত রেখেই ওটাকে খেতে শুরু করে। সমস্ত রস শুষে খেয়ে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলে পোকাটাকে। এই হলো মাকড়সার খাওয়ার কায়দা।'

মিস্টার জনসনের আলোচনার ধরনটাই কেমন ভীতিকর। গায়ে শিহরণ তোলে।

'আমি তোমাদের বলেছি, মাকড়সারা আমাদের বন্ধু,' মিস্টার জনসন বলে যাচ্ছেন। 'কিন্তু তাই বলে ওদের নির্বিষ ভাবাটা ঠিক হবে না। ব্ল্যাক উইডো স্পাইডারের নাম নিশ্চয় তোমরা শুনে থাকবে। ছোট জাতের মাকড়সা। পায়ের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেও হয়তো টের পাবে না।'

বাঁকা চোখে কিশোর আর রবিনের দিকে তাকালেন তিনি। 'কিন্তু যদি একবার তোমার শরীরে দাঁত ফোটাতে পারে, তাহলে বুঝবে শেষ। স্রেফ খুন হয়ে যাবে। খুদে একটা ব্ল্যাক উইডোর কামড়ে ঘোড়া পর্যন্ত মরে যায়, এতই বিষাক্ত। কাজেই মাকড়সাদের কাছে আত্মরক্ষার অস্ত্র নেই এটা যারা ভাবে, তারা নেহাতই বোকা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মাকড়সারা তাদের প্রতি সম্মান দাবি করতে পারে। নাকি?'

ঘরের পেছন দিকে রাখা আলমারির কাছে চলে গেলেন তিনি। জুতোর বাক্সের সমান একটা বাক্স নিয়ে ফিরে এলেন। কি দেখাবেন তিনি? ক্লাস ভর্তি ছেলেমেয়ে সবাই খুব কৌতূহলী হয়ে উঠল।

বাক্সের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন তিনি। বের করে আনার পর দেখা গেল তাঁর হাতের তালুতে বসে আছে বিশাল, রোমশ, ভয়ঙ্কর চেহারার একটা মাকড়সা।

অস্ফুট চিৎকার করে উঠল কেউ কেউ। জোরাল গুঞ্জন।

'এটাই সেই বিখ্যাত টারানটুলা মাকড়সা,' মিস্টার জনসনের ভঙ্গি দেখে মনে হলো ক্লাসকে ভয় দেখাতে পেরে বেশ মজা পাচ্ছেন তিনি। 'এত খুদে নয় এটা। কাজেই কিছুটা সম্মান অন্তত একে দিতে পারো। চাইলেই চট করে পায়ের নিচে পিষে মারতে পারবে না এটাকে। এমনকি একে দেখলে, ভয়ও পাবে। এই এখন যেমন পাচ্ছ।'

আচমকা মাকড়সাটাকে রবিনের নাকের নিচে ঠেলে দিলেন মিস্টার জনসন। চিৎকার দিয়ে সীট থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রবিন।

রবিনকে ভয় দেখানোর পর যে সারিতে কিশোর বসে আছে, সে-সারির দিকে এগিয়ে এলেন তিনি। তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। কিশোরের চোখে চোখে তাকিয়ে বললেন, 'ভয় তোমাদেরকে পেতেই হবে। টারানটুলারা শিকারী মাকড়সা। এরা জাল বোনে না। ফাঁদ পাতে না। গর্তে বাস করে। শিকার দেখলে ছুটে বেরিয়ে এসে শিকারের ঘাড় কামড়ে ধরে গর্তের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। হ্যাঁ, টারানটুলারা কামড়াতেও পারে।'

হাত থেকে মাকড়সাটাকে ছেড়ে দিলেন তিনি।

কিশোরের হাতের ওপর পড়ল ওটা।

'দুঃখিত, কিশোর,' খুশি খুশি গলায় বললেন মিস্টার জনসন।

আতঙ্কে জমে যাওয়ার জোগাড় হলো কিশোরের, কিন্তু সেটা প্রকাশ করল না। মাথা ঠাণ্ডা রাখল। রবিনের মত লাফিয়ে উঠল না। চিৎকারটা আটকে রাখল বহু কষ্টে। আশা করল—এটা পোষা মাকড়সা, কামড়াবে না।

কিশোরের হাত বেয়ে ওপরের দিকে উঠে এল মাকড়সাটা। ওটার ধারাল চোয়াল দেখতে পাচ্ছে সে। ঠেলে বেরোনো কুতকুতে চোখ দেখতে পাচ্ছে।

মিনিটখানেক তাকে ভুগিয়ে তারপর মাকড়সাটাকে তুলে নিলেন মিস্টার জনসন।

'কিশোর তো খুব মজা পেয়েছে। রোমশ এই চমৎকার মাকড়সাটাকে নিয়ে আর কেউ খেলা করতে চাও?' আহ্বান জানালেন তিনি।

কিন্তু কেউ আগ্রহ দেখাল না।

'দেখলে তো? নিজেরাই প্রমাণ করে দিলে, মাকড়সাদের কেউ পছন্দ করো না,' তিনি বললেন। 'কুকুর ভালবাসো, বিড়াল ভালবাসো, পাখি ভালবাসো, কিন্তু মাকড়সাকে নয়। মাকড়সার প্রতি কোন ভালবাসা নেই কারও। সম্মান দেখাতে জানো না। অথচ কুকুর-বিড়াল-পাখির চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান হলো এই মাকড়সারা। কুকুর কি জাল বুনতে পারে? বিড়াল কি মাকড়সার মত করে শিকার ধরতে পারে? পারে না। তারপরেও কেন আমরা মাকড়সাকে পাত্তা দিই না? আকারে ছোট বলে। যদি বড় প্রাণী হতো, তাহলে নিশ্চয় সম্মান দেখাতাম। তোমার কি মনে হয়, কিশোর পাশা?'

'আমারও তাই মনে হয়, স্যার,' ভয়ে ভয়ে জবাব দিল কিশোর।

'তা তো মনে হবেই। কারণ সত্যি তোমরা গুরুত্ব দাও না এই বুদ্ধিমান প্রাণীটিকে। যাই হোক, কুইজের সময় হলো।'

আগের রাতে হোমওঅর্ক ঠিক মতই করেছিল। তাই কুইজের প্রায় সব প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারল কিশোর।

ঘণ্টা বাজলে মুসা ও রবিনকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

'কেমন লাগছিল, কিশোর?' রবিন জিজ্ঞেস করল। 'ভয়ঙ্কর ওই প্রাণীটা যখন তোমার হাতে হাঁটছিল, অনুভূতিটা কেমন ছিল?'

'জঘন্য! কামড়ে দিতে পারে সেই ভয়ে হাত নাড়ানোরও সাহস পাইনি।'

'মাকড়সাদেরকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই,' রোবটের মত যান্ত্রিক কণ্ঠে বলে উঠল মুসা। 'মাকড়সারা আমাদের বন্ধু।'

'তা তো বটেই,' রেগে গেল রবিন। 'চামড়ায় যখন চোয়ালের কাঁটা ফুটাবে, তখন টের পাবে কি রকম বন্ধু।'

'কাল রাতে তোমরা মিস্টার জনসনের বাড়িতে গিয়েছিলে নাকি?' জানতে চাইল মুসা।

মুসার অলক্ষে তাড়াতাড়ি রবিনকে চোখ টিপল কিশোর। মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জবাব দিতে মানা করল।

বুঝতে পারল রবিন। প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে পাল্টা প্রশ্ন করল মুসাকে, 'এ রকম একটা ধারণা হলো কি করে তোমার?'

'রবিন,' কিশোর বলল, 'বাড়ি যাওয়া দরকার আমাদের। মুসা, পরে দেখা হবে।'

মুসাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার সামনে কোন কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না। সেজন্যেই চালাকি করে তার সামনে থেকে রবিনকে সরিয়ে আনল।

মুসার সামনে মাকড়সা কিংবা মিস্টার জনসনকে নিয়ে কোন কথা বলতে মানা করে দিল রবিনকে। মুসার মগজটাকে ধোলাই করে 'জোম্বি' বানিয়ে দিয়েছেন মিস্টার জনসন, ওকে বশ করেছেন, এখন তাকে দিয়ে গুপ্তচরগিরি করালেও অবাক হব না। কিশোর আর রবিনকে এখন সন্দেহ করেন তিনি। মুসাকে লাগিয়ে দিয়েছেন ওদের কাছ থেকে খবর আদায় করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

'বনের মধ্যের ওই বাড়িটাতে কিছু না কিছু ঘটছেই,' রবিনকে বলল কিশোর। 'সেটা কি, জানতেই হবে আমাদের।'

'তারমানে আবার যেতে চাও সেখানে?'

'হ্যাঁ, চাই।'

ছয়

সে-রাতে রবিন আর কিশোর মিলে আবার রওনা হলো বনের দিকে। মিস্টার জনসনের বাড়িতে। রহস্যটার একটা কিনারা না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছে না।

বাড়িটার দিকে এগোচ্ছে, এমন সময় ওদের পেছনে গাড়ির শব্দ শুনল। ফিরে তাকিয়ে দুটো হেডলাইট ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। কিশোররা তখন এমন এক জায়গায় রয়েছে, যার একদিকে পাথুরে পাহাড়, আরেক দিকে নদী। লুকানোর কোন জায়গাই নেই।

আর কোন উপায় না দেখে দৌড়ানো শুরু করল। ওরা ভাবল, গাড়িটা মিস্টার জনসনের। দেরি করে বাড়ি ফিরেছেন।

ওরা যত জোরে দৌড়ায়, গাড়িটা তার চেয়ে জোরে ওদের দিকে ছুটে আসে। উজ্জ্বল আলোর বন্যা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন ওদের ওপর।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করল দু'জনে। কিন্তু অতিরিক্ত খাড়া ঢাল।

লাউডস্পীকারে গমগম করে উঠল একটা ভারী কণ্ঠ, 'যেখানে আছ, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।'

পাথর হয়ে গেল যেন দু'জনে।

গাড়ির দরজা খোলার শব্দ হলো।

আলোর জন্যে ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না ওরা। হেডলাইটের আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। এরই মাঝে অস্পষ্টভাবে একটা ছায়ামূর্তিকে এগিয়ে আসতে দেখল।

আলোর এ পাশে বেরিয়ে এল মূর্তিটা। চিনতে পারল ওরা। শহরেরই একজন পুলিশ অফিসার। নাম এডগার রাইলি। তিন গোয়েন্দাকে চেনে সে। নাম জানে। জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর! তোমরা এখানে কি করছ?'

'আমাদের টীচার মিস্টার জনসনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম,' জানাল তাকে।

'উনি এখানে থাকেন?' রাইলি অবাক। 'এই বনের মধ্যে! আমি তো জানতাম বাড়িটা খালি পড়ে আছে বহুদিন থেকে। কেউ থাকে না এখানে।'

'তা-ই ছিল। কিছুদিন হলো এসেছেন তিনি।'

'অ। রাস্তার ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। একটা লোক আমাকে বলল, দুটো ছেলেকে এদিকে আসতে দেখা গেছে। তার ধারণা, ছেলেগুলো পথ হারিয়েছে। সেজন্যেই দেখতে এসেছিলাম। জায়গাটা ভাল না। ঘন বন।' থাপ্পড় দিয়ে মশা মারল রাইলি। 'মশাও তো দেখছি মেলা।'

রবিন বলল, 'যেমন মশা, তেমনি মাকড়সা। আরও যে কি কি আছে খোদাই জানে।'

'মশার চেয়ে মাকড়সারা বেশি বিপজ্জনক। অনেক মাকড়সার কামড়ে মানুষ মারাও যায়। মাকড়সা বেশি থাকলে বিপদের কথা,' রাইলি বলল। 'বাড়ি যাবে কি করে? আমার গাড়িতে যেতে চাইলে চলো? পৌঁছে দিই।'

রাজি হলো না কিশোর। বলল, টীচারের সঙ্গে দেখা না করে যাবে না।

ওদের সাবধানে থাকতে বলে গাড়ি নিয়ে চলে গেল রাইলি।

পেছনের লাল বাতিটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর আফসোস হতে লাগল কিশোরের। মনে হলো—ওর সঙ্গে চলে গেলেও পারতাম। গাঢ় অন্ধকারে এ ভাবে গোয়েন্দাগিরি করতে যাওয়াটা কোন মজার ব্যাপার নয়। কিন্তু রহস্যময় টীচারের উদ্ভট কাণ্ডকারখানার রহস্য ভেদ না করে যেতেও ইচ্ছে করছে না। রবিনকে নিয়ে আবার এগোল কিশোর।

বাড়িটা আগের রাতের মতই অন্ধকার। মাটির নিচের ঘর থেকে কেবল মৃদু আলো আসছে।

ঝোপের ভেতরে ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল দু'জনে। মাকড়সার জাল

এদিকটায় অনেক বেশি ঘন। মুখে, মাথায় জড়িয়ে যেতে থাকল।

মাটির নিচের ঘরটার ছোট জানালার কাছে গিয়ে নিচে উঁকি দিল। এটা যে ল্যাবরেটরি তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। মস্ত এক টেবিল ভর্তি নানা রকম ফ্লাস্ক আর টেস্ট টিউব। বীকার থেকে বীকারে নল যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। কতগুলো ইলেকট্রনিক যন্ত্রের লাল আলোগুলো এমন করে জ্বলছে-নিভছে যেন পাগল হয়ে গেছে।

'মিস্টার জনসনকে দেখা যাচ্ছে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল তাকে রবিন।

'না।'

ভাল করে দেখার জন্যে মাথাটাকে আরও সামনে বাড়িয়ে দিল কিশোর।

মিস্টার জনসনকে দেখা গেল না কোথাও।

ঘাবড়ে গেল সে। ওদেরকে ধরার জন্যে অন্ধকারে কোথাও ঘাপটি মেরে নেই তো?

'কি বুঝছ?' প্রশ্ন করল রবিন।

'মিস্টার জনসন কোন ধরনের গবেষণা করছেন এখানে,' জবাব দিল কিশোর।

'গবেষণাগার, না আজব রান্নাঘর?' রসিকতা করল রবিন। 'পোকা-মাকড়ের অষ্ট-ব্যঞ্জন রান্না করছেন নাকি?'

'চুপ, ওই যে আসছেন!' সাবধান করে দিল কিশোর।

আরেকটা ঘর থেকে গবেষণাগারে ঢুকলেন মিস্টার জনসন। কয়েকটা যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখে নিশ্চিত হয়ে নিলেন সব ঠিকমত চলছে কিনা। কমলা রঙের তরল পদার্থ ভরা একটা ফ্লাস্ক তুলে নিয়ে চলে গেলেন অন্য ঘরটায়। ওখানে গিয়ে কি করছেন তিনি, দেখতে পেল না ওরা।

'ওদিকটায় যেতে পারলে হয়তো দেখা যাবে,' কিশোর বলল।

'কিন্তু কোথায় যাচ্ছি বুঝব কি করে? যা অন্ধকার।'

'পেনলাইট আছে।'

খুদে টর্চলাইটটা বের করে দেখাল ওকে কিশোর। 'চলো, ঘরের ভেতরটা দেখার ব্যবস্থা করা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখি।'

হেঁটে এগোনোর সাহস হলো না। ঝোপের ডালপালার নিচ দিয়ে বুকে হেঁটে এগোতে লাগল।

'এই, থামো তো!' রবিন বলল।

ঘুরে তাকাল কিশোর। 'কি ব্যাপার?'

'আলোটা ফেলো। কি যেন লাগছে।'

আলো ফেলল কিশোর।

রবিনের হাতে একটা কালো মাকড়সা।

বরফের মত জমে গেল দু'জনে।

'ব্ল্যাক উইডো!' কেঁপে উঠল রবিনের গলা।

'ব্ল্যাক উইডো হলে পিঠে একটা চিহ্ন থাকবে,' বলল কিশোর।

'আওয়ারগ্লাস। দুটো গ্লাস উল্টো করে একটার পেছনে আরেকটা লাগিয়ে দিলে দেখতে যেমন লাগবে, অনেকটা সেই রকম।'

'এটার পিঠে কি আওয়ারগ্লাস আছে?'

'কি করে বলব?'

'দেখি, আলোটা আরেকটু সরাও তো। নাহ্, কোন চিহ্ন-টিহ্ন তো দেখছি না। থাবা দিয়ে ফেলে দেব নাকি?'

কিশোরের বলার জন্যে অপেক্ষা করল না রবিন। হঠাৎ এক থাবা মেরে হাত থেকে ফেলে দিল মাকড়সাটাকে।

মাটিতে পড়েই ভয়ানক ভঙ্গিতে আট পায়ে খাড়া হয়ে উঠল ওটা। একটা সেকেন্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভয় দেখাল যেন ওদের। তারপর আট পায়ে হেঁটে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

আবার এগোল কিশোররা।

আলো চোখে পড়ল।

থেমে গিয়ে রবিনকে বলল, 'ওই যে, আরেকটা জানালা।'

জানালার কাছে গিয়ে কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকাল কিশোররা।

'কি সাংঘাতিক!' বলে উঠল রবিন।

'সর্বনাশ!' ছোট্ট চিৎকারটা ঠেকাতে পারল না, আপনাআপনি মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কিশোরের।

'ওগুলো কি বাস্তব?'

'বাস্তব, তবে অবিশ্বাস্য!'

সাত

যে জিনিস দেখল, নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো। ঘরভর্তি খাঁচা। আর খাঁচাভর্তি মাকড়সা। আর সে-মাকড়সাগুলো একেকটা কুকুরের সমান বড়। তিন ফুট লম্বা পা মানুষের বাহুর সমান মোটা। কালো বড় বড় লোমে ছাওয়া। মনে হতে লাগল, বাস্তব নয়, হরর ছবি দেখছে।

আতঙ্কিত হয়ে তাকিয়ে আছে দু'জনে, এ সময় ঘরে ঢুকলেন মিস্টার জনসন। একটা খাঁচার দরজা খুললেন।

হেঁটে বেরিয়ে এল একটা মাকড়সা।

একটা পাত্রে বাদামী রঙের আঠা আঠা এক ধরনের তরল পদার্থ ঢেলে দিলেন মিস্টার জনসন। জিনিসটার চেহারা দেখেই বমি আসার জোগাড় হলো কিশোরের।

পাত্রের কাছে গিয়ে আট পায়ের ওপর ভর দিয়ে শরীরটাকে নামিয়ে দিল মাকড়সাটা। ভয়ঙ্কর চোয়ালের নিচ থেকে জিভ বের করে চাটতে শুরু করল সেই

জঘন্য খাবার।

'দেখি, একটু সরো!' ভয় পাচ্ছে রবিন, কিন্তু দেখার লোভটা সামলাতে পারছে না।

কাঁচে মাথা ঠেকিয়ে দেখতে লাগল। দেখার আগ্রহে এত বেশি ঠেলতে লাগল মাথাটা, চাপ লেগে ভেঙে গেল কাঁচ। ঝনঝন করে ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

জানালার ফোকর দিয়ে রবিনের দেহটাও ভেতরে চলে গেল। পড়েই যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে পা ধরে ফেলে আটকাল কিশোর। অর্ধেকটা শরীর চলে গেছে ভেতরে। উল্টো হয়ে ঝুলতে লাগল সে।

শব্দ শুনে চমকে গিয়ে ওপর দিকে মুখ তুলে তাকালেন মিস্টার জনসন।

বহু কষ্টে টেনে রবিনকে বাইরে নিয়ে এল কিশোর। কিন্তু ওর মুখটা দেখে ফেলার জন্যে প্রচুর সময় পেয়েছেন মিস্টার জনসন। আর দেখলে চিনবেন না, এটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না কিশোরের।

পালানোর তাগিদ অনুভব করল সে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কিন্তু দৌড়ানোর সাহস হলো না।

বুকে হেঁটে নিঃশব্দে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। ঝোপের ভেতর দিয়ে এগোনোর সময় নিচু ডালের বাড়ি লাগছে মাথায়। শব্দ না করে এগোনোও কঠিন।

বাড়িটার কাছ থেকে সরে এসেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। দৌড়ে সরে যেতে চাইল বাড়ির কাছ থেকে। মিস্টার জনসন এসে ওদের ধরে ফেলার আগেই।

হঠাৎ করেই ভাবনাটা খেলে গেল তার মাথায়–তিনি কি নিজে আসবেন ওদের ধরতে? নাকি কুকুরের সমান বড় বড় মাকড়সা পাঠাবেন? মানুষ যেমন চোর ধরতে কুকুর ছেড়ে দেয়, তেমনি করে?

কি করেন, দেখার জন্যে কৌতূহল হলেও দাঁড়ানোর সাহস হলো না। বাড়ির পাশ দিয়ে ছুটল। কোণ ঘুরে সামনের দিকে পৌঁছার আগেই কানে এল ভয়ঙ্কর শব্দ। রক্ত-পানি-করা চাপা গর্জন।

ফিরে তাকানোর সময় নেই। সাহসও হলো না। কোনও দিকে না তাকিয়ে ঝেড়ে দৌড়াতে থাকল রাস্তার দিকে।

কিসের গর্জন দেখার জন্যে ভেতরে ভেতরে কৌতূহলে মরে যাচ্ছে কিশোর, কিন্তু থামার সুযোগ নেই। অনেকখানি বন পেরোতে হবে তখনও। কাজেই দৌড়াতেই থাকল।

অবশেষে বনটা পেরিয়ে এল নিরাপদে। যখন বুঝল, ভয় আর নেই আপাতত, তখন দৌড়ানো বন্ধ করল। হেঁটে চলল রাস্তা ধরে। মিস্টার জনসনের ওখানে যা যা দেখে এসেছে, সেটা নিয়ে আলোচনা করতে করতে চলল।

দু'জনেই একমত হলো, এমন কোন ফরমুলা বানিয়েছেন তিনি, যেটার সাহায্যে মাকড়সাগুলোকে বড় করে দানব বানিয়ে ফেলা সম্ভব।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রাস্তার ওপর। পাথর হয়ে গেল যেন।

ওদের ঠিক সামনে রাস্তার মাঝখানে বসে আছে কালো রঙের একটা কি যেন ফুট তিনেক উঁচু।

ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে।

মাকড়সা!

'শর্টকাটে মাকড়সাটাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন মিস্টার জনসন,' ফিসফিস করে বলল রবিন। 'আমাদের জন্যে বসে আছে। কাছে গেলেই ধরবে। কি করব, কিশোর?'

'লাঠি,' বলল কিশোর। 'ডাল ভেঙে নাও। পিটিয়ে তাড়াব।'

'কিন্তু ডাল ভাঙতে গেলেই যদি তেড়ে আসে?'

'কথা বলে সময় নষ্ট করলে তো আসবেই,' ডালের জন্যে এদিক ওদিক তাকানো শুরু করে দিয়েছে কিশোর। রাস্তার পাশেই মরা ডাল পড়ে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে ভেঙে নিয়ে এল।

রবিনও ভেঙে নিল একটা ডাল।

লাঠি হাতে তৈরি হয়ে দাঁড়াল।

কালো প্রাণীটা নড়ল না। কিন্তু ওদের দিকেই যে নজর, সেটা বোঝা যাচ্ছে।

'শক্ত করে ধরো লাঠিটা,' রবিনকে বলল কিশোর। 'টর্চ জ্বালব। এগোনোর চেষ্টা যদি করে, কোন কথা নেই, দেবে বাড়ি মেরে। তারপর যা হয় হবে।'

লাঠিটা তুলে ধরল রবিন। 'আমি রেডি।'

ছোট্ট টর্চটা বের করল কিশোর। হাত কাঁপছে। টর্চটাকে পিস্তলের মত তুলে ধরে এক পা আগে বাড়ল। দম বন্ধ করে রেখেছে। যা থাকে কপালে ভেবে কালো প্রাণীটাকে লক্ষ্য করে টিপে দিল সুইচ।

'রোডো!' একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল দু'জনে।

দানব-মাকড়সা নয়। ওর নাম রোডো। চেনে ওকে ওরা। মিস্টার সিম্পসন নামে এক ভদ্রলোকের কুকুর। এ রাস্তাটারই শেষ মাথার বাড়িটাতে থাকেন উনি।

'তাহলেই বোঝো,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল রবিন। 'বিপদের সময় মানুষের মগজ কি রকম উল্টোপাল্টা ভাবে। কোথায় কুকুর আর কোথায় মাকড়সা।'

'এ ক্ষেত্রে খুব একটা উল্টোপাল্টা ভেবেছে বলা যাবে না,' জবাব দিল কিশোর। 'দানব-মাকড়সা তো সত্যিই দেখে এসেছি মিস্টার জনসনের বাড়িতে। সেই দেখাটা কি ভুল ছিল?'

চুপ হয়ে গেল রবিন।

বনের মধ্যে মিস্টার জনসনের বাড়িটার দিকে ফিরে তাকাল দু'জনেই। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না ওটা।

আবার কোন বিপদ এসে হাজির হয়, তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি রওনা হলো।

আট

পরদিন স্কুলে বিজ্ঞান ক্লাসে মিস্টার জনসন ঘোষণা করলেন ওদের জন্যে একটা স্পেশাল আনন্দদানের আয়োজন করেছেন। মাকড়সা আর তাদের কর্মকাণ্ডের ওপর একটা ভিডিও করেছেন, যেটা ওদের দেখাবেন তিনি।

জানালার পর্দা টেনে ঘর অন্ধকার করে টেপটা চালু করে দেয়া হলো।

অনেক বড় করে দেখানো হয়েছে মাকড়সাগুলোকে। জালের সামান্য দূরে গিয়ে ঘাপটি মেরে থাকতে দেখা গেল ওটাকে। একটা ঘাসফড়িং এসে আটকে গেল জালে। বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন মাকড়সাটার দেহে। ঝড়ের গতিতে ছুটে গিয়ে স্প্রে'র মত করে সিল্কের সুতো ছিটিয়ে জড়িয়ে ফেলল ঘাসফড়িংটাকে। তারপর দাঁত বসিয়ে দিল ওটার গায়ে। পুরো দৃশ্যটাই দেখানো হয়েছে খুব কাছে থেকে, ক্লোজ-আপে।

'দারুণ দৃশ্য!' মিস্টার জনসন বললেন। 'আমাদের মতই বুদ্ধিমান ওরা, তাই না? এটা দেখে কি মনে হচ্ছে না মানুষ হিসেবে আমরা যতটা সম্মান পাই ওদেরও ততটা পাওয়া উচিত? অপেক্ষা করো, এমন দিনও আসবে, যখন মানুষ ওদের সম্মান করতে বাধ্য হবে।'

ঘণ্টা পড়ল। বেরোনোর জন্যে উঠতে গেল কিশোররা। মিস্টার জনসন বললেন, 'এক মিনিট, রবিন। একটু বসো। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে আমার।'

রবিনকে রেখে বেরিয়ে এল সবাই। চিন্তা লাগছে কিশোরের। মুসাকে তো জোম্বি বানিয়ে দিয়েছেন। রবিনকেও যদি সে-রকম কিছু বানিয়ে ফেলেন?

মিস্টার জনসনের এই মাকড়সা-প্রীতি কারোরই ভাল লাগছে না। অন্য ছেলেমেয়েদের কাছেও আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠল এটা। সবারই প্রশ্ন, মাকড়সাকে সম্মান দেখানোর কথা বলে তিনি কি বোঝাতে চাইছেন?

'তিনি আসলে বোঝাতে চান,' কিশোর বলল, 'মাকড়সাকে সম্মান করতে আমাদেরকে বাধ্য করবেন তিনি।'

'মানে?' কিশোরের কথা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল টেরির বন্ধু টাকি।

'আমি এত্তবড় মাকড়সার কথা বলছি,' দুই হাত ছড়িয়ে মাকড়সার বিশালত্ব বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর। 'মিস্টার জনসন এমন এক ফরমুলা আবিষ্কার করেছেন, যেটার সাহায্যে দানব-মাকড়সা তৈরি করে ফেলা সম্ভব।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল সবাই। প্রথমে হেসে উঠল টাকি। ওর হাসিটা যেন সংক্রামিত হলো সবার মধ্যে। সবাই হাসতে শুরু করল।

'হেসো না, সত্যি বলছি আমি!' গম্ভীর হয়ে রইল কিশোর। 'নিজের চোখে

দেখে এসেছি আমরা। শুধু আমি না। রবিনও ছিল আমার সঙ্গে। বনের মধ্যে পুরানো বাড়িতে তাঁর ল্যাবরেটরি। লুকিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম আমরা। টের পেয়ে আমাদের তাড়া করেছিলেন তিনি।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই, তা তো বটেই,' মুখ বাঁকিয়ে ব্যঙ্গ করল কিশোরকে টেরি। 'শুধু মাকড়সা না, এত্ত বড় বড় মাছিও বানিয়ে ফেলেছেন তিনি।' দুই হাত যতটা সম্ভব ছড়িয়ে দেখাল সে।

আরও গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর। 'দেখো, টেরি, সব সময় রসিকতা কোরো না। আমি সত্যি বলছি। বিশ্বাস করো আমার কথা। তিনি যে বাড়িটায় থাকেন, ওটার মাটির নিচের ঘরে ল্যাবরেটরি বানিয়েছে। বড় বড় খাঁচায় মাকড়সা পুষছেন। বিশ্বাস না হলে রবিনকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।'

'বেশ,' বলল শারি নামে একটা মেয়ে, 'রবিনকেই জিজ্ঞেস করব আমরা। তবে আমার ধারণা, আমাদের ভয় দেখানোর জন্যে পুরো ব্যাপারটাই বানিয়ে বলছ তুমি।'

'ওই যে, রবিন আসছে,' দরজার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল কিশোর।

ওদের দিকে এগিয়ে এল রবিন। কিশোর কিছু বলার আগেই ওকে ঘিরে ফেলল টেরি, টাকি ও আরও কয়েকজন ছেলেমেয়ে। মিস্টার জনসনের বাড়িতে উদ্ভট, অস্বাভাবিক কিছু দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করল।

'নাহ্, আমি কিছুই দেখিনি,' যান্ত্রিক গলায় স্রেফ অস্বীকার করল রবিন। 'তা ছাড়া অস্বাভাবিক আর কি দেখব? মিস্টার জনসন একজন অত্যন্ত স্বাভাবিক নিরীহ ভদ্রলোক।'

'তারমানে তুমি আর কিশোর কোনও বড় ধরনের মাকড়সা বা অন্য কোন পোকাটোকা দেখোনি?' জিজ্ঞেস করল টেরি।

'নাহ্, তা কেন দেখব? আর সেটা দেখাটা কি স্বাভাবিক?'

'বড়সড় কোন ভয়াবহ মানুষখেকো দানব-মাকড়সা দেখোনি?' টাকি জিজ্ঞেস করল।

'মাকড়সারা ভয়াবহ হয় না,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল রবিন। 'মাকড়সারা আমাদের বন্ধু। ভীষণ চালাক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন উপকারী প্রাণী। ওদেরকে ভক্তিশ্রদ্ধা আর সম্মান করা উচিত আমাদের।'

'কি মিয়া পুঁচকে শার্লক,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে গা-জ্বালানো খিকখিক হাসি হাসতে লাগল টেরি। 'তোমার দোস্ত তো তোমার কথায় সায় জানাল না।'

'আগেই জানতাম,' শারি বলল, 'ও আমাদের বোকা বানাচ্ছে। এই চলো চলো, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফালতু বকবকানিতে লাভ নেই।'

চলে গেল ওরা।

রবিনের ওপর রেগে গেল কিশোর। 'ওদেরকে সত্যি কথাটা বললে না কেন? আমাকে তো একটা ছাগল বানিয়ে ছেড়েছ ওদের সামনে।'

'সত্যি কথাটাই বলেছি ওদেরকে,' যান্ত্রিক স্বরে জবাব দিল রবিন।

'কাল রাতের কথাটা ভুলে গেলে নাকি?' খেঁকিয়ে উঠল কিশোর।

'মাকড়সারা আমাদের বন্ধু। ওদেরকে কখনও...কখনও বিরক্ত করা উচিত

নয় আমাদের।'

'রবিন! কি হয়েছে তোমার, বলো তো?' আশঙ্কাটা ফিরে এল কিশোরের। 'মিস্টার জনসন কি করেছেন তোমাকে?'

কিন্তু জবাব দিল না রবিন। দাঁড়ালও না আর। কিশোরের দিকে তাকিয়ে যান্ত্রিক হাসি হেসে রোবটের মত পা বাড়াল গেটের দিকে। সে-ও মুসার মত, জোম্বির মত আচরণ শুরু করেছে।

নয়

মুসা তো আগেই জোম্বি হয়েছে, এখন রবিনও হলো। কিছু একটা করার জরুরী তাগিদ অনুভব করল কিশোর। নইলে কোনদিন তাকেও জোম্বি বানিয়ে দেবেন মিস্টার জনসন। তখন আর কিছুই করার থাকবে না।

কি করা যায়, ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরল কিশোর।

বুদ্ধি একটা পেয়ে গেল। বাড়ি ফিরে মেরিচাচীকে জিজ্ঞেস করল, 'চাচী, সেদিন যে একটা অ্যান্টিক ঘড়ি পাওয়া গিয়েছিল পুরানো মালের মধ্যে, সেটা কি বেচে দিয়েছ?'

'না,' মেরিচাচী বললেন। 'কি করবে?'

'দাও না একটু। কাজ আছে।'

'দেখো, ভাঙে না যেন। এ রকম জিনিস সচরাচর পাওয়া যায় না। রেল কন্ডাকটরের ঘড়ি। তা ছাড়া বহু পুরানো। ভাল দাম পাওয়া যাবে।'

'না ভাঙব না। দাও।'

ঘড়িটা অনেক ভারী। সেকালে ট্রেনে চলাচলের সময় পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াত কন্ডাকটর। লম্বা একটা চেন লাগানো। যাতে পকেট থেকে পড়ে গিয়ে হারিয়ে না যায়। গোল ঢাকনাটার কিনারটা সোনা দিয়ে বাঁধানো। মিস্টার জনসন যে ঘড়ি দুলিয়েছিলেন মুসার চোখের সামনে তার সঙ্গে এ ঘড়িটার অনেক মিল। হুবহু এক রকম বললেও চলে। সে-জন্যেই চেয়েছে কিশোর।

ঘড়িটা নিয়ে প্রথমে রবিনদের বাড়িতে গেল সে। নিজের ঘরে রয়েছে রবিন। তাকে বলল কিশোর, একটা জিনিস দেখাতে এনেছে। পকেট থেকে বের করল ঘড়িটা।

'বাহ্, সুন্দর তো,' যান্ত্রিক স্বরে বলল রবিন। কোন উচ্ছ্বাস নেই।

'নেবে নাকি? নাও না,' ঘড়িটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল কিশোর। 'চেনটা ধরে চোখের সামনে দোলাতে থাকো পেণ্ডুলামের মত। দারুণ একটা ব্যাপার ঘটবে, দেখো।'

কিন্তু হাতে নেয়ার আগ্রহ দেখাল না রবিন। শেষে কিশোরই চেন ধরে ওর চোখের সামনে নিয়ে গিয়ে দোলাতে শুরু করল, মিস্টার জনসন যেমন করে মুসার

সামনে দুলিয়েছিলেন।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রবিন।

'দেখো,' নরম স্বরে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকল কিশোর, 'দেখতে থাকো। কেমন সামনে যাচ্ছে...পেছনে যাচ্ছে...সামনে...পেছনে...সামনে...পেছনে...সামনে...পেছনে...'

তাকিয়ে থাকতে থাকতে আপনাআপনি চোখ বুজে এল রবিনের। যেন ঘুমিয়ে যাচ্ছে। চোখ আধবোজা করে ঢুলুঢুলু ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল।

আশা হলো কিশোরের। যা সন্দেহ করেছিল, ঠিক তাই। ঘড়ির সাহায্যে ওকে সম্মোহিত করে ফেলেছেন মিস্টার জনসন।

'এক থেকে দশ পর্যন্ত গোণার সঙ্গে সঙ্গে জেগে যাবে তুমি,' রবিনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকল কিশোর। 'সম্মোহন কেটে যাবে তোমার। মাকড়সা নিয়ে আর কোন ধরনের উদ্ভট ভাবনা চিন্তা থাকবে না মগজে। আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে তুমি।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

আশা বাড়ল কিশোরের। কাজ হচ্ছে মনে হলো।

এক দুই তিন করে গুনতে শুরু করল।

পুরোপুরি চোখ মেলল রবিন।

কিশোর বলল, 'রবিন, দেখো দেখো, তোমার পেছনে বিছানার ওপর মস্ত এক মাকড়সা।'

রবিনের প্রতিক্রিয়াটা হলো দেখার মত। লাফ দিয়ে নেমে গেল সে। একটা ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল বিছানার দিকে, বাড়ি মেরে মাকড়সাটাকে ফেলে দেয়ার জন্যে।

হা-হা করে হেসে উঠল কিশোর।

বিছানায় মাকড়সা না দেখে অবাক হলো রবিন।

'তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম,' কিশোর বলল।

'কি বলছ?' বুঝতে পারল না রবিন। 'কিসের পরীক্ষা?'

'মিস্টার জনসন তোমাকেও সম্মোহিত করে ফেলেছিলেন। আজব এক ঘোরের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন তোমাকে। মাকড়সারা যে কত ভাল, মগজ ধোলাই করে সেই ধারণাটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন তোমার মগজে। মাকড়সাদের ভালবাসতে বলেছিলেন।'

'পাগল নাকি তুমি?' বিশ্বাস করতে চাইল না রবিন। 'কোন রকম ঘোরের মধ্যে যাইনি আমি। মাকড়সার মত একটা পচা প্রাণীকে ভালবাসার তো প্রশ্নই ওঠে না।'

'তারমানে তোমার কিছু মনে নেই? স্কুলে তুমি সবার সামনে বলোনি মাকড়সারা আমাদের বন্ধু? ওদেরকে কখনও বিরক্ত করা উচিত নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি? মনে পড়ছে না, মিস্টার জনসনের বাড়ির মাটির নিচে দেখা দানব-মাকড়সার কথা?'

খানিক চিন্তা করে নিল রবিন। 'হ্যাঁ, তা মনে পড়ছে।'

'স্কুলে সবার সামনে যে বলেছ মাকড়সা ভালবাসো, সেটা মনে পড়ছে না?'

মাথা নাড়ল রবিন। 'নাহ্। কেবল একটু একটু মনে পড়ছে, চোখের সামনে একটা ঘড়ি দুলিয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলছিলেন মিস্টার জনসন। তারপর আর কিছু মনে নেই আমার।...কি করেছিলেন, বলো তো?'

'ওই যে বললাম সম্মোহিত করেছিলেন। মাকড়সা-ভালবাসার বুলি তুলে দিয়েছিলেন তোমার মুখে। বোঝা যাচ্ছে, মুসাকেও একই কাজ করেছেন।...নাহ্, এ ভাবে আর চলতে দেয়া যায় না। কিছু একটা করা দরকার। ঠেকানো দরকার উন্মাদটাকে। ভাল কিছু যে করছেন না তিনি, এটুকু বোঝা হয়ে গেছে।'

'উদ্দেশ্যটা কি তাঁর?' রবিনের প্রশ্ন।

'আমি তো একটা উদ্দেশ্যই দেখতে পাচ্ছি। ওই দানব-মাকড়সাগুলোকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দেয়া। ভয় দেখিয়ে মাকড়সার প্রতি শ্রদ্ধা আদায়ের পরিকল্পনা করেছেন তিনি।'

'কিন্তু কেন?'

'মাকড়সা-বিদ্বেষী মানুষদের শায়েস্তা করার জন্যে, আর কেন? তিনি চান, মাকড়সাকে সবাই ভালবাসুক। প্রাণীগুলোর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করুক। পা দিয়ে না মাড়াক। উদ্দেশ্যটা খারাপ না। কিন্তু যে ভাবে তিনি মানুষকে মাকড়সা ভালবাসতে বাধ্য করতে চাইছেন, সেটা খারাপ। যত ভয়ানক স্বভাবেরই হোক ছোট প্রাণীকে ভয় পায় না মানুষ, মিস্টার জনসনের ভাষায় "সম্মান" করতে চায় না, তাই দানব তৈরি করছেন। এত বড় মাকড়সা দেখলে কলজে কেঁপে যাবে মানুষের। পা দিয়ে মাড়ানো তো দূরের কথা, প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ভয়ে দৌড়ে পালাতে দিশে পাবে না।'

কিশোরের যুক্তির সঙ্গে একমত হলো রবিন। মিস্টার জনসনকে জলদি ঠেকানো দরকার, এ ব্যাপারেও দ্বিমত রইল না। মাটির নিচের ঘরের খাঁচাগুলোর কথা ভাবল। সবগুলো খাঁচা ভর্তি দেখে এসেছে। কোনটাই খালি নেই। তারমানে তৈরি হয়ে গেছেন তিনি। যে কোন মুহূর্তে এখন মাকড়সাগুলোকে ছেড়ে দিতে পারেন। মাকড়সা-বিদ্বেষী মানুষকে আক্রমণ করার জন্যে পাঠাতে পারেন তাঁর অতিকায় মাকড়সা-বাহিনীকে।

'তাহলে কি করব আমরা এখন?' প্রশ্ন করল রবিন। 'কাউকে বলা যাবে না এ কথা। সবাই আমাদের পাগল ভাববে।'

'আবার যেতে হবে মিস্টার জনসনের বাড়িতে,' বলল কিশোর। 'প্রমাণ নিয়ে আসতে হবে। আজই সুযোগ। টীচারদের মীটিং আছে। রাত দশটার আগে বাড়ি ফিরতে পারবেন না তিনি।'

'কিন্তু কি প্রমাণ জোগাড় করব? মাকড়সা ধরে আনতে পারব না। ওই দানব ধরে আনা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু মাকড়সার ছবি তো আনা যাবে। তোমার ক্যামেরাটা নিয়ে নিও সঙ্গে।'

'ঠিক বলেছ,' হাসি ফুটল রবিনের মুখে। 'ক্যামেরার বুদ্ধিটা মাথায়ই আসেনি আমার।'

ঘণ্টা দু'য়েক পর আবার কিশোররা মিস্টার জনসনের বাড়ির কাছাকাছি হলো। স্কুলের কাছ দিয়েই এসেছে। ইচ্ছে করেই ঘুরে এসেছে ওদিক দিয়ে, পার্কিং লটে মিস্টার জনসনের গাড়িটা আছে কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে। ওদের হাতে ঘণ্টা দু'য়েক সময় আছে। এর মধ্যে কাজ সেরে কেটে পড়তে হবে।

মুসাকেও নিয়ে আসার ইচ্ছে ছিল কিশোরের। ঘড়ির সাহায্যে রবিনের মত ওকেও সম্মোহনমুক্ত করতে পারত। সেজন্যে রবিনদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওদের বাড়িতেও গিয়েছিল। কিন্তু ওকে পায়নি। ওর মা'র সঙ্গে কোথায় যেন গেছে।

যাই হোক, বনের মধ্যে সেই জায়গাটাতে চলে এল কিশোর আর রবিন, যেখান থেকে ঝোপের মধ্যে দিয়ে বুকে হেঁটে এগিয়েছিল আগের দিন। বাড়ির কোথাও কোন আলো জ্বলছে না। মাটির নিচের ঘরের ল্যাবরেটরিতেও না। তবে তাতে ছবি তোলায় অসুবিধে নেই। রবিনের ক্যামেরায় ফ্ল্যাশলাইট আছে।

ঝোপের ভেতরে ভেতরে বুকে হেঁটে এগিয়ে চলল দু'জনে। বাড়ির কাছে গিয়ে দেখল, ভাঙা জানালাটায় একটা হার্ডবোর্ড লাগিয়ে দিয়েছেন মিস্টার জনসন। টানাটানি করে খোলার চেষ্টা করল। লাভ হলো না। শক্ত করে লাগিয়েছেন। হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে এল আবার আগের জায়গায়।

'এখন কি করা?' রবিনের প্রশ্ন।

'বাড়িতে ঢুকতে হবে,' বলল কিশোর। 'আর তো কোন উপায় দেখছি না। নিচে নেমে যেতে হবে।'

আঁতকে উঠল রবিন। 'পাগল হলে নাকি? এই অন্ধকারে ভয়ঙ্কর ওসব মাকড়সার মধ্যিখানে গিয়ে ঢুকব!'

কিশোরের কাছেও পাগলামি মনে হচ্ছে ব্যাপারটা। বলল, 'তাহলে তুমি বলো, আর কি করা যায়?'

'আরেকটা জানালা খুঁজে বের করা যেতে পারে,' পরামর্শ দিল রবিন। 'আরও জানালা নিশ্চয় আছে। ঝোপে ঢাকা পড়ে আছে বলে দেখতে পাচ্ছি না।'

ঠিকই বলেছে রবিন। আরও জানালা থাকতেই পারে। শেষে দু'দিক দিয়ে খুঁজতে যাবে ঠিক করল। বাড়ির একপাশ দিয়ে যাবে ও, অন্যপাশ দিয়ে রবিন।

চাঁদের আলো আছে। মেঘও আছে আকাশে। মাঝে মাঝে চাঁদ ঢেকে দিচ্ছে। অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে বনভূমি। সরে গেলেই আবার আলোকিত। আলো থাকলে দেখে দেখে চলছে। না থাকলে আন্দাজে। সামনে হাত বাড়িয়ে রেখেছে কিশোর, যাতে গাছটাছ পড়লে হাতে ঠেকে। বাড়ি কিংবা ধাক্কা না খায়।

বাড়ির কোণ ঘুরে এল সে। হাতে ঠেকল কি যেন। তবে সেটা গাছ নয়। বড় মাছ ধরার জালের মোটা সুতোর মত জিনিস। আঠা আঠা। হাত পেঁচিয়ে গেল তাতে। টানাটানি করে ছাড়াতে হলো।

কিছু সুতো পায়েও জড়াল। সেগুলো ছুটানোর জন্যে নিচু হতেই কাঁধে, ঘাড়ে জড়িয়ে গেল আরও। হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছুটাতে যেতেই পুরো হাতে জড়িয়ে গেল। ছুটানোর জন্যে মরিয়া হয়ে টানাটানি শুরু করল। থাবা মারতে লাগল। যতই চেষ্টা

করে, ততই জড়ায়। ছাড়াতে তো পারলই না, বেকায়দা ভঙ্গিতে শূন্যে ঝুলতে থাকল। মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়া মাছির মত।

দশ

মাকড়সার দৃষ্টিশক্তি খুব দুর্বল। জালে পড়া শিকারের দাপাদাপিতে জালের মধ্যে যে কম্পন সৃষ্টি হয় সেটা অনুভব করেই মাকড়সা বুঝতে পারে জালে শিকার পড়েছে। ছুটে আসে তখন ধরার জন্যে। নড়াচড়া না করে চুপচাপ পড়ে থাকলে কিশোরের অস্তিত্ব টের পাবে না মাকড়সাটা।

ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি! চুপচাপ পড়ে রইল সে। নিঃশ্বাস ফেলতে ভয় পাচ্ছে। ওই সামান্যতম কম্পনেও যদি টের পেয়ে গিয়ে চলে আসে মাকড়সাটা!

তার আশঙ্কাকে বাস্তব করে দিতেই যেন শুরু হলো পদশব্দ। নিশ্চয় মাকড়সাটার। জালে শিকার পড়ার খবরটা পৌঁছে গেছে তার কাছে। এগোনো শুরু করেছে।

ভয়াবহ দুঃস্বপ্নেও কখনও এ রকম পরিস্থিতিতে পড়েনি সে। চোয়ালের দুই পাশের কাঁটাওয়ালা দাঁত খুলতে খুলতে তার দিকে এগিয়ে আসছে ভয়ঙ্কর প্রাণীটা–রোমহর্ষক এই দৃশ্য সইতে পারবে না। নিজে নিজে ছুটতে পারবে না এই জাল থেকে, বুঝে গেছে। বাঁচার আর কোন পথও নেই। তাই চোখ বুজে পড়ে থাকল চুপচাপ। মাকড়সাটার তীব্র পচা নিঃশ্বাসের গন্ধ আর মারাত্মক দাঁতগুলো দেহে ফুটে যাওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল সে। আতঙ্কে রবিনকে ডাক দেয়ার কথাটাও যেন ভুলে গেছে।

কতক্ষণ পরে জানে না–তার মনে হলো প্রায় এক যুগ পরে কানের কাছে ফিসফিস করে ডাক শুনতে পেল রবিনের, 'কিশোর?'

'রবিন!' ককিয়ে উঠল কিশোর। মাকড়সা নয় রবিনের পদশব্দ ছিল ওটা, বুঝতে পেরে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। 'জালে আটকা পড়েছি আমি। ছাড়াও আমাকে।'

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল রবিন।

মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ। আলোকিত হলো বনভূমি। রবিনকে দেখতে পেল। সে-ও দেখতে পেল কিশোরকে।

'জাল পেতে রেখে গেছে মাকড়সা। তাতে ধরা পড়েছি আমি।' সাবধান করল কিশোর, 'খবরদার, বেশি এগিয়ো না! জালে আটকা পড়বে।'

'আহ্, কি একখান পোজ দিয়ে আছ,' হেসে বলল রবিন। 'দারুণ একটা ছবি হবে। এতদিন জানতাম মাছি আর পোকা পড়ে মাকড়সার জালে। মানুষও যে পড়ে, জানতাম না। মিস্টার জনসনকে ধন্যবাদ।'

'কথা কম বলো। মাকড়সারা চলে আসার আগেই ছাড়াও আমাকে। জলদি

করো। ওরা এসে গেলে তোমাকেও ছাড়বে না।'

পকেট থেকে ছুরি বের করে জালের সুতো কাটতে শুরু করল রবিন। কাটার গতি বড়ই ধীর। এত বেশি সুতো, কেটে শেষ করতে পারছে না। তাছাড়া নিজেও যাতে জালে না জড়ায় সেদিকেও লক্ষ রাখতে হচ্ছে।

কিশোরের বাঁ হাত আর বাঁ পা জালমুক্ত করে ফেলল সে। ডান হাতে পেঁচিয়ে থাকা সুতো কাটতে শুরু করেছে, এই সময় একটা শব্দ কানে এল। কি যেন এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। মাটিতে পড়ে থাকা পাতায় খসখস শব্দ হচ্ছে।

'মাকড়সা!' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'জলদি কাটো!'

'জলদিই [illegible] করছি,' ভয় পেয়ে গেছে রবিন। কিন্তু মাথা গরম করল না। বেছে বেছে একটা একটা করে সুতো কেটে চলেছে।

এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ। ঠিক এই সময় আবার মেঘের আড়ালে চলে গেল চাঁদ। গভীর অন্ধকারে ঢাকা পড়ল কিশোররা। কোন কিছুই নজরে আসছে না আর।

এগিয়ে আসার শব্দ দ্রুততর হলো। যে প্রাণীই হোক ওটা, ছুটে আসতে শুরু করেছে এখন ওদের দিকে।

জালের সুতোয় কিশোরের যে পা'টা আটকে এখনও আছে, ছাড়ানোর জন্যে টানাটানি শুরু করল সে। কিন্তু সাংঘাতিক শক্ত সুতো। ছিঁড়তেও পারল না, ছুটাতেও পারল না।

সুতো কাটা থামিয়ে দিয়েছে রবিন। কান পেতে আছে শব্দের দিকে।

'থামলে কেন?' চিৎকার করে উঠল। আতঙ্কে মাথা গরম হয়ে গেছে তখন কিশোরের। 'কাটো! কাটো! জলদি কাটো!'

শিকারের গন্ধ পেয়ে গেছে বোধহয় প্রাণীটাও। ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে আসছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই একেবারে কাছে এসে পড়ল শব্দ। হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল তীব্র আলো। তারপর গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল আবার সব কিছু। জালের শেষ ক'টা সুতো কেটে দিল রবিন। অল্পক্ষণেই মুক্ত হয়ে গেল কিশোর।

মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল এতগুলো ঘটনা।

'এদিক দিয়ে এসো!' বলেই দৌড় দিল রবিন।

বাড়ির পাশ ঘুরে ছুটল দু'জনে। মাকড়সা যেদিক থেকে আসছে তার উল্টো দিকে যাচ্ছে। বিশাল একটা ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ল। কাঁটা বসানো ডালপালা দিয়ে ওদের যেন গ্রাস করে নিল ঝোপটা। অন্ধকারে কোন দিকে চলেছে বুঝতে পারল না ওরা।

মেঘের আড়াল থেকে আবার বেরিয়ে এল চাঁদ। পথ দেখে চলতে পারায় ওদের চলার গতি বেড়ে গেল অনেক।

'এহ্হে!' বলে উঠল রবিন।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ক্যামেরাটা ফেলে এসেছি।'

'কোথায়?'

'তোমার জাল যেখানে কেটেছি।'

'কিন্তু আর তো ওখানে যাওয়া যাবে না এখন!' ফিরে যেতে চাইছে না কিশোর। মাকড়সার জালে পড়ার আতঙ্কটা কাটেনি এখনও পুরোপুরি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে যেতে চায় এই এলাকা থেকে।

'কিন্তু ওই ক্যামেরাটাই তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।'

'ক্যামেরা আমার প্রাণ বাঁচাল কি করে?'

'কেন, আলোর ঝিলিক দেখোনি?'

'তা তো দেখেছি। ফ্ল্যাশারের আলো। তাতে কি হয়েছে?'

'মাকড়সাটা যখন ছুটে আসছিল, ঠেকানোর আর কোন উপায় না দেখে শব্দ লক্ষ্য করে শাটার টিপে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আচমকা ফ্ল্যাশারের আলো জ্বলে উঠতে দেখলে থেমে যাবে মাকড়সাটা। কাজ যে হয়েছিল, সেটা তো বুঝতেই পারছ। নইলে এতক্ষণে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলার সুযোগ হত না। আলোর ঝলকানি দেখে মাকড়সাটাও আর এগোল না, সেই সঙ্গে ওটার ছবিও উঠে গেল। কি, কাজটা ঠিক করিনি?'

'তা তো করেছ। কিন্তু মাকড়সাটাকে দেখেছিলে নাকি? কত বড় ছিল?'

'দেখিনি। সামনে আসেনি ওটা।'

'তাহলে ছবি উঠেছে বুঝলে কি করে?'

'শব্দ লক্ষ্য করে যেহেতু শাটার টিপেছি, আমি শিওর, উঠেছে। তাড়াহুড়োয় মানুষের চোখে অনেক সময় যে জিনিস ধরা পড়ে না, ক্যামেরার চোখে ঠিকই পড়ে সেটা—কারণ, ক্যামেরার চোখ ভুল করে না।'

'হুঁ, তা ঠিক। কিন্তু এখন তো আর ক্যামেরাটার দরকার নেই,' বলল কিশোর। 'ফিরে যাওয়া মানে সময় নষ্ট। কোন বিপদের মুখে গিয়ে পড়ব আবার তা-ই বা কে জানে!'

'মাকড়সার জাল তারমানে ভালই ভয় দেখিয়েছে তোমাকে। কিন্তু জন্তুটার ছবি রয়েছে ওটার মধ্যে…'

'জন্তু নয়, পোকা।'

'যে সাইজ হয়ে গেছে, এখন আর পোকা বলা যাবে না ওটাকে,' রবিন বলল। 'ক্যামেরাটার মধ্যে রয়েছে মিস্টার জনসনের কুকর্মের সাক্ষী। ওটা ছাড়া ফিরে গেলে কেউ বিশ্বাস করবে না আমাদের কথা।'

' তা ঠিক। একমত না হয়ে পারল না আর কিশোর। ছবিটা নিয়ে যাওয়াটাই সমীচীন হবে।

আবার ফিরে চলল দু'জনে। খুব সাবধানে ধীরে ধীরে পা ফেলছে। সন্দেহ হচ্ছে কিশোরের, অন্ধকারে ক্যামেরাটা খুঁজে পাবে তো? ওখানে দানব-মাকড়সাটা অপেক্ষা করছে না তো ওদের জন্যে?

সামনে কি আছে হাত বাড়িয়ে বুঝে নিয়ে হাঁটছে। অসাবধান থেকে আরেকবার বোকার মত আটকা পড়তে চায় না মাকড়সার ভয়ানক জালে।

'এই যে, পেয়েছি গাছটা,' ফিসফিস করে বলল রবিন। 'এর আশেপাশেই কোথাও আটকা পড়েছিলে তুমি।'

'সত্যিই এটা তো? বাড়িটার এত কাছে ছিলাম তখন?' বিশ্বাস হতে চাইল না কিশোরের।

'হ্যাঁ, ছিলাম। জালে আটকা পড়ে কোন কিছু খেয়াল করার মত অবস্থা ছিল না তোমার।'

হাঁটু গেড়ে বসে গাছের গোড়ায় হাতড়ে হাতড়ে ক্যামেরাটা খোঁজা শুরু করল দু'জনে। কয়েক সেকেন্ড খোঁজার পর এ ভাবে হবে না বুঝে পেনলাইট বের করল কিশোর। আলো খুব সামান্যই দিচ্ছে খুদে টর্চ, কিন্তু অন্ধকারে হাতড়ানোর চেয়ে তো ভাল। দেখা তো যাচ্ছে।

প্রথম গাছটার গোড়ায় পাওয়া গেল না ক্যামেরাটা। পরের গাছটার গোড়ায় খুঁজল। ওখানেও পেল না। আরেকটার গোড়ায় খুঁজল। নেই। একের পর এক গাছের গোড়ায় খুঁজে চলল দু'জনে।

'এই যে পাওয়া গেছে!' অবশেষে চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

তার কথা শেষ হতে না হতেই কি যেন একটা এগিয়ে আসতে শুনল ওদের দিকে। নিশ্চয় মাকড়সা! দেখার জন্যে বসে থাকল না কেউ। লাফিয়ে উঠেই দৌড়।

শহরে পৌঁছানোর আগে আর পেছন ফিরে তাকাল না কেউ।

হাঁপাতে হাঁপাতে রবিন বলল, 'যাক, প্রাণটা বাঁচল এ যাত্রা। আর প্রমাণও নিয়ে আসতে পারলাম।' ক্যামেরা তুলে দেখাল সে।

এগারো

পরদিন ওদের বিজ্ঞান ক্লাসে একটা ফীল্ড-ট্রিপের ব্যবস্থা হলো। ন্যাচারাল হিস্টরি মিউজিয়ামে ওদের নিয়ে গেলেন মিস্টার জনসন।

এর আগেও বেশ কয়েকবার ওখানে গিয়েছে কিশোররা। বেশ কয়েকটা প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসর আর বিশাল দাঁতাল বাঘের একটা কঙ্কাল রয়েছে ওখানে। দেখতে ভাল লাগে ওর। দেখতে দেখতে কল্পনায় হারিয়ে গিয়ে চলে যায় বহু-বহুকাল আগের সেই প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে। অদ্ভুত এক ফ্যান্টাসির জগতে ঘুরে বেড়ায় মনে মনে।

কঙ্কালগুলোর কাছে ওদের যেতে দিলেন না মিস্টার জনসন, ঘোরাতে লাগলেন শুধু পোকা-মাকড় ভরা কাঁচের বাক্সগুলোর সামনে।

কথা বলার জন্যে রবিনকে খুঁজছিল কিশোর। কিন্তু আশেপাশে কোনখানে দেখতে পেল না ওকে। গেল কোথায়? মুসাও নেই। স্কুলেই আসেনি সেদিন। ওর সম্মোহন কাটানোর সুযোগ করে উঠতে পারেনি তখনও কিশোর।

পোকা-মাকড়ের পর সরীসৃপের ডিসপ্লেগুলোর কাছে ওদের নিয়ে গেলেন মিস্টার জনসন। স্টাফ করা কিছু র‍্যাটলস্নেক আর গোখরো দেখা গেল সেখানে।

মৃত সাপগুলোর চেহারাও ভয়ানক লাগে।

হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকল রবিন। কপালে ঘাম।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

'ফিল্মগুলো ডিভেলাপ করতে গিয়েছিলাম,' কানের কাছে ফিসফিস করে বলল রবিন। 'এক ঘন্টায় করে দেয় যে সব দোকানগুলোতে, তার একটায়। এখান থেকে আমরা বেরোতে বেরোতে কাজটা হয়ে যাবে ওদের।'

মিউজিয়াম ক্যাফিটিরিয়ায় লাঞ্চ খেল ওরা। ডাইনোসর দেখার সুযোগ পেল দুপুরের পর। কিশোরের প্রিয় ডাইনোসর টাইরানোসরাস রেক্স। দাঁত কি একেকখান, বাপরে!

'দেরি হয়ে গেছে,' মিস্টার জনসন বললেন। 'আজ আর স্কুলে ফেরার সময় নেই। চলো, বাসে ওঠা যাক। যার যার বাড়ির সামনে নামিয়ে দেয়া হবে।'

শুনে খুশি হলো। স্কুলে যেতে যে খারাপ লাগে কিশোরের, তা নয়। কিন্তু এ রকম একটা ফীল্ড-ট্রিপের পর ক্লাস করতে আর ভাল লাগবে না।

বাস ছাড়ল। আরেকটু হলেই রবিনকে ফেলে আসছিল। শেষ মুহূর্তে দৌড়ে আসতে দেখা গেল ওকে। ওর মুখ দেখেই বুঝে গেল কিশোর, ছবিগুলো ডিভেলাপ করা হয়ে গেছে।

বাসে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'বাস ড্রাইভারকে তো নতুন দেখছি। কে লোকটা? অদ্ভুত চেহারা!'

ছোটখাট চেহারার অদ্ভুত লোকটাকে কিশোরও চেনে না। আগে কখনও দেখেনি!

কিশোরের পাশে বসল রবিন। ছবির খামটার মুখ ফড়াৎ করে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল। দেখার জন্যে কাত হয়ে এল কিশোর। ঠোকাঠুকি হয়ে গেল মাথায়। কেয়ারই করল না। তর সইছে না দেখার জন্যে। ঠিক এই সময় সীটের সারির মাঝখান দিয়ে হেঁটে এসে ওদের পেছনে দাঁড়ালেন মিস্টার জনসন।

'কোথায় গিয়েছিলে, রবিন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'ক্যান্ডি কিনতে গেছিলে নাকি?'

'না, স্যার,' মিথ্যে বলল রবিন। 'ডাইনোসরের ফসিল দেখতে দেখতে এতই তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম, সবাই যে কখন বেরিয়ে গেছে খেয়ালই ছিল না।'

'হুঁ!' রবিনের কথা বিশ্বাস করলেন কিনা মিস্টার জনসন, বোঝা গেল না। তবে আর কিছু বললেন না তিনি। বাসের সামনের দিকের সীট, যেখানে গিয়ে বসেন সাধারণত, সেখানে বসলেন না। বসলেন ওদের ঠিক পেছনের সীটে। তারমানে, ছবিগুলো দেখা আর এখন সম্ভব না কোনমতে।

এক এক করে যার যার বাড়ির সামনে নেমে যেতে থাকল ছেলেমেয়েরা। মাত্র অল্প কয়েকজন আর বাকি থাকতে, উঠে সামনের সীটে চলে গেলেন মিস্টার জনসন। সঙ্গে সঙ্গে খাম থেকে ছবিগুলো বের করে ফেলল রবিন।

'এই যে দেখো, মা'র ছবিটা,' ওপরের ছবিটা দেখিয়ে বলল সে, 'ভাল উঠেছে, তাই না?'

'বাদ দাও না এ সব!' অধৈর্য হয়ে বলল কিশোর। তর সইছে না কিশোরের।

'মাকড়সার ছবিটা বের করো।'

ছবিগুলোর মধ্যে খুঁজতে শুরু করল সে। 'মা'র ছবি, বাবার ছবি–নানা পোজে নানা অ্যাঙ্গেলে তোলা, সবই রয়েছে, পাওয়া যাচ্ছে না কেবল মাকড়সারটা।

রবিন বলল, 'তাড়াহুড়ার সময় এমনই হয়, আগেও দেখেছি। সব্ব পাওয়া যায়, যায় না কেবল যে জিনিসটা খোঁজা হয় সেটা।'

অবশেষে পাওয়া গেল সেই ছবিটা। শেষ ছবি। তবে তাতে মাকড়সা নেই। আছে অদ্ভুত চেহারার একজন ছোটখাট মানুষ। রূপকথার কল্পিত বামন-মানবের সঙ্গে অনেক মিল। বিকৃত, আঁচিলে ভরা···

মুখ তুলে ড্রাইভারের দিকে তাকাল কিশোর। ছবিটার সাথে অবিকল মিল রয়েছে লোকটার। দুইয়ে দুইয়ে চার মেলানোর মত ব্যাপারটা বুঝে ফেলল কিশোর আর রবিন দু'জনেই। শব্দ লক্ষ্য করে ছবি তুলতে গিয়ে মাকড়সা ভেবে লোকটার ছবি তুলে ফেলেছে রবিন। লোকটা মিস্টার জনসনের সহযোগী।

ভীষণ হতাশ হলো দু'জনে।

চারপাশে তাকাতে গিয়ে চমকে গেল কিশোর। ওরা যখন ছবি দেখায় মগ্ন, সে-সময় কখন যে একে একে নেমে গেছে সমস্ত ছেলেমেয়েরা, খেয়ালই রাখেনি। এখন দেখল, বাসের মধ্যে শুধু ওরা দু'জন, মিস্টার জনসন আর তাঁর অদ্ভুত চেহারার ড্রাইভারটা ছাড়া আর কেউ নেই।

জানালার বাইরে তাকিয়ে আরেকবার চমকানোর পালা। রবিনদের বাড়ির পথও নয়, কিশোরদের বাড়ির পথও না, অন্য পথে যাচ্ছে গাড়ি। সবাইকে নামিয়ে দেবার পর শহরের বাইরে অন্য রাস্তায় চলে এসেছে বাস। স্রেফ একটা গাধা মনে হলো নিজেকে কিশোরের। এতক্ষণ খেয়াল করেনি বলে।

ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন মিস্টার জনসন।

গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল তাঁর বামন-ড্রাইভার।

কিশোর আর রবিন দু'জনেই বুঝল, কপালে দুঃখ আছে ওদের!

বারো

শহরের এমন এক জায়গা দিয়ে চলেছে ড্রাইভার, যে জায়গাটায় সাধারণত আসা হয় না ওদের। কিশোররা কেন, শহরের কেউই তেমন একটা আসে না এদিকে। জায়গাটা বুনো। পাহাড়ের গায়ে ঘন জঙ্গল।

একটা ব্রিজ পেরিয়ে এল বাস। পাশের সরু রাস্তায় নেমে এগোল কিছুদূর। দুই ধারে ভাঙাচোরা কিছু ঝুপড়ি আছে। কোন এককালে খনি-শ্রমিকেরা থাকত সম্ভবত ওগুলোতে। সেগুলো পার হয়ে এসে থামল বাস।

সীটের সারির মাঝখান দিয়ে হেঁটে এলেন মিস্টার জনসন। ওদের সামনের সীটে এসে বসলেন। ঘুরে তাকালেন ওদের দিকে।

'শীঘ্রিই তোমাদের নামিয়ে দেয়া হবে,' বললেন তিনি। 'তবে তার আগে ভাবছি আমার আজব ঘড়িটা দেখাব তোমাদের।'

'ওই ঘড়ি একবার দেখিয়েছেন আমাকে, মিস্টার জনসন,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ, দেখিয়েছি। খুব ভাল লেগেছিল তোমার, তাই তো বলেছিলে।'

'হ্যাঁ, বোধহয় বলেছিলাম।'

'খুব আগ্রহ দেখিয়েছিলে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তোমার চোখের পাতা ভারি হয়ে এসেছিল। তাই না?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রবিন।

ঘড়িটা বের করলেন মিস্টার জনসন। রবিনের চোখের সামনে দোলাতে শুরু করলেন। চোখ সরাতে পারছে না রবিন। বুঝতে পারছে আবার সম্মোহিত হয়ে পড়ছে সে, ঘোরের মধ্যে চলে যাচ্ছে।

কিশোরের দিকে তাকালেন মিস্টার জনসন। 'কিশোর, তোমার কি খবর? ঘড়িটার ব্যাপারে আগ্রহ আছে?'

'না স্যার।'

'কেন থাকবে না? এত সুন্দর একটা ঘড়ি। কাছে থেকে দেখতে চাও না? শোনো, আমার কথা শোনো। ঘড়িটার দিকে তাকাও। দেখতে থাকো কেমন করে এটা দুলছে। একবার সামনে যাচ্ছে, একবার পেছনে।'

কিশোর তাকিয়ে আছে ঘড়িটার দিকে। চোখ সরাতে পারছে না। চেন ধরে দুলিয়ে যাচ্ছেন মিস্টার জনসন। সামনে-পেছনে, সামনে-পেছনে।

সম্মোহিত হচ্ছে না কিশোর। জানা আছে, ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাউকে সম্মোহিত করা যায় না–বিশেষ করে সে যদি বুঝে ফেলে তাকে সম্মোহিত করা হচ্ছে। এক ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে তখন মগজে।

কিশোরকে সম্মোহিত করতে পারলেন না মিস্টার জনসন। কিন্তু সেটা তাঁকে বুঝতে দিল না কিশোর। দেখতে চাইল, তিনি কি করেন। তাই সম্মোহিত হওয়ার ভান করল।

'চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে তোমাদের, তাই না?' দু'জনকেই জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

দু'জনেই জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

'ভারি! ভীষণ ভারি!' কেমন একঘেয়ে স্বরে বলে গেলেন তিনি। 'শুধু আমার কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছ না তোমরা। এখন থেকে তোমরা জানবে, মাকড়সারা আমাদের বন্ধু। বিস্ময়কর এক প্রাণী ওরা। কখনও, কোন কারণেই কোন মাকড়সাকে আঘাত করবে না। কাউকে মাকড়সা মারতে দেখলেই এসে বলে দেবে আমাকে। বুঝতে পেরেছ?'

মাথা নেড়ে দু'জনেই জানাল, পেরেছে।

কিশোরদেরকে আরও কিছু নির্দেশ দিলেন তিনি। ওদের মগজে গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করলেন–তাঁর বাড়িতে যা যা দেখেছে ওরা, সব ভুলে যাবে। কোনদিন আর তাঁর বাড়িতে যাওয়ার চেষ্টা করবে না। কি কি দেখে এসেছে সেখানে কাউকে গিয়ে বলবে না।

'আমি এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনলে জেগে উঠবে তোমরা,' তিনি বললেন। 'দেখবে খুব আরাম লাগছে তোমাদের। অদ্ভুত এক মানসিক শান্তি। তোমাদেরকে যে সম্মোহিত করা হয়েছে, এ কথাটাও মনে করতে পারবে না।...এক...দুই...'

দশ গোণার সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল কিশোররা। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল ড্রাইভার। বাড়ি নিয়ে চলল ওদের।

'কোথায় নামিয়ে দেব,' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার জনসন।

রবিনদের বাড়ির সামনে দু'জনকে নামিয়ে দিতে বলল কিশোর।

নামিয়ে দিয়ে চলে গেল বাস। ফুটপাত ধরে হেঁটে চলল কিশোররা। সতর্ক হয়ে রবিনের সঙ্গে কথা বলতে হবে এখন, ভাবছে কিশোর। আবার তাকে সম্মোহিত করে ফেলেছেন মিস্টার জনসন। প্রভাব বিস্তার করে আছেন। কিশোর উল্টোপাল্টা কিছু বললেই গিয়ে মিস্টার জনসনকে বলে দেবে রবিন।

'আমাদের বন্ধু পোকা-মাকড়দের ব্যাপারে অনেক তথ্য আজ জানা হলো, তাই না কিশোর?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'হ্যাঁ,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিয়ে পেছনের একটা ঝোপ দেখাল কিশোর। 'ওখানে গেলেই দেখা যাবে মাকড়সার জাল। দারুণ সুন্দর, তাই না?'

নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনাল তার নিজের কথাগুলো। সুন্দর না ছাই! আগের রাতে আরেকটু হলেই মরতে বসেছিল মাকড়সার ভয়ঙ্কর জালে জড়িয়ে। কিন্তু সে-কথা এখন আর বলা যাবে না রবিনের সামনে। মনেও করিয়ে দেয়া যাবে না।

'হ্যাঁ, সুন্দর!' জবাব দিল রবিন। অবিকল জোম্বির মত আচরণ করছে। মুসার মত।

রবিনের সামনে কিশোরকেও জোম্বির আচরণ করতে হলো। বলল, 'কোনদিন আমরা কোন মাকড়সাকে আর আঘাত করব না।'

'ঠিক,' কিশোরের সুরে সুর মিলিয়ে জবাব দিল রবিন, 'কোনদিন না!'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল সে।

কিশোরও তার দিকে তাকিয়ে হাসল।

বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল রবিন।

উল্টো দিকে ঘুরে কিশোর রওনা হলো ওদের বাড়িতে।

তেরো

রাতের খাওয়ার পর অ্যান্টিক ঘড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল আবার কিশোর। রবিনদের বাড়িতে যাবে। ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটা মোড় পেরিয়ে এসে আরেকটু হলেই মুখোমুখি ধাক্কা খেতে যাচ্ছিল পরস্পরের সঙ্গে। কিশোর চলেছে রবিনদের বাড়িতে, আর রবিন চলেছে কিশোরদের বাড়িতে।

‘তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি,’ কিশোর বলল।

‘আমিও তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি,’ রবিন বলল।

‘আমাকে দেখানোর আগে তুমি এটা দেখে নাও,’ পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে রবিনের চোখের সামনে দোলাতে শুরু করল কিশোর। সুর করে বলল, ‘ভারি…ভারি হয়ে আসছে তোমার চোখ!’

‘না, আসছে না,’ হাসতে শুরু করল রবিন। পকেট থেকে একটা রিস্টওয়াচ টেনে বের করল। গলায় পরার চেনে বেঁধে নিয়েছে। চেন ধরে কিশোরের চোখের সামনে দোলাতে দোলাতে বলল, ‘তোমার মত অ্যান্টিক তো পেলাম না, তাই আমার হাতঘড়িটাকেই চেনে বেঁধে নিয়েছি। এটাই তোমাকে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিলাম আমি।’

‘তুমি আমাকে সম্মোহন থেকে মুক্ত করতে যাচ্ছিলে?’ ভুরু কুঁচকাল কিশোর।

হাসল রবিন। ‘এ ছাড়া আর উপায় কি বলো? তোমাকে তো জোম্বি বানিয়ে দিয়েছেন মিস্টার জনসন।’

‘আর আমি ভেবেছিলাম, ইচ্ছাশক্তির জোরে আমি ঠিকই আছি, কিন্তু তোমাকে আবার জোম্বি বানিয়ে দিয়েছেন তিনি।’

দু’জনেই হাসতে শুরু করল। মস্ত ধোঁকা দিয়েছে মিস্টার জনসনকে। দু’জনেই বুঝে গিয়েছিল ওদেরকে সম্মোহিত করতে চাইছেন তিনি। প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল মগজে। তাই কিছুই করতে পারেননি তিনি। তাঁর সামনে সম্মোহিত হওয়ার ভান করেছে দু’জনেই।

রবিনদের বাড়ির কাছাকাছি রয়েছে ওরা। তাই নিজেদের বাড়িতে না গিয়ে ওদের বাড়িতেই চলে গেল কিশোর।

মুসাকে ফোন করল। যদি বাড়ি থাকে, গিয়ে তাকে সম্মোহনমুক্ত করার ব্যবস্থা করবে।

কিন্তু মুসাকে পাওয়া গেল না। তার বাবা মিস্টার আমান জানালেন, ক’দিন ধরে মুসার কি যেন হয়েছে। কথাবার্তা, আচরণ সব উল্টাপাল্টা। সারাক্ষণ কীটপতঙ্গ আর মাকড়সার কথা বলে। বাড়িতে মাকড়সার ঝুল পরিষ্কার করতে দেয় না। বাধ্য হয়ে ওর মা ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছেন।

কি করা যায়, পেছনের বারান্দায় বসে তখন যুক্তি করতে লাগল দুই গোয়েন্দা। মুসার আশা ছাড়তে হলো। ওকে সম্মোহিত করা হয়েছে ডাক্তার যদি এটা ধরতে না পারেন তাহলে ওকে স্বাভাবিক করতে পারবেন না। ওরাও ওকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে পারবে না। যা করার এখন দু’জনকেই করতে হবে। যদিও তিনজন থাকলে বাড়তি সুবিধা পেত অনেক।

রবিন যে ছবিটা তুলেছে, তাতে কেবল মিস্টার জনসনের বামন-মানবটার ছবি উঠেছে। মাকড়সার চিহ্নও নেই। এ ছবি দিয়ে কিছু প্রমাণ করা যাবে না। প্রমাণ সংগ্রহ করতে হলে একটাই উপায় আছে। আবার যেতে হবে মিস্টার জনসনের বাড়িতে।

অন্ধকার হয়ে আসছে। হঠাৎ একটা অদ্ভুত শব্দ কানে এল বাড়ির পেছনের বন থেকে। গর্জন আর গোঙানির মাঝামাঝি একটা শব্দ। এতই ভয়ঙ্কর লাগল

শব্দটা, রক্ত যেন বরফের মত শীতল হয়ে গেল কিশোরের।
আঁতকে উঠল রবিনও। 'কিসের শব্দ?'
'বুঝতে পারছি না!' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'চলো তো দেখে আসি।'
বারান্দা থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকাতে শুরু করল কিশোর।
'কি খুঁজছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।
'একটা অস্ত্র।'
'কি অস্ত্র?'
'মাকড়সার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায় এমন কিছু। বাড়ি মেরে নাকমুখ ভোঁতা করে দিতে পারলে কাজ হয়।'
উঠানের পাশে পুরানো একটা ক্রিকেট ব্যাট আর একটা ব্যাডমিন্টন র‍্যাকিট পড়ে থাকতে দেখে সেগুলোও তুলে নিল দু'জনে। কিশোর হাতে নিল ব্যাটটা। রবিন ব্যাডমিন্টন র‍্যাকিট।
'এগুলো দিয়ে কিছু হবে না,' রবিন বলল। 'গায়েই লাগবে না দানবগুলোর।'
'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। খালি হাতে তো আর যেতে হচ্ছে না।'
বাড়ি মারার ভঙ্গিতে ক্রিকেট ব্যাটটা সামনে বাড়িয়ে ধরে অন্ধকার উঠানের মধ্যে দিয়ে এগোল কিশোর। পেছনে রবিন।
আবার কানে এল সেই অদ্ভুত গোঙানি। শব্দটা আসছে লনের অন্ধকার কোণ থেকে।
একটা ঘন ঝোপের কিনারে এসে দাঁড়াল দু'জনে।
ব্যাটটা ডান হাতে তুলে ধরে রেখে বাঁ হাতে আস্তে করে ঝোপের ডাল-পাতা সরাল কিশোর।
দেখে স্থির হয়ে গেল।
'কি?' কানের কাছে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রবিন।
'মিস্টার সিম্পসনের কুকুরটা। জালে আটকা পড়েছে।'
যে রকম জালে কিশোর আটকা পড়েছিল, তেমনি এক দানবীয় মাকড়সার জালে আটকে আছে কুকুরটা। শূন্যে ঝুলে থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্যে পা ছুঁড়ছে। ওদের দেখে কুঁই-কুঁই শুরু করল। মুক্ত করে দেয়ার জন্যে মিনতি জানাতে লাগল।
'ছুরিটা আছে নাকি তোমার পকেটে?' রবিনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
'না, ঘরে রেখে এসেছি।'
'দৌড় দাও। নিয়ে এসোগে।'
দৌড়ে চলে গেল রবিন।
কুকুরটাকে শান্ত করার চেষ্টা চালাল কিশোর।
আতঙ্কে সিঁটিয়ে গেছে বেচারা কুকুরটা। জালের বেশি কাছে যাওয়ার সাহস করল না কিশোর। নিজেরও জড়িয়ে পড়ার ভয় আছে।
হঠাৎ করেই অদ্ভুত শব্দটা শুনল পেছনে। বিস্কুটের টিনে পাথর কিংবা মার্বেল ভরে ঝাঁকালে যে রকম শব্দ হয়, অনেকটা সে-রকম।
অন্ধকার ছায়ার মধ্যে দেখার চেষ্টা করল। এগিয়ে আসছে বিচিত্র সেই

শব্দকারী। জ্বলজ্বলে দুটো আলোর বল দেখতে পেল। ভালমত দেখার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকল। জিনিসটা কি বুঝতে পেরেই জমে গেল হাত-পা।

মিস্টার জনসনের ল্যাবরেটরিতে দেখা সেই দানব মাকড়সাগুলোর একটা। মাত্র কয়েক ফুট দূরে বসে খুদে খুদে জ্বলন্ত চোখ মেলে তাকিয়ে আছে কুকুরটার দিকে।

প্রাণভয়ে বিকট এক চিৎকার করে উঠল কুকুরটা। তারমানে সে-ও দেখেছে মাকড়সাটাকে।

ব্যাট ঘুরিয়ে মাকড়সাটাকে বাড়ি মারল কিশোর।

মুহূর্তে পেছনে সরে গিয়ে বাড়িটা এড়াল মাকড়সাটা। আবার আগে বাড়ল।

আবার বাড়ি!

আবার পেছানো!

লাগাতে পারছে না কিশোর। বুঝতে পারছে, লাগলেও ব্যাটের বাড়িতে তেমন ক্ষতি হবে না এই দানব-মাকড়সার।

কিশোরের পাশ কাটিয়ে ঘুরে এগোনোর চেষ্টা করল ওটা। জালের কাছে যেতে চায়। কুকুরের মত একটা রসাল খাবারের গায়ে দাঁত ফুটানোর জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে।

রাগ লাগল কিশোরের। দাঁত সে ফুটাতে দেবে না মাকড়সাটাকে।

মাকড়সার খাবার মাছি হতে পারে, অন্য যে কোন কীট-পতঙ্গ কিংবা ছোট জাতের পাখিও হতে পারে—প্রকৃতি যে সব খাবার নির্ধারিত করে রেখেছে মাকড়সার জন্যে। কিন্তু মাকড়সায় কুকুর খাবে, এটা ভাবতেও ভাল লাগল না।

বাড়ি মারতে মারতে একটা বাড়ি অবশেষে লাগাতে পারল মাকড়সাটার এক পায়ে। কিশোরকে লক্ষ্য করে পা চালাল ওটা। পায়ের চোখা মাথাটা ধেয়ে এল বল্লমের মত। ঝট করে মাথা নিচু করে ফেলল কিশোর। নিজের অজান্তেই হাত উঠে গেল ওপর দিকে, মাথা বাঁচানোর জন্যে। রোমশ একটা পা বাহু ছুঁয়ে গেল কিশোরের। কোন কিছুর স্পর্শ এত ভয়ঙ্কর লাগেনি কখনও।

চোদ্দ

'কিশোর?' রবিনের ডাক শোনা গেল। 'কি হয়েছে?'

চলে এসেছে সে। তার এক হাতে ছুরি আর আরেক হাতে একটা বড় সাইজের টর্চ।

'এখান পর্যন্ত চলে এসেছে ওটা!' জবাব দিল কিশোর।

'কি…?' কথা শেষ হলো না রবিনের। মাকড়সাটার গায়ে টর্চের আলো পড়তেই থেমে গেল সে। দেখে ফেলেছে ওটাকে।

এতক্ষণ অস্পষ্ট ভাবে দেখছিল কিশোর। এখন সে-ও স্পষ্ট দেখল।

মাকড়সার চোখ দুটো জ্বলন্ত কয়লার মত জ্বলছে। মস্ত এক সাঁড়াশির মত দুই পাশে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে ভয়াল দাঁতকাটা চোয়াল। কালো লোমে ঢাকা গা। শিকারের কাছে যেতে বাধা পেয়ে ভীষণ খেপে গেছে মাকড়সাটা!

ব্যাট নিয়ে ওটার মুখোমুখি হলো কিশোর। আটকে রাখল। লাগুক না লাগুক এগোনোর চেষ্টা করলেই ব্যাট চালায়। এ সুযোগে জালটা কেটে দিতে থাকল রবিন।

দুই দুই বার এত কাছে চলে এল মাকড়সাটা, ধাম ধাম করে পিঠে বাড়ি মারল কিশোর। তাতে কিছুই হলো না ওটার।

এ ভাবে কতক্ষণ ঠেকাবে? ব্যাটের বাড়িতে ব্যথা না পেলে খুব শীঘ্রি সাহস বেড়ে যাবে ওটার।

আরেক বুদ্ধি করল তখন কিশোর। ব্যাটটাকে দু'হাতে সোজা করে ধরে গায়ের জোরে খোঁচা মারল মাকড়সাটার মাথা লক্ষ্য করে। কপ করে ব্যাটের মাথাটা কামড়ে ধরল ওটা। ধারাল দাঁতগুলো কেটে বসে গেল ব্যাটের গায়ে। টেনে আর ছুটাতে পারল না।

'রবিন! হলো তোমার?' চিৎকার করে উঠল সে।

'এই হয়ে গেছে। আর মাত্র সামান্য কয়েকটা সুতো।'

'তাড়াতাড়ি। আর পারছি না।'

হ্যাঁচকা টান দিয়ে কিশোরের হাত থেকে ব্যাট কেড়ে নিয়ে গেল মাকড়সাটা। আর কোন উপায় না দেখে ঠিক ওটার চোখ বরাবর আলো ফেলল কিশোর। তীব্র আলো দেখলে সব জানোয়ারই সাধারণত যা করে—থমকে যায়, মাকড়সাটাও তাই করল। আলো ভাল লাগছে না ওটার। তবে এই আলোও যে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না বেশিক্ষণ, বুঝতে পারছে কিশোর।

সামনের একটা পা তুলে থাবা মারল ওটা। কিশোরের বুকে এসে লাগল আঘাতটা। চিত হয়ে পড়ে গেল সে। তার গায়ের ওপর এসে উঠল মাকড়সাটা। ভয়ঙ্কর চোয়াল দুটোকে মুখের ছয় ইঞ্চি তফাতে দেখতে পেল কিশোর। আরও নামিয়ে আনতে লাগল মাকড়সাটা।

ঠিক ওই মুহূর্তে জাল কাটা শেষ হলো রবিনের। মুক্ত হয়ে গেল কুকুরটা। দৌড়ে এল ওদের দিকে। মাকড়সাটার কাছে এসে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করল। পিছিয়ে গেল মাকড়সাটা। খেপা কুকুরের চিৎকার এমনই ভয়ানক, দানব-মাকড়সাকেও ভড়কে দিল।

একটা মুহূর্ত আর দেরি না করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। দৌড় দেয়ার আগে ডেকে সরিয়ে আনল কুকুরটাকে। ওখানে থাকলে আবার জালে আটকা পড়তে পারে।

বাড়ির দিকে দৌড়াতে লাগল দু'জনে। পেছন পেছন এল কুকুরটা।

হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল কিশোর আর রবিন। কুকুরটাও ঢুকল ওদের সঙ্গে।

দরজা লাগিয়ে একেবারে ছিটকানি তুলে দিল রবিন।

লিভিংরুমে বসে কাগজ পড়ছেন রবিনের বাবা মিস্টার মিলফোর্ড। অবাক

হয়ে ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

'বাবা,' রবিন বলল, 'প্রাণীদেহকে বিশাল করে তোলার উপায় আবিষ্কার করে ফেলেছেন আমাদের সাইন্স টীচার মিস্টার জনসন। মাকড়সাকে দানব বানিয়েছেন, মস্ত জাল বানিয়ে ফাঁদ পেতে বসে থাকে ওগুলো শিকার ধরার অপেক্ষায়...'

'অতিরিক্ত হরর কাহিনী পড়া শুরু করলে নাকি?' বিশ্বাস করলেন না তিনি।

'বানিয়ে বলছি না, বাবা। বিশ্বাস করো।'

'ঘুমানোর আগে আর ভয়ের গল্প পড়বে না। মগজে থেকে যায়। ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখায়। জেগে উঠলেও সে-সব দৃশ্য আটকে থাকে মগজের কোষে কোষে।'

'দুঃস্বপ্ন না, বাবা,' মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠল রবিন। 'বাস্তবেই দেখে এসেছি মাকড়সাগুলোকে।'

'কুকুরটাকে জোগাড় করলে কোত্থেকে?' রবিনের কথা শুনতেই চাইলেন না মিস্টার মিলফোর্ড।

বুঝতে পারল কিশোর, কেউ ওদের কথা বিশ্বাস করবে না, কাউকে বোঝানো যাবে না, যতক্ষণ না নিজের চোখে দেখবে। প্রমাণ আনতেই হবে। তারমানে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে হলেও আরও একবার মিস্টার জনসনের বাড়িতে যেতে হবে ওদের।

*

এবার মিস্টার জনসনের বাড়িতে যাওয়ার সময় পেনলাইট না নিয়ে নিল রবিনের বড় টর্চটা। ক্যামেরা তো নিলই। কাঠের ব্যাটট্যাট দিয়ে হবে না, তাই স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে একটা লোহার ডাণ্ডা নিয়ে নিল কিশোর। ইয়ার্ডে ওসব জিনিসের অভাব নেই।

'এ ভাবে ঝুঁকি নেয়াটা কি ঠিক হচ্ছে?' কাঁচা রাস্তাটা ধরে আরও একবার হাঁটতে হাঁটতে বলল রবিন।

'না নিয়ে কি করব?' বলল কিশোর। 'মাকড়সার জালে আজ আমি পড়েছি, কাল তুমি পড়বে। তোমাদের বাড়ির কাছে চলে আসার সাহস দেখিয়েছে প্রাণীটা। কুকুর-বিড়াল খেতে খেতে এক সময় মানুষের দিকে নজর দেবে। একের পর এক মানুষ ধরে খাচ্ছে, কল্পনা করতে পারো? খাবে আর বাচ্চা জন্ম দেবে। মানুষখেকো মাকড়সার সংখ্যা বাড়তে থাকবে অবিশ্বাস্য গতিতে। প্রতিবারে একটা মাকড়সা কি পরিমাণ ডিম পাড়ে জানো না?'

'কম করে হলেও পাঁচশো।'

'ধরা যাক একবারে একটা দানব-মাকড়সা পাঁচশো করে ডিম পাড়ল, সেগুলো ফুটে বাচ্চা বেরোল, বাচ্চাগুলো বড় হলো। কল্পনা করতে পারো কি ঘটবে? মাকড়সায় মাকড়সায় ছয়লাপ হয়ে যাবে। শহরের কোন মানুষ, কোন প্রাণীকে বাঁচতে দেবে না ওরা। এবং এ সবের জন্যে দায়ী হবেন একটিমাত্র লোক–মিস্টার জনসন। সুতরাং তাঁকে ঠেকাতেই হবে। নইলে শহরের পর শহর ধ্বংস করে দিতে থাকবে তাঁর মাকড়সা-বাহিনী, বিরান করে দেবে জনপদ,

হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে গোটা পৃথিবী।'

বিদ্যুৎ চমকাল। কড়াৎ করে বাজ পড়ল। এত কাছে, মনে হলো মাথায় পড়ল। ভীষণ চমকে গেল ওরা। বিপদের ষোলোকলা পূর্ণ হলো যখন বৃষ্টি শুরু হলো। কল্পনাই করেনি বৃষ্টি আসবে। বর্ষাতি আনার কথা মাথায় আসেনি তাই।

মিস্টার জনসনের বাড়িতে পৌঁছে সোজা সামনের বারান্দার দিকে রওনা হলো ওরা।

'কোথায় যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'এভাবে চুরি করে দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে গেছি। সোজা গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে, ভেতরে ঢুকে, মিস্টার জনসনকে এ সব বন্ধ করতে বলার সময় এসে গেছে।'

'পাগল নাকি!'

জবাব না দিয়ে সোজা সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল কিশোর। দরজায় ঠেলা দিল।

'যদি কিছু করে?' ভয় যাচ্ছে না রবিনের।

'আরে দূর, পাগল নাকি জিজ্ঞেস করি। এমনি বললাম।'

প্রথম ঠেলাটায় খুলল না দরজা। আরেকটু জোরে ঠেলা দিতেই কজার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে খুলে গেল। ভেজানো ছিল পাল্লাটা।

ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। কেউ নেই। কিছু নেই। না আসবাবপত্র, না পর্দা; কিচ্ছু না।

'এসো,' রবিনের দিকে ফিরে তাকিয়ে ডাক দিল কিশোর।

ভেতরে ঢুকতেই প্রথম যে অনুভূতিটা হলো, সেটা হলো মুখে আঠা আঠা কিছু লেগে যাওয়ার অনুভূতি। বুঝতে পারল, মাকড়সার জাল। ঘরে আর কিছু না থাক, এই একটা জিনিস প্রচুর পরিমাণেই আছে। শত শত, হাজার হাজার মাকড়সা জাল বুনে রেখেছে। মাকড়সাগুলো সব ছোট আকারের, অর্থাৎ স্বাভাবিক মাকড়সা।

'ঘরে মাকড়সা পোষেন মিস্টার জনসন,' ফিসফিস করে বলল রবিনকে। 'তিনি বাস করেন নিচে, মাটির তলার ঘরে, তাঁর ল্যাবরেটরির কাছে। ওপরের এই ঘরটায় এখানে বংশবৃদ্ধি করে চলেছে সাধারণ মাকড়সাগুলো। এগুলো তাঁর গিনিপিগ। প্রয়োজন পড়লেই এখান থেকে নিয়ে যান।'

জালের ভেতর দিয়ে এগোতে ভাল লাগল না ওদের। কিন্তু আর কোন উপায়ও নেই। নিচে নামার সিঁড়ির দরজাটা খুঁজতে লাগল।

অসংখ্য ছোট ছোট ঘর। অলি-গলি-বারান্দায় ভরা। কোনটাতে যে নিচে নামার সিঁড়ি রয়েছে, কে জানে।

হঠাৎ কানের কাছে গুঞ্জন করে উঠল কিসে যেন। ঝট করে মাথা নিচু করে ফেলল কিশোর। ওর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল ওটা। আওয়াজে মনে হলো ছোটখাট একটা অ্যারোপ্লেন উড়ে গেল।

'ওই যে, আবার আসছে!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'আলোটা ধরে রাখো সোজা করে,' বলল কিশোর।

এবারে আর শুধু মাথা নামিয়ে কাজ হলো না, একেবারে শুয়ে পড়তে হলো

মেঝেতে। নইলে গুঁতো লাগত মাথায়। আলোটা জ্বেলেই রেখেছে রবিন। কিন্তু দেখতে পারল না ঠিকমত।

আবার ফিরে এল ওটা।

এবার দেখল।

একটা মাছি।

কিন্তু সাধারণ মাছি নয়। বাস্কেটবলের সমান বড়। ডাইভ দিয়ে এসে ডানার বাড়িতে রবিনের হাত থেকে টর্চটা ফেলে দিল। ডানার বাতাস লাগল কিশোরের গায়ে। একেকটা ডানা তিন ফুট লম্বা।

'দেখলে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'হ্যাঁ,' গলা কাঁপছে কিশোরের।

নিচু হয়ে টর্চটা তুলে নিল রবিন। আলোটা নেভেনি। মাছিটার ওপর ধরল। ওদের ঘিরে চক্কর মারছে ওটা। খানিকটা সরে গিয়ে হঠাৎ আলো লক্ষ্য করে ছুটে এল। লাফিয়ে সরে গিয়ে ডাণ্ডা ঘুরিয়ে বাড়ি মারল কিশোর।

মাথায় লাগল বাড়ি। মাটিতে পড়ে বার দুই নাচানাচি করে চুপ হলো মাছিটা।

'মরে গেছে?' রবিনের প্রশ্ন।

জবাব দিল না কিশোর। বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে আছে।

রবিনের প্রশ্নের জবাব মাছিটাই দিল। উঠে দাঁড়াল ওটা। মাথা ঝাড়া দিল। মস্ত চোখ দু'টোতে অসংখ্য লেন্স চকচক করছে। সামনের পা দিয়ে মাথা ঘষল কয়েকবার। তারপর উড়ে গেল। ওদের প্রতি আর আগ্রহ দেখাল না।

'নিশ্চয় দানব-মাকড়সাগুলোকে খাওয়ানোর জন্যেই দানব-মাছির প্রজনন করছেন মিস্টার জনসন,' রবিন বলল। 'কিন্তু জান কি শক্ত! এত জোরে বাড়ি খেয়েও মরল না!'

ভয়ে ভয়ে বলল কিশোর, 'মাছিরই এই অবস্থা। দানব-বোলতা আর দানব-ভীমরুল না বানিয়ে থাকলেই বাঁচি।'

'তা বোধহয় বানাবেন না। বোলতা আর ভীমরুলেরা মাকড়সার দুশমন।'

'না বানালেই ভাল। চার ফুট লম্বা ভীমরুলের হুলের খোঁচা খেতে চাই না আমি।'

বাইরে ঘন ঘন বাজ পড়ার শব্দ হচ্ছে। জানালার কাঁচে আঘাত হানতে শুরু করল বৃষ্টির ফোঁটা।

শূন্য ঘর। গা ছমছমে পরিবেশ। বিদ্যুতের আলো থেকে থেকেই আলোকিত করে দিচ্ছে ঘরটাকে। আলো নিভে গেলেই গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে।

অবশেষে খুঁজে পেল সিঁড়ির দরজাটা। সামান্য ফাঁক করে নিচে তাকাল কিশোর। আলো জ্বলছে। কে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে। গলা শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই মিস্টার জনসন। তাঁর সহকারীর সঙ্গে কথা বলছেন।

তাকিয়ে থাকতে থাকতেই এমন একটা জিনিস চোখে পড়ল কিশোরের, দম আটকে এল। একটা টারানটুলা মাকড়সা। চারফুট লম্বা দেহ, কালো কালো মোটা রোমশ পা, বড় বড় দাঁত। সিঁড়ির গোড়ায় বসে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

পনেরো

'ক্যামেরা রেডি করো,' রবিনকে বলল কিশোর।

কানে এল মিস্টার জনসনের কণ্ঠ, 'কি ব্যাপার, কিরিকিরি? কিছু দেখেছিস?'

কিরিকিরি! অদ্ভুত নাম তো! নিশ্চয় মাকড়সাটার। পাহারাদার কুকুরের মত পাহারা দেয়ার জন্যে সিঁড়ির গোড়ায় বসিয়ে রেখেছেন মিস্টার জনসন।

মুহূর্তে খচমচ করে সিঁড়ি বেয়ে অর্ধেক ওপরে উঠে চলে এল মাকড়সাটা। মিস্টার জনসন ক্লাসে কি বলেছিলেন মনে পড়ল। টারানটুলারা জাল বানায় না। মাটিতে খোঁড়া গর্তে লুকিয়ে থাকে। শিকার দেখলেই ছুটে গিয়ে তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাকড়সা-জগতের সবচেয়ে দ্রুতগামী মাকড়সাদের একটা। ভয়ানক শিকারী।

'ছবি তোলো। কুইক!' রবিনকে তাগাদা দিল কিশোর। দরজাটা পুরো ফাঁক করে দিল। যাতে সিঁড়িতে বসা দানবটাকে ভালমত দেখতে পায় সে।

ঝিলিক দিয়ে উঠল ক্যামেরার ফ্ল্যাশার।

'কে? কে?' চিৎকার করে উঠলেন মিস্টার জনসন।

আবার ঝিলিক দিয়ে উঠল তীব্র আলো। এটা আর ফ্ল্যাশারের আলো নয়, বিদ্যুতের চমক। পরক্ষণে বাড়ি কাঁপিয়ে দিল বজ্রপাতের শব্দ। দপ করে নিভে গেল নিচতলার বাতি। ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে নিশ্চয়। ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেল বাড়িটা।

বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে দরজার দিকে দৌড় দিল দু'জনে।

কিন্তু কোথায় ওটা? পাচ্ছে না। কিশোরের মনে হলো এক গোলকধাঁধার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। হাতে, মুখে ক্রমাগত জড়াচ্ছে মাকড়সার জাল। ভুল করে সামনের দরজার কাছে না গিয়ে অন্য দরজা দিয়ে আরেকটা ঘরে ঢুকে পড়ল। এটা থেকে বেরোনোর কোন পথ নেই। মাকড়সাটার এগিয়ে আসার শব্দ কানে আসছে। হাঁটার সময় কাঠের মেঝেতে ওটার পা পড়ে ঢোলের গায়ে কাঠি পড়ার মত শব্দ হচ্ছে।

'ওই যে, দরজা!' বিদ্যুতের আলোয় দেখে ফেলল রবিন।

দৌড় দিল ওটার দিকে। সিঁড়ি চলে গেছে ওপাশ থেকে। দৌড়ে উঠে এল ওপরে। আরও ভালমত আটকা পড়ল এখন।

ওপরতলাতেও অসংখ্য ছোট ছোট ঘর আর হলওয়ে, নিচতলার মতই। এখানে মাকড়সার জাল আরও ঘন। করিডরের দিকে দৌড় দিল। সারা গায়ে আটকে যেতে থাকল আঠাল জাল।

একটা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা।

টর্চ জ্বালল রবিন। দরজার গায়ে লেখা : **প্রবেশ নিষেধ**।

তারমানে সাংঘাতিক কিছু রয়েছে অন্যপাশে। লুকানোর জন্যে মোটেও উপযুক্ত জায়গা নয়।

আর কোন উপায় না দেখে ওটাতেই ঢুকে পড়ল ওরা। দরজাটা লাগিয়ে দিল। বাকি ঘরগুলোর মতই এটাও খালি।

অবাক লাগল কিশোরের। 'বাইরে ওই সাইমবোর্ড লাগানো কেন?' নিজেকেই প্রশ্ন করল সে।

'চুপ!' সাবধান করল রবিন।

হলওয়ে ধরে মাকড়সাটার আটপায়ে হেঁটে এগিয়ে আসার শব্দ কানে আসছে স্পষ্ট। তবে মনে হয় এ ঘরে ঢুকতে পারবে না ওটা। আপাতত ওরা নিরাপদ।

আবার বিদ্যুৎ চমকাল।

তীব্র আলোয় ক্ষণিকের জন্যে পরিষ্কার দেখতে পেল ঘরটা।

'এতক্ষণে বুঝলাম, বাইরের ওই সাইনবোর্ড লাগানোর কারণ!' বিড়বিড় করে বলল কিশোর। আতঙ্কে দম আটকে আসতে চাইছে তার।

'কি কারণ?' রবিন এখনও দেখেনি ওটাকে।

'বাঁয়ে কোনার দিকটায় আলো ফেলো, তাহলেই বুঝতে পারবে।'

আলো ফেলল রবিন।

ঘরের কোণে ঘাপটি মেরে বসে আছে একটা কাঁকড়াবিছে। ছয় ফুট লম্বা। লেজের মাথার হুলটা তরোয়ালের মত দোলাচ্ছে এপাশ্ব-ওপাশ।

ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল ওদের দিকে।

'কিন্তু কাঁকড়াবিছে কেন?' কিশোরের প্রশ্ন।

'মনে নেই?' রবিন বলল, 'বইয়ের এগারো নম্বর চ্যাপ্টারে আছে—মাকড়সা আর কাঁকড়াবিছেরা কাছাকাছি গোত্রের। খালাত ভাইটাই আরকি।'

'হুঁ। মনে পড়েছে।'

'ওই যে, চলে এসেছে!'

টর্চের আলোয় দেখা গেল, গতি বাড়িয়ে দিয়েছে ওটা। দ্রুত ছুটে আসছে ওদের লক্ষ্য করে। লেজসহ দেহের পেছনের অংশটা বাঁকিয়ে নিয়ে এসেছে মাথার ওপর।

লাফ দিয়ে সরে গেল দু'জনে দু'দিকে। কিশোরের হাতে লোহার ডাণ্ডা আছে, কিন্তু ওটা দিয়ে বাড়ি মেরেও কিছুই করতে পারবে না এতবড় দানবের।

শাঁই করে হুল চালাল বিছেটা। কিশোরের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল ফুটখানেক লম্বা ইস্পাতের মোটা সুচের মত হুলটা।

দৌড়ে ঘরের অন্যপ্রান্তে চলে গেল কিশোর আর রবিন। একটা দরজা আছে ওদিকটায়। দেয়াল-আলমারির দরজা বোধহয়। ঢুকে পড়তে পারলে খানিকটা নিরাপত্তা তো দিতে পারবে।

ঢুকে পড়ল ওটার মধ্যে। দরজাটা ধরে টানতে লাগল কিশোর। যত জোরেই টানে, বন্ধ আর হয় না।

'ওই আবার আসছে!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

গায়ের জোরে দরজাটা ধরে হ্যাঁচকা টান মারল কিশোর। খুলে চলে এল আস্ত পাল্লাটাই। কাঠ এতটাই পচে গেছে, কব্জা থেকেই ছুটে গেছে। ঠিকই ওই মুহূর্তে কাছে পৌঁছে গেল বিছেটা। দরজাটা পড়ল ওটার ওপর।

ভারী দরজার নিচ থেকে বেরিয়ে গেল বিছে। কিন্তু অতিরিক্ত ছটফট করতে লাগল। আর এগোনোর চেষ্টা করছে না। আলো ফেলে ভালমত দেখার পর বোঝা গেল ঘটনাটা কি ঘটেছে। দরজার চাপে ওটার নিজের হুল নিজের গায়েই ফুটেছে। কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে আস্তে করে আট পায়ের ওপর বসে পড়ল ওটা। আর নড়ল না। মরে গেছে।

বিশাল, ভয়ঙ্কর, কুৎসিত প্রাণীটার একটা ছবি তুলল রবিন।

ব্যস, হয়ে গেছে। যথেষ্ট প্রমাণ হাতে চলে এসেছে ওদের। এখন এখান থেকে বেরোতে পারলেই হয়।

কিন্তু পারবে তো?—ভরসা পাচ্ছে না কিশোর।

'ওপরতলায় শব্দ শুনলাম,' বলল একটা কণ্ঠ। নিশ্চয় মিস্টার জনসনের সহকারী।

জবাবে মিস্টার জনসন বললেন, 'ভালমত খুঁজে দেখো সবগুলো ঘর।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল পায়ের শব্দ।

প্রতিটি ঘরের দরজা খুলে খুলে দেখতে লাগলেন মিস্টার জনসন ও তাঁর সহকারী।

একটা বুদ্ধি এল কিশোরের মাথায়। যে ঘরটায় ঢুকেছে, তার দরজার সামনে আড়াআড়ি ভাবে ফেলে রাখল লোহার ডাণ্ডাটা। দরজার পাশের দেয়ালের গায়ে গা মিশিয়ে সেঁটে রইল কিশোর আর রবিন।

দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল মিস্টার জনসনের সহকারী ছোটখাট মানুষটা। হাতে একটা মশাল। টর্চ নেই ওদের কাছে এ কথা বলা যাবে না, নিশ্চয় নিরাপত্তার জন্যে আগুন নিয়ে চলাফেরা করে। দানবীয় কাঁকড়াবিছের মত প্রাণীর বিরুদ্ধে আগুন একটা বেশ নির্ভরযোগ্য অস্ত্র।

ঢুকেই দেখে ফেলল ওদের। ধীরে ধীরে হাসি ছড়িয়ে পড়ল কুৎসিত মুখটাতে। বেশির ভাগ দাঁতই নেই লোকটার। যা-ও বা আছে, কালো কালো দাগওয়ালা, পচা দাঁত।

ওদের দেখে আনন্দে শুয়োরের মত ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল সে।

ওদের দিকেই নজর লোকটার, কোথায় কিসের মধ্যে পা দিয়ে বসছে সে-খেয়াল নেই। অতএব যা ঘটার তাই ঘটল। পাইপের মত ডাণ্ডাটায় পা দিয়ে বসল। জুতোর নিচে পড়ে গড়িয়ে গেল ওটা। সামলাতে না পেরে ধুড়ুম করে চিত হয়ে পড়ল সে-ও।

পালানোর জন্যে কয়েক সেকেন্ড সময়ের প্রয়োজন ছিল গোয়েন্দাদের। সেই সময়টুকু পেয়ে গেল। পড়ে থাকা লোকটাকে লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে চলে এল দরজার বাইরে। ডাণ্ডাটা তুলে নিতে ভুলল না। দৌড়ে নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে।

নিচতলায় নেমে আবার সেই অসংখ্য ঘর আর অলি-গলির গোলকধাঁধা কোনদিকে গেলে যে ঢোকার বড় ঘরটা পাবে, বুঝতে পারল না। খুঁজতে খুঁজতে

অবশেষে পেয়ে গেল ঘরটা। পরিচিত লাগল। এটা দিয়েই ঢুকেছে। সামনের দরজাটা খোলা রয়েছে এখনও। বাইরে ঝমঝম বৃষ্টির শব্দ।

দৌড় দিতে যাচ্ছিল রবিন। তার হাত খামচে ধরল কিশোর। 'দাঁড়াও!'

কেন তাকে থামানো হলো, বুঝতে সময় লাগল না রবিনের। খোলা দরজার কাছে বসে রয়েছে আরেকটা দানব। মাকড়সাই, তবে টারানটুলাটা নয়। অন্য প্রজাতির আরেকটা। সরু সরু লম্বা পা। কালো চকচকে শরীর। আর পিঠে সেই ছাপ মারা আওয়ারগ্লাসের চিহ্ন।

'দেখলে?' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

আলোটা স্থির করল রবিন। মাকড়সার পিঠের ডিজাইনটা স্পষ্ট হলো। টারানটুলার চেয়েও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর মারাত্মক বিষাক্ত ব্ল্যাক উইডো স্পাইডার।

'মিস্টার জনসন বলেছিলেন সাধারণ একটা ব্ল্যাক উইডোর কামড় ঘোড়াকে মেরে ফেলে,' বিড়বিড় করে বলল কিশোর। 'এটার কামড়ে কি মরবে? হাতি? নাকি তিমি?'

'সাধারণ একটা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে কিচ্ছু করতে পারব না এটার!' গলা কাঁপছে রবিনের।

নড়ে উঠল মাকড়সাটা। এগিয়ে আসতে শুরু করল ওদের দিকে।

ঘুরে উল্টো দিকে দৌড় মারল দুই গোয়েন্দা।

ষোলো

মাটির নিচের ঘরে নামার দরজাটা পাওয়া গেল। আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, নামলে নিচেই নামতে হবে। কিশোর ভাবল, যা থাকে কপালে-নিচে নেমেই দেখি, যদি ওখান থেকে বেরোনোর কোন পথ পাওয়া যায়। না পেলে শেষ।

ভাবার সুযোগ পেল না বেশিক্ষণ। কানে এল মিস্টার জনসনের কণ্ঠ। ফাঁদে আটকা পড়েছে ওরা ভালমত।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল দু'জনে। ল্যাবরেটরিতে নেমেছে। টেবিলটায় আলো ফেলল রবিন। নানা ধরনের শিশি-বোতলে নানা রঙের তরল আর পাউডার টেবিলের শেষ মাথায় কয়েকটা বোতলে কালচে লাল তরল দেখা গেল শিশিগুলোতে লেবেল লাগানো; **বিগ**।

'এটাই হলো আসল জিনিস,' বলে উঠল কিশোর। 'বিগ! তারমানে নিশ্চয় প্রাণীদেহকে বড় করার ফরমুলা রয়েছে এটাতে।'

'দিই খতম করে, কি বলো?' রবিন বলল।

'হ্যাঁ, চলো।'

বোতলগুলো তুলে নিয়ে গিয়ে মুখ খুলে ভেতরের তরল পদার্থ সিঙ্কে ঢেলে

ফেলতে লাগল দু'জনে। ভীষণ দুর্গন্ধ। অ্যামোনিয়ার সঙ্গে কেরোসিন মিশালে যে রকম গন্ধ বেরোয় অনেকটা তেমনি। তিনটে বড় বোতলের ওষুধ ফেলে শেষ করল প্রথমে। বাকি রইল একটা ছোট শিশি। মুখটা গেছে আটকে। খুলতে না পেরে পকেটে ভরে ফেলল ওটা কিশোর। বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলবে।

'বেরোনো দরকার এখন,' রবিনকে বলল সে।

'ওই জানালাটা দিয়ে চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়?' রবিন বলল। 'যেটা দিয়ে উঁকি দিতাম আমরা...'

'চুপ! বসে পড়ো। মনে হয় আসছে ওরা।'

একটা আলমারির নিচের দিকটায় ঢুকে বসে পড়ল দু'জনে। অন্ধকারে ওদের দেখতে পাবেন না। জনসন, আশা করল।

সিঁড়ি বেয়ে ওপর থেকে প্রথমে নেমে এলেন মিস্টার জনসন। পেছনে তাঁর ভূতুড়ে চেহারার সহকারীটা।

'কই, গেল কোথায়?' মিস্টার জনসন বললেন। 'আরি, ওষুধগুলো কই? আমার ওষুধ! নিশ্চয় ফেলে দিয়েছে। হায় হায়, আমার এতদিনের সাধনা। দাঁড়াও, হাতে পেয়ে নিই একবার, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করব।'

অন্ধকারে গা মিশিয়ে আরও ঠাসাঠাসি করে বসল কিশোররা। ল্যাবরেটরিতে দুপদাপ করে পা ফেলে বেড়াতে লাগলেন জনসন, খুঁজছেন ওদের। বাড়ির অন্য আরেক অংশে খুঁজতে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়েছেন, ঠিক এই সময় বিদ্যুৎ চলে এল। নিশ্চয় লাইন মেরামত করে ফেলেছে। যেন কিশোরদের বিপদ বাড়ানোর জন্যেই একেবারে সময়মত কাজটা সেরে ফেলল বিদ্যুৎ কোম্পানির লোকেরা।

আর লুকিয়ে থাকা গেল না। মিস্টার জনসনের সহকারীটা দেখে ফেলল ওদের। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠে হাত তুলে মিস্টার জনসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে।

'ওই তো! ওই তো শয়তানগুলো!' চিৎকার করে উঠলেন মিস্টার জনসন। 'এখানে এসে লুকিয়েছ। আমার এত কষ্টের ফসল নষ্ট করে দিয়ে এখন এখানে এসে বসে আছ। সামান্য কয়েক বোতল ওষুধ ফেলে দিয়ে মনে করেছ আমার মাকড়সা বন্ধুদের ঠেকাতে পারবে? ফরমুলাটা এখনও আছে। আবার ওষুধ বানাব আমি। আর তোমাদের আমি ছাড়ব মনে করেছ? মাকড়সা দিয়েই খাওয়াব। তোমাদের দিয়েই হবে আজ ওদের দুপুরের ভোজ।'

আর বসে থাকার কোন মানে হয় না। হুড়মুড় করে আলমারি থেকে বেরিয়ে দৌড় মারল কিশোর। একদৌড়ে ঘরের একেবারে আরেক প্রান্তে। কাউন্টারে উঠে হাত উঁচু করে জানালাটা ধরার চেষ্টা করল। কাঠের ফ্রেমে আঙুল বাধতেই ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। পুরানো জিনিস বলেই ভেঙে গেল। টান লেগে খুলে চলে এল। তাজা ঠাণ্ডা বাতাস যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল গায়ের ওপর। আহ্, আনন্দ! যেন মুক্তির। যদিও মুক্তি তখনও অনেক দূর।

'এক কাজ করো,' রবিনকে বলল, 'আমার কাঁধে চেপে উঠে যাও।'

'আমি আগে যাব?'

'আহ্, তর্ক কোরো না! যাও!' প্রায় জোর করে ধরে ওকে তুলে দিল কাঁধের

ওপর।

জানালা ধরে ঝুলে পড়ল সে।

'দাঁড়াও! থামো!' চিৎকার করে উঠলেন মিস্টার জনসন।

ভার রাখতে পারল না পুরানো জানালা। ভেঙে নিচে পড়ে গেল রবিন।

বুঝল কিশোর, আর বেরোতে পারবে না। ধরা পড়ে গেছে। ওদের কাছে দৌড়ে চলে এসেছেন মিস্টার জনসন।

ঠিক এই সময় ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙার শব্দ হলো। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে গেছে জনসনের সহকারী। উপুড় হয়ে পড়েছে কাঁচের জার শিশি-বোতলের ওপর। হাতের মশালের বাড়ি লেগে ভেঙে পড়েছে রাসায়নিক পদার্থ ভর্তি অনেকগুলো বড় বড় জার। শব্দটা তারই।

ধাক্কাটা কে দিয়েছে, দেখে ক্ষণিকের জন্যে হতভম্ব হয়ে গেল সবাই। বিশেষ করে মিস্টার জনসন।

সহকারীর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। হই-হট্টগোলের সময় কখন যে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে সে, কেউ খেয়াল করেনি।

মুহূর্তে আগুন ধরে গেল রাসায়নিক পদার্থে।

'আরে করলে কি, গাধা কোথাকার!' রাগে চিৎকার করে উঠলেন জনসন। 'দিলে তো সব ধ্বংস করে। গেল আমার সমস্ত সাধনা।' কাগজপত্র পুড়তে দেখে তিন গোয়েন্দাকে ভুলে গিয়ে সেগুলো বাঁচাতে দৌড় দিলেন। 'হায় হায়রে, আমার ফরমুলাগুলোও গেল!'

প্রচণ্ড আক্রোশে মশাল নিয়ে এসে তিন গোয়েন্দার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল জনসনের সহকারী। কিন্তু তিনজনের সঙ্গে পারল না সে। দেখতে দেখতে ওকে কাবু করে ফেলল ওরা। হাতের মশালটা কেড়ে নিল মুসা।

'জলদি এসো!' চিৎকার করে বলে সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল কিশোর।

তার পেছনে ছুটল রবিন।

মশাল হাতে দাঁড়িয়ে পাহারা দিল একটা সেকেন্ড মুসা, মিস্টার জনসন বাধা দিতে এলেই দেবে মাথায় বাড়ি মেরে–শিক্ষক হোন আর যা-ই হোন, কোন কিছুর পরোয়া করবে না সে। জোম্বি বানিয়ে তাকে ভুগিয়েছে, সে-আক্রোশটা রয়ে গেছে তার।

কিন্তু বাধা দিতে এলেন না মিস্টার জনসন কিংবা তাঁর সহকারী। নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। দু'জনেই পালানোর জন্যে অস্থির হয়ে উঠল, কারণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আগুন।

নিরাপদেই বাইরে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

স্বাধীন এখন ওরা।

ওখানে থাকলে আবার কোন্ বিপদে পড়ে, এই ভয়ে একটা মুহূর্ত আর দাঁড়ানোর সাহস করল না। দৌড়ানো শুরু করল রাস্তার দিকে।

কিছুদূর এগিয়ে ফিরে তাকাল কিশোর। দেখল, বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসছে দুটো ছায়ামূর্তি। মিস্টার জনসন ও তাঁর ভূতুড়ে সহকারী। ধোঁয়া আর আগুন তাদেরকে ল্যাবরেটরিতে টিকতে দেয়নি।

কোন ঝুঁকি নিল না কিশোর। জনসনদের চোখে পড়তে চায় না আর। দুই সহকারীকে নিয়ে ঢুকে পড়ল ঝোপের মধ্যে। বাড়ির সামনের দিকটাতে এসে বনের মধ্যে লুকিয়ে রইল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়ির পাশ ঘুরে আসতে দেখল মিস্টার জনসন আর তাঁর সহকারীকে।

সঙ্গীকে সহ গিয়ে গাড়িতে উঠলেন তিনি। যত তাড়াতাড়ি পারলেন গাড়ি চালিয়ে পালিয়ে গেলেন। তাঁর 'মাকড়সা বন্ধুরা' সব ওই বাড়িতেই আটকা পড়ল। আগুনে পুড়ে মরতে লাগল। কেউ আর দেখার নেই ওদের। কেউ নেই বাঁচানোর।

চোখের পলকে পুরো বাড়িটায় আগুন ছড়িয়ে পড়ল। দাউ দাউ করে জ্বলছে। দূরে যখন দমকল বাহিনীর ঘণ্টা আর পুলিসের সাইরেন শোনা গেল, বাড়িটার একটা জানালাও আর আগুন-মুক্ত নেই।

আর এখানে থাকার কোন মানে হয় না। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে কিশোর বলল, 'চলো, বেরোই।'

পুলিশের চোখে পড়লে হাজারটা কৈফিয়ত দিতে হবে। আপাতত সেটা দেয়ার মত মানসিক কিংবা দৈহিক অবস্থা কোনটাই নেই গোয়েন্দাদের, বিশেষ করে কিশোর আর রবিনের। সাংঘাতিক ধকল গেছে। কয়েকবার করে মরতে মরতে বেঁচেছে। বাড়ি গিয়ে এখন বিছানায় গা এলিয়ে দেয়াটা ওদের একমাত্র লক্ষ্য।

ঝোপের আড়ালে আড়ালে এসে রাস্তায় উঠল ওরা। বড় রাস্তায় ওঠার পর অনেকক্ষণ চেপে রাখা প্রশ্নটা আর চাপতে না পেরে বলে উঠল রবিন, 'মুসা, তুমি এলে কি করে?'

মুসা যা বলল, তার সারাংশ–ডাক্তার বুঝে ফেলেছিলেন ওকে সম্মোহিত করা হয়েছে। বাড়ি ফিরেই আগে কিশোরের খোঁজ করেছে সে। তাকে বাড়িতে না পেয়ে রবিনের খোঁজ করেছে। তাকেও যখন পায়নি, বাড়ি থেকে বেরিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে সে। জেরি নামে একটা ছেলে জানায়, কিশোর আর রবিনকে বনের দিকে যেতে দেখে সে। রাতের বেলা কোথায় যাচ্ছে দু'জনে সন্দেহ হওয়ায় কিছুদূর পিছে পিছে যায় সে। দুই গোয়েন্দাকে বনের মধ্যে মিস্টার জনসনের বাড়ির দিকে যেতে দেখে। সে আর বনে ঢোকেনি। ফিরে এসেছে। মুসার আর কোন সন্দেহ থাকেনি, কিশোররা মিস্টার জনসনের বাড়িতেই গেছে। মিস্টার জনসনের বাড়িতে এসে গবেষণাগারের জানালা দিয়ে সব দেখে সে। কিশোরদের বিপদে পড়তে দেখে দেরি না করে ঢুকে পড়ে বাড়িতে। নেমে যায় মাটির নিচের ঘরে।

'শেষ মুহূর্তে হাজির হয়ে বাঁচালে আমাদের, মুসা,' মুসার কথা শেষ হলে বলল রবিন। 'ও সময় তুমি না এলে এতক্ষণে মাকড়সার খাবার হয়ে যেতাম আমরা। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

চুপ করে রইল মুসা। নীরবে হাসল।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'যা একখান অ্যাডভেঞ্চার করে এলাম, বিখ্যাত হয়ে যাব আমরা, কি বলো, কিশোর?'

বৃষ্টি তখন ধরে এসেছে। মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে চাঁদ।

'এমনিতেই কি আমরা কম বিখ্যাত?' হেসে জবাব দিল কিশোর।

'তবু…'

'ছবি তোলাটা একটা কাজের কাজ হয়েছে,' রবিনকে থামিয়ে দিয়ে বলল কিশোর। 'নইলে কেউ বিশ্বাস করত না আমাদের কথা।'

'কাল সকালে উঠে আমার প্রথম কাজই হবে ছবিগুলো ডেভেলপ করানো,' ক্যামেরাটায় চাপড় দিয়ে বলল রবিন। 'ফিল্মটা এখনই বের করে ফেলি না কেন!'

কিন্তু ফিল্ম খুলতে গিয়েই আর্তনাদের মত একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল রবিনের মুখ থেকে।

'কি হলো?' প্রায় একই সঙ্গে জানতে চাইল কিশোর আর মুসা।

'ক্যামেরায়…ফিল্মই নেই।…ভরতে ভুলে গিয়েছিলাম!'

একেবারে দমে গেল কিশোর। 'বলো কি! ধূর, গেল সব! কাউকে আর বিশ্বাস করানো গেল না। সবাই বলবে, বানিয়ে বলছি আমরা। বলবে, মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

হতাশ ভঙ্গিতে পকেটে হাত ঢোকাতে গিয়ে হাতে ঠেকল শক্ত একটা জিনিস। মিস্টার জনসনের গবেষণাগারে ওষুধ ভর্তি যে শিশিটার মুখ খুলতে পারেনি সেটা। উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, 'না, না, প্রমাণ আছে।' টেনে বের করল শিশিটা। দুই সহকারীর দিকে তুলে বলল, 'প্রাণীদেহকে বড় বানানোর ওষুধ।'

'ওটা নিয়ে এ ভাবে নাড়াচাড়া করাটা ঠিক হচ্ছে না,' ভয়ে ভয়ে বলল রবিন। 'যদি ভেঙে যায়? গায়ে লাগে? মানুষের ওপর কি রকম ক্রিয়া করবে জানি না। দেখা যাবে চোদ্দতলা বিল্ডিঙের সমান উঁচু হয়ে গেলে তুমি। দানব হয়ে গেলে! মানুষের সমাজে আর টিকতে পারবে না। ফেলো ফেলো!'

রবিনের কথাটা যুক্তিসঙ্গত মনে হলো কিশোরের কাছে। 'ঠিক বলেছ! মিস্টার জনসনের ভয়াল গবেষণা নিয়ে আর না ভাবলেও চলবে। তাঁর ল্যাবরেটরি, তাঁর ফরমুলা ধ্বংস করে দিয়েছি, এটাই আসল কথা। দৈত্যাকার মাকড়সা-বাহিনী নিয়ে আর পৃথিবী দখল করতে পারবেন না তিনি। কে আমাদের কথা বিশ্বাস করল না করল, আমাদের হিরো ভাবল কিনা, তাতে কি এসে যায়। তা ছাড়া শিশিটা প্রমাণের জন্যে নিয়ে গেলে আবার কার হাতে পড়বে কোন ঠিক নেই। এটা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে যদি আরেকজন মিস্টার জনসন তৈরি হয়ে যায়?'

এখন আর মুখ খোলার তাড়াহুড়া নেই। শার্টের কোনার কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে মোচড় দিতে লাগল কিশোর। ঘুরে গেল শিশির মুখ। খুব সাবধানে খুলল যাতে সামান্যতম ওষুধ গায়ে না লাগে। তীব্র ঝাঁজাল গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা দিল। একটা লেকের পাশ দিয়ে হাঁটছে তখন। শিশির পানি ঢেলে দিল পানিতে। শিশিটা ছুঁড়ে ফেলল একটা ডাস্টবিনে।

*

পরদিন শনিবার। সকালে উঠেই খবরের কাগজে পড়ল ওরা মিস্টার জনসনের বাড়ি পুড়ে যাওয়ার সংবাদ। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, গাড়ি নিয়ে চলে গেছেন তিনি। রহস্যময়ভাবে নিখোঁজ হয়ে গেছেন। পুরো ব্যাপারটাই রহস্যময়—কাগজের মন্তব্য।

সোমবার দিন ওদের আসল টীচার মিস্টার ক্রেগ—যাঁর জায়গায় মিস্টার জনসনকে নেয়া হয়েছিল, তিনি কাজে যোগদান করলেন। স্বাভাবিক বইপত্র হাতে ক্লাসে ঢুকলেন তিনি। মাকড়সা আর কীট-পতঙ্গের কবল থেকে রেহাই পেল কিশোররা। বায়োলজি বই খুলে মাছের চ্যাপ্টারটা পড়াতে শুরু করলেন তিনি।

ছুটির পরও স্কুলে রয়ে গেল কিশোররা তিনজন—কিশোর, রবিন আর মুসা। মিস্টার ক্রেগের রুমে গেল তাঁর সঙ্গে কথা বলতে।

'আচ্ছা, স্যার, এমন কোন ওষুধ বানানো সম্ভব, যার সাহায্যে মাকড়সা কিংবা কীট-পতঙ্গকে অনেক বড় করে ফেলা যায়?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'এবং মাকড়সাকে কুকুরের সমান বড় করা যায়?' কিশোরের প্রশ্নের সঙ্গে আরেকটা প্রশ্ন যোগ করল রবিন।

'উঁহু, সেটা সম্ভব না,' মিস্টার ক্রেগ জবাব দিলেন। 'ওরকম কোন ওষুধ এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি কেউ।'

'কিন্তু যদি কেউ এসে আপনাকে বলে,' কিশোর বলল, 'কুকুরের সমান মাকড়সা সে দেখে এসেছে। শুধু দেখেনি, অতবড় মাকড়সার কবলেও পড়েছে, তাহলে আপনি কি বলবেন?'

'ইমপস্যাবল!' ভুরু কুঁচকে তাকালেন মিস্টার ক্রেগ। 'খুব ভাল করেই জানো তোমরা, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মাকড়সাটাও কয়েক ইঞ্চির বেশি বড় হয় না। মিস্টার জনসন তো শুনলাম, কীট-পতঙ্গ আর মাকড়সা ছাড়া অন্য কিছুই পড়াননি তোমাদের। কত বড় হয়, সেটা পড়াননি?'

'হ্যাঁ, তা পড়িয়েছেন,' মৃদুস্বরে জবাব দিল কিশোর। 'মাকড়সার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ বানিয়ে ছেড়েছেন আমাদের।'

'তাহলে আর এ সব প্রশ্ন কেন?' ভুরু নাচালেন মিস্টার ক্রেগ।

'না স্যার, এমনি। যাই, স্যার। আপনার সময় নষ্ট করলাম, সরি!' বলেই দরজার দিকে হাঁটা দিল রবিন। যা বোঝার বুঝে গেছে। সুবিধে হবে না এখানে বিশ্বাস করাতে পারবে না মিস্টার ক্রেগকে।

মিস্টার ক্রেগের ঘর থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে। প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করাতে পারবে না কাউকে, আগেই জানত।

বাইরে এক জায়গায় জটলা করছে কয়েকটা ছেলে। তাদের মধ্যে শুঁটকি টেরিকে দেখল। তার দোস্তরাও রয়েছে।

একটা মাকড়সার ঠ্যাং ধরে উঁচু করে রেখেছে টেরি। খিকখিক করে হেসে বলল, 'কি বিচ্ছিরি! কুৎসিত! শয়তান মাকড়সা, তোকে আমি এখন ভর্তা করব।'

দৌড়ে গেল কিশোর আর রবিন। চিৎকার করে বলল, 'না না, মেরো না! ওরাও আমাদের মতই প্রাণী। পৃথিবীতে আমাদের যতখানি অধিকার, ওদেরও ততখানি। কেন শুধু শুধু মারছ প্রাণীটাকে?'

ফিরে তাকাল টেরি। তিন গোয়েন্দাকে দেখে হাসিটা বাড়ল তার। টিটকারি দিয়ে বলল, 'আরে আরে, পুঁচকে শার্লকের দল যে! মিস্টার জনসনের প্রতিনিধি হয়েছে ওনারা।' টেনে টেনে বলল, 'এখনই হয়তো বলে বসবেন—না, মাকড়সা

মেরো না, ওরা আমাদের বন্ধু, ওদের মতই মাছি খাব আমরা···হি-হি-হি!' বলে একটা মুহূর্তও আর দেরি না করে মাকড়সাটাকে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে ভর্তা করে ফেলল সে।

প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে কিলানোর জন্যে শার্টের হাতা গোটাতে শুরু করল মুসা। কিশোর আর রবিন ঠেকাল। ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে সরে এল সেখান থেকে। ওই মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিল ওরা, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কীট-পতঙ্গকে বাঁচানোর একটা সংগঠন তৈরি করবে। শুঁটকি টেরির মত নিষ্ঠুর মানুষদের বাধা দেয়াটা জরুরী।

আরও দিন পনেরো পরের কথা। মিস্টার জনসনের মাকড়সা-বাহিনীর আতঙ্ক মুছে গেছে ওদের মন থেকে। যত সাংঘাতিক ঘটনাই ঘটুক, দিন গেলে সব কিছুই ঝাপসা হয়ে আসে, এটাই পৃথিবীর নিয়ম।

এক ছুটির দিনে মুসা প্রস্তাব দিল, 'চলো, লেকে মাছ ধরতে যাই।'

রাজি হয়ে গেল কিশোর আর রবিন। মাছ ধরতে গেল সেই লেকটায়, যেটাতে ওষুধ ফেলেছিল। দশ কেজি ওজনের একটা পুঁটি মাছ ধরল মুসা।

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল ওরা। চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। তবে অবাক হয়নি। জানে, কি ভাবে বিশাল আকৃতি পেয়েছে ওই পুঁটি মাছ।

***

মানুষখেকোর দেশে

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

ভাল লাগল না দৃশ্যটা তিন গোয়েন্দার।

'পৃথিবীর সবচেয়ে বন্য দ্বীপ'–দ্বীপটা সম্পর্কে এটা হলো অভিযাত্রীদের মন্তব্য। বিশাল নিউগিনি, মানচিত্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপ। অ্যারাফুরা সাগরের বুকে যেন দানবীয় এক ব্যাঙের মত পিঠ উঁচিয়ে রেখেছে। কালো। কুৎসিত। ঝোড়ো মেঘের নিচে যেন ঝিম ধরে রয়েছে।

আঁচিলে বোঝাই ব্যাঙের পিঠ। দুই থেকে তিন মাইল উঁচু এককেটা আঁচিল। শত শত রয়েছে ওরকম। পৃথিবীতে নিউগিনিই একমাত্র দ্বীপ, যেটাতে এত পাহাড়-পর্বত রয়েছে।

ওসব পাহাড়ের কোলে কোলে মানুষের বাস। সেই আদিম অসভ্যই রয়ে গেছে এখনও। ইদানীং একটু একটু করে জানতে আরম্ভ করেছে, ওদের উপত্যকার বাইরেও আরেকটা জগৎ রয়েছে। সেই জগতে যাওয়ার কোন উপায় তাদের নেই। বেশির ভাগ অঞ্চলেই পথঘাট নেই। বাইরে থেকে কারও প্রবেশ করাটা ভীষণ কঠিন। কোন কোন উপত্যকায় বিমানের সাহায্যে নামা যায় অবশ্য। সে-সব জায়গা ছাড়া আরও যে সব উপত্যকা রয়েছে, সেগুলোর অধিবাসীরা কখনও শ্বেতাঙ্গ মানুষ দেখেনি, দেখেনি কোন বিদেশীকে। আকাশ থেকে প্যারাসুটে করে কোন শ্বেতাঙ্গ নামলে তার কাপড়-চোপড় খুলে দেখে ওরা, সত্যিই লোকটার চামড়া অন্য রকম কিনা। বিশ্বাস করতে পারে না।

কেঁপে উঠল মুসা। ঠাণ্ডায় নয়। হাড়কাঁপানো কনকনে বাতাস দামাল বেগে বয়ে যাচ্ছে স্কুনার জাতের জাহাজ 'সাইক্লোন'-এর ডেকের ওপর দিয়ে। ক্যাপ্টেনের দিকে ঘুরে তাকাল সে। অনেক নোনা হাওয়ার ঝাপটা লেগেছে বৃদ্ধ রবার্ট বাউয়েনের চামড়ায়, সেটা তার মুখ দেখেই অনুমান করা যায়। পঞ্চাশ বছর ধরে এদিকের সাগরে তাঁর যাতায়াত।

'ওই লোকগুলো,' মুসা জিজ্ঞেস কলল। 'নিশ্চয় নরখাদক নয়? কি বলেন? শুধুই গল্প, না?'

'কোন্ লোকের কথা বলছ, তার ওপর নির্ভর করে,' জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন। 'নিউগিনির পুবের অংশ অস্ট্রেলিয়ান সরকারের অধীনে। কড়া শাসন। প্রায় সাফ করে দিয়েছে নরখাদকদের। মানুষ হয়ে মানুষ খাওয়া বন্ধ। কিন্তু পশ্চিম অংশ, যেটা দেখছ এখন, ওটা হাজার বছর আগে যা ছিল, এখনও ঠিক তা-ই রয়েছে। প্রায়ই লড়াই বাধে গোত্রে গোত্রে, এক উপত্যকার লোক আরেক উপত্যকার শত্রু। লড়াইয়ে পরাজিত বন্দিদের ধরে খেয়ে ফেলাই রেওয়াজ। কি হলো, ভয় পেলে? না না, ভয়ের কিছু নেই। তোমাকে কিছু করবে না ওরা। মেহামানদের কিছু করে না।'

'তবে কি পছন্দ করে বলতে চান?' আশা হলো মুসার।

'না। তা-ও করে না। বিদেশীদের বরং অপছন্দই করে ওরা। বাইরের কেউ এসে ওদের টামবারানে নাক গলানোটাকে খারাপ চোখেই দেখে বরং।'

'টামবারান কি?'

'মৃতের ঘর। লাশের ঘর বললে ঠিক হয়। এক ধরনের সমাধি মন্দির। ভূতের বাসা বলে ওরা। তাকে তাকে মড়ার খুলি সাজানো। ওদের বিশ্বাস প্রতিটি মড়ার মাথায় একটা করে ভূত বাস করে। নানা ধরনের ভূত আছে। একেক ভূতের একেক কাজ। বিদেশী কিংবা অচেনা লোকের ভূত সাংঘাতিক খারাপ। নানা রকম ঝামেলা পাকিয়ে অস্থির করে মারে। কাজেই ওরকম ভূত কাছেপিঠে না থাকলে ওরা খুশি।'

'তারমানে বিদেশীদের মারে না?'

'সহজে না। তবে বলা যায় না কিছু। রেগে গেলে তোমার মুণ্ডটা ঠিকই কেটে ফেলবে, কিন্তু টামবারানে রাখার সম্মানটুকু দেখাবে না।'

'সম্মান না কচু। ওখানে ঢোকার কোন ইচ্ছেই আমার নেই।'

বন্য উপকূল আর খাড়া হয়ে থাকা কালো পর্বতের দিকে তাকাল আবার মুসা। দেখেই মনে হয় ভয়ঙ্কর বিপদ যেন ঘাপটি মেরে রয়েছে ওখানটায়। এড়ানোর একটাই উপায়। ওই দ্বীপে না যাওয়া।

'তীরে না নামলেও তো পারি!' কিশোর আর রবিনের দিকে তাকাল মুসা। 'যা যা ধরার পানিতে থেকেই ধরতে পারি। এই যেমন ধরো কুমির, ওগুলো তো আর ডাঙায় যায় না। আরও অনেক জীব আছে পানিতে, ভাল দামে বিকোবে। অযথা নরখাদকদের মাঝে যাই কেন?'

কিশোর হাসল। 'মুখেই বলছো। আসলে অতটা ভীতু তুমি নও। আর ভুলে যাচ্ছ, শুধু পানির প্রাণীই ধরলে চলবে না। ডাঙার জীব ধরারও অর্ডার নিয়ে এসেছি আমরা। সব ধরতে না পারলে লাভ তো দূরের কথা, এই অভিযানের খরচই উঠবে না।'

'কি কি যেন ধরতে হবে আমাদের?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'অর্ডারটা আরেকবার পড় তো।'

পকেট থেকে কাগজ বের করল কিশোর। পড়ল, 'কুমির, কমোডো ড্রাগন, বার্ড অভ প্যারাডাইজ, কেশুয়ারি, ক্যাঙারু, ব্যানডিকুট, কাসকাস, ফ্লাইং ফক্স, ফ্যালাঞ্জার, দানবীয় বিচ্ছু, ডাইনোসর গিরগিটি, ডেথ অ্যাডারস, টাইপান, কোয়ালা ভালুক,' হেসে কাগজটা পকেটে ভরল সে। 'আর অবশ্যই নরখাদকদের খুলি। মিউজিয়মের জন্যে।' মুসার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখন আমাকে বলো, ডাঙায় না নেমে এসব কি করে পাব? এর কটা জিনিস আছে পানিতে?'

হাসল মুসা। কিশোর ঠিকই বলেছে, অতটা ভীতু সে নয়। যতটা দেখাচ্ছে। ভূতের ভয় ছাড়া আর প্রায় কোন কিছুকেই তেমন ভয় পায় না সে। আরও একটা কথা, নিউ গিনিতে জন্তু-জানোয়ার ধরতে আসার উৎসাহটা তারই বেশি ছিল।

সিডনিতে এসে একটা স্কুনার ভাড়া করেছে তিন গোয়েন্দা, ওটার ক্যাপ্টেনকে সহ। যেমন চমৎকার জাহাজ 'সাইক্লোন', তেমনি তার ক্যাপ্টেন রবার্ট

বাউয়েন। পাল খুব ভাল জাহাজটার। সতেরো নট গতিতে ছুটতে পারে, ইঞ্জিন বাদ দিয়েই। অবশ্যই যদি বাতাস ভাল থাকে।

চতুর্দিক থেকে আসছে ঢেউ। ভীষণ দুলছে জাহাজ। কালো আকাশ ঝড়ের অশুভ সঙ্কেত জানাচ্ছে।

'বদনাম আছে এ সব সাগরের,' ক্যাপ্টেন জানালেন। 'ওই বড় বড় পর্বতগুলো বাতাসকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। বাড়ি খেয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে বাতাস। ঝালটা মেটায় গিয়ে সাগরের ওপর। এখানেই মাইকেল মারা গিয়েছিল।'

'মাইকেল কে?' জানতে চাইল মুসা।

'মাইকেল রকফেলার। নিউ ইয়র্কের এক সময়ের গভর্নর নেলসন রকফেলারের ছেলে।'

'কি হয়েছিল তার?'

'সে আর তার বন্ধুরা একটা ক্যাটামারান জাহাজ নিয়ে বেরিয়েছিল। ঝড় এল। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। গেল জাহাজটা উল্টে। সারা রাত জাহাজের কাঠটাঠ আঁকড়ে ভেসে থাকল ওরা। ভাবল পরদিন কোন জাহাজ ওদেরকে উদ্ধার করবে। কিন্তু কেউ এল না বাঁচাতে। শেষে মাইকেল ঠিক করল, ভাঙা জাহাজ আঁকড়ে ভেসে থাক তার বন্ধুরা, সে দশ মাইল সাঁতরে তীরে গিয়ে সাহায্য নিয়ে আসবে।

'একটা জাহাজ বন্ধুদেরকে ঠিকই উদ্ধার করল। কিন্তু মাইকেলকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। অনেক কারণ থাকতে পারে। দশ মাইল সাঁতরে যাওয়ার ক্ষমতাই হয়তো হয়নি তার। হাঙর কিংবা কুমিরে খেয়ে ফেলতে পারে। অথবা তীরে হয়তো সত্যিই উঠেছিল, আর উঠেই পড়েছিল নরখাদকদের হাতে।'

'খবর পেয়ে উড়ে এলেন তার বাবা। অনেক খোঁজখবর করলেন। পাওয়া গেল না মাইকেলকে। আদিবাসীরা জানাল তারা কিছুই জানে না। মিথ্যে কথা বলে থাকতে পারে, কে জানে।'

গল্পটা শুনে মন আরও খারাপ হয়ে গেল মুসার। তীরে নামার ইচ্ছে আরও কমে গেল।

ঝড় বাড়ছে। সেই সাথে ঢেউ। পাল নামিয়ে ফেলতে হলো। অক্সিলারি ইঞ্জিন কিছুক্ষণ যুঝল ঢেউয়ের বিরুদ্ধে, তারপর আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেল প্রপেলারের চাপে। অসহায় হয়ে গেল সাইক্লোন। ঢেউ তাকে ঠেলে নিয়ে চলল পাথুরে উপকূলের দিকে। ওই পাথরে বাড়ি খেলে চুরমার হয়ে যাবে জাহাজ। অভিযানের এখানেই ইতি।

তবে পোড় খাওয়া ক্যাপ্টেন এই এলাকার মানচিত্র ভাল করেই জানেন। বললেন, 'আইল্যানড়েন নদীটা বেরিয়ে সাগরে পড়েছে। ওটাতে ঢুকতে পারলে বাঁচা যায়। অ্যাই, এসো, আমাকে সাহায্য করো।' হুইল ধরেছেন তিনি। ধরে রাখতে পারছেন না। হালের গায়ে প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে ঢেউ। পাগলা ঘোড়ার মত খেপে গেছে যেন সাইক্লোন।

তিন গোয়েন্দা আর ক্যাপ্টেন, এই চার জনে মিলে চেষ্টা করে কোনমতে জাহাজটাকে নদীর মুখের কাছে নিয়ে আসতে পারল। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে

পারল না। কিছু পাল ছিঁড়েছে। ইঞ্জিন বন্ধ। হাল কাজ করছে না। চোরা পাথরে ঘষা খেয়ে এখন তলাটা ভেঙে গেলেই ষোলোকলা পূর্ণ হবে।

ধুঁকতে ধুঁকতে নিজের ইচ্ছেমত ভেসে চলেছে জাহাজ। নদীর তীরে একটা গ্রাম দেখা গেল। অনেকগুলো কুঁড়ে রয়েছে। সব চেয়ে বড় ঘরটা টামবারান, ক্যাপ্টেন বললেন ওটার চেহারা দেখেই। বাড়িটাকে কেমন ভূতুড়ে লাগল মুসার। গায়ে কাঁটা দিল। ঢেউ আর স্রোত ওই গাঁয়ের দিকেই ঠেলে নিয়ে চলল জাহাজটাকে।

দুই

চিৎকার করতে করতে ছুটে পালাল গাঁয়ের মহিলা আর বাচ্চারা। লুকিয়ে পড়ল। দ্রিম দ্রিম করে বেজে উঠল কাঠের বিশাল ঢাক। কুঁড়ে থেকে ছুটে বেরিয়ে এল পুরুষ যোদ্ধারা, হাতে বল্লম, পাথরের কুড়াল, তীর আর ধনুক।

ওদের যুদ্ধ-চিৎকার প্রতিধ্বনি তুলল চারপাশের পর্বতে।

ভয়ের ঠাণ্ডা শিহরণ মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল রবিনের, মনে করল নরখাদক। মুসা আর কিশোরও কম ভয় পায়নি। এ রকম আর কখনও দেখেনি ওরা। মানুষের খুলি দিয়ে মালা গেঁথে গলায় পরেছে কেউ কেউ। সবার মাথায়ই বার্ড অভ প্যারাডাইজ পাখির পালক গোঁজা। শরীরে আঁকা সাপ, কুমির কিংবা শতপদীর ছবি। পরনে কাপড় বলতে কিছু নেই। কেবল ঘাসের তৈরি এক ধরনের মাদুর দিয়ে লজ্জা ঢেকেছে। রং করা মুখগুলো ভয়ঙ্কর। নাক ছিদ্র করে ঢুকিয়ে রেখেছে দাঁতাল শুয়োরের দাঁত। জন্তুর মত দেখতে লাগছে মানুষগুলোকে।

কাত হয়ে নদীর কিনারে চরায় আটকে আছে জাহাজটা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিন অভিযাত্রী। তিন গোয়েন্দা বুঝতে পারছে না কি করবে। তবে বাউয়েন পারছেন। তিনি জানেন, ভয় পেয়েছেন এটা বুঝতে দেয়া চলবে না ওদের। তাহলে খুন হয়ে যেতে হবে।

হাত তুলে চিৎকার করে বললেন তিনি, 'থামো!'

নিজেদের ভাষায় কথা শুনে থেমে দাঁড়াল আদিবাসীরা। চেঁচামেচি থামিয়ে দিল।

তবে বন্ধুত্ব করার কোন ইচ্ছে দেখাল না। অস্ত্র হাতে তাকিয়ে রয়েছে আজব মানুষগুলোর দিকে। এর আগে জাহাজ দেখেনি। ভাবল, সাগর থেকে উঠে আসা ভয়াবহ কোন দানব হতে পারে ওটা।

'আমাদের মত মানুষ বোধহয় দেখেনি আর,' নিচু গলায় বলল কিশোর।

'হতে পারে,' বাউয়েন বললেন। 'পর্বত থেকে শত শত নদী নেমে গেছে সাগরে। বেশির ভাগ নদীর পাড়েই এখনও সভ্য মানুষের পা পড়েনি।'

'এখানে আপনি আসেননি আর?'

'না। ঝড়ে ঠেলে না আনলে আসতামও না। লোকগুলো কেমন বুঝতে পারছি না। দেখি, কথা বলে।'

স্থানীয় ভাষায় কথা বললেন তিনি। শান্ত হলো না লোকগুলো। রাগত জবাব দিল। এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। জাহাজ থেকে নেমে পড়ল অভিযাত্রীরা। লোকগুলো কাছে এসে ওদেরকে ঘিরে দাঁড়াল।

একজন একটানে রবিনের শার্ট ছিঁড়ে দিল। বিস্মিত চিৎকার উঠল ওদের মাঝে। ওদের চামড়ার তুলনায় রবিনের চামড়া ধবধবে সাদা। বাউয়েন সাদা। কিশোরও জংলীদের তুলনায় সাদা। চামড়ার রঙই অবাক করেছে আদিবাসীদের। কালো বলে মুসার দিকে বিশেষ নজর দিল না ওরা। তবে ওর পোশাক-আশাক পছন্দ হলো না ওদের। যেন বুঝতে পারছে না ওদেরই মত কালো এই ছেলেটা সাদাদের পোশাক পরে আছে কেন।

সাদা চামড়া দেখে একটু যেন ঘাবড়ে গেল ওরা। পিছিয়ে গেল।

'কুসংস্কারে ভরা ওদের মন,' বাউয়েন বললেন। 'ওরা ভাবছে, আমরা হয় দেবতা, নয়তো শয়তান। কিংবা ওঝা। ওঝাদেরকে যমের মত ভয় করে ওরা।'

'ভাল! পেয়ে গেছি পথ,' তুড়ি বাজাল কিশোর। 'ওঝাই সাজব আমরা। একআধটু ম্যাজিক দেখিয়ে ওদেরকে কাবু করা যেতে পারে।'

শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন বাউয়েন। 'কি ম্যাজিক দেখাবে? জানো নাকি কিছু?'

'না। শুরুটা আপনাকে দিয়েই হবে। আপনার সব আলগা দাঁত। ওদেরকে দেখান, কি করে দাঁত খুলে নিয়ে আবার পরতে পারেন আপনি।'

মুচকি হাসলেন বাউয়েন। জংলীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'শোনো, তোমাদের ওঝাকে ডেকে আনো। আমি যে কি করতে পারি দেখাব সবাইকে।'

টামবারানের দিকে ছুটে গেল কয়েকজন লোক। দরজা খুলল। ভেতরটা আবছা অন্ধকার, দেখতে পেল অভিযাত্রীরা। অসংখ্য তাক বোঝাই মানুষের মাথার খুলি। বেরিয়ে এল একজন বিশালদেহী মানুষ। ওর গায়ে অলঙ্কার আর ছবির পরিমাণ সকলের চেয়ে বেশি।

দাম্ভিক ভঙ্গিতে এগিয়ে এল সে। দু'পাশে সরে জায়গা করে দিতে লাগল লোকেরা। সবার চোখেই শ্রদ্ধা মেশানো ভয়। রক্ত-লাল রঙে আঁকা তার মুখ। ঘন ভুরুর নিচে চোখজোড়া যেন জ্বলছে। বাউয়েনের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

যেন দেখেই চিনে ফেলেছেন ক্যাপ্টেন, এমন ভঙ্গি করে আদিবাসীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খারাপ ওঝাও আছে, ভাল ওঝাও আছে। এই লোকটা খারাপ। ওকে বলো তো, ওর জাদু দেখাক। দেখি দাঁত খুলে নিয়ে আবার লাগাতে পারে কি না।'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল ওঝা। অনেক জাদু সে দেখাতে পারে, কিন্তু দাঁত খুলে নিয়ে পরতে পারে কেউ এটা জন্মেও শোনেনি। বলল, 'কেউ পারবে না।'

ওরা যা যা বলছে, ওদের সঙ্গে যা বলছেন, সব তিন গোয়েন্দাকে অনুবাদ করে শোনাচ্ছেন ক্যাপ্টেন।

'আমি পারব।' শান্ত ভঙ্গিতে মুখের ভেতর হাত দিয়ে এক পাটি দাঁত খুলে

আনলেন তিনি।

ভীষণ অবাক হলেও সেটা না দেখানোর ভান করল ওঝা। কিন্তু আদিবাসীরা জোর গুঞ্জন করে উঠল। এমন কাণ্ড জীবনে দেখেনি ওরা। পাটিটা হাতে নিল একজন। হাত থেকে হাতে ঘুরতে থাকল। ভয় পেয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। ফেরত যদি না দেয়। তাহলে খেতেই পারবেন না।

তবে দিল ওরা। শেষ লোকটাও দেখার পর ফিরিয়ে দিল। নদী থেকে গিয়ে ভালমত ধুয়ে আবার পাটিটা পরে নিলেন তিনি। কিশোরকে বললেন, 'এবার তোমার পালা।'

কিশোরের আলগা দাঁত নেই। তাকে অন্য কিছু করতে হবে। বলল, 'ওদেরকে জিজ্ঞেস করুন আগুন জ্বালাতে পারে কিনা।'

চিৎকার করে জানাল ওরা, পারে।

'কত তাড়াতাড়ি পারে?'

'অনেক তাড়াতাড়ি। এমনকি তোমার চেয়েও।'

'বেশ, দেখাতে বলুন।'

ওঝার আদেশে দৌড়ে গিয়ে কয়েকজনে একটা বাঁশের টুকরো, কিছু শুকনো ঘাস-পাতা আর একটা শুকনো কাঠি নিয়ে এল। এ সব দিয়ে কি করে আগুন ধরাতে হয় জানা আছে কিশোরের। স্কাউটিঙে শিখেছে। বাঁশের টুকরোর এক জায়গায় ছোট একটা ছিদ্র করে তার ওপর শুকনো ঘাসপাতা ছড়িয়ে দিতে হয়। তারপর কাঠির চোখা মাথাটা সেই ছিদ্রে বসিয়ে দুই তালু দিয়ে চেপে ধরে জোরে জোরে ডলতে হয়, মন্থন করে দই থেকে মাখন বের করা হয় যে ভাবে সে-ভাবে। তাতে গায়ের জোর এবং ক্ষিপ্রতা দুইই দরকার। ডলতে শুরু করল ওঝা। মিনিট খানেক পরেই ধোঁয়া দেখা গেল শুকনো পাতায়, আরেকটু পরে জ্বলে উঠল।

ব্যঙ্গের হাসি হাসল কিশোর। 'এত দেরি? আমি এক খোঁচা দিয়েই পারি।' বলে পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করল। খস্ করে একটা কাঠি জ্বেলে দেখাল।

তাজ্জব হয়ে গেল গাঁয়ের লোক। হুল্লোড় করে উঠল। কিশোরের হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে একজন একটা কাঠি জ্বালল। দেখাদেখি আরেকজন জ্বালল আরেকটা। তারপর আরেকজন। তাড়াতাড়ি কায়দা করে বাক্সটা নিয়ে নিল কিশোর। নইলে সব কাঠি জ্বেলে শেষ করে ফেলবে জংলীগুলো।

কিশোরকেও অনেক বড় ওঝা বলে মেনে নিল ওরা। তারপর মুসা আর রবিনের দিকে তাকাতে লাগল। কি ভেবে বাদ দিল রবিনকে। মুসার দিকে নজর দিল। বোধহয় কালো হয়ে সাদাদের পোশাক কেন পরেছে সেই আক্রোশেই তাকে ধরল ওরা। কিংবা কালো বলে হয়তো কিশোরের চেয়েও শক্তিশালী ওঝা ভাবল। কারণ ওদের দেশের সমস্ত ওঝা তো কালোই। তার দিকে আঙুল তুলল।

কিশোরকে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'ছোট আয়নাটা হলে কেমন হয়?'

'কি করবে?'

বাউয়েনকে বলল মুসা, 'ওদেরকে জিজ্ঞেস করুন, নিজের মুখ দেখতে পারে

কিনা কোন কিছুতে।'

জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন। সবাই মাথা নাড়ল, ওঝা বাদে। সে বলল, পারবে। টামবারান থেকে গিয়ে একটা বিশেষ পাত্র আনতে আদেশ দিল একজনকে। দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এল লোকটা। আস্ত এক টুকরো চকমকি পাথর কুঁদে তৈরি হয়েছে পাত্রটা। তার মধ্যে পানি ভরল ওঝা। মানুষের চেহারা দেখার আদিম পদ্ধতি। হয়তো দশ হাজার বছর আগে পাথরের যুগে তৈরি করেছিল মানুষ এই জিনিস। এই আদিবাসীদের মধ্যে আজও রয়ে গেছে এই ব্যবস্থা। তাতে চেহারা দেখা যায় বটে, কিন্তু অস্পষ্ট। তার ওপর পানি কাঁপতে থাকলে নাক-চোখ-মুখ আলাদা করে বোঝা যায় না। পাত্রটা মুসার দিকে ঠেলে দিল ওঝা।

দেখে মুখ বাঁকাল মুসা। নিজের ছোট আয়নাটা বের করে দিল ওঝার হাতে। এই বার আর শত চেষ্টা করেও বিস্ময় চাপা দিতে পারল না লোকটা। হেরে গেল বলে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল কুৎসিত চেহারা।

আয়নাটা নিয়ে দেখল আরেকজন। চমকে গেল। কল্পনাই করতে পারেনি কোনওদিন তার নিজের চেহারা এতটা কুৎসিত। তাড়াতাড়ি ওটা দিয়ে দিল পাশের জনের হাতে। এ ভাবে হাত বদল হতে হতে আবার মুসার হাতে ফিরে এল আয়না। সবাই তাকে মেনে নিল অনেক বড় ওঝা বলে। নিজের চেহারা নিজেকে দেখাতে পারে এত বড় ওঝা আর ক'জন আছে।

রবিনকে দেখিয়ে বাউয়েন জিজ্ঞেস করল, 'ওর ক্ষমতা দেখানো লাগবে?'

সবাই মাথা নেড়ে জানাল, আর দরকার নেই। চারজনের মধ্যে তিনজনই যখন মস্ত বড় বড় ওঝা, চতুর্থজন তো হবেই।

বাইরের জগৎ থেকে আসা চারজন জাদুকরকে সম্মানিত মেহমান করে নিল আদিবাসীরা। ডেকে আনা হলো মেয়েদের। শুয়ে পড়ার আদেশ দেয়া হলো। পাশাপাশি, গা ঘেঁষে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মেয়েরা। মানুষের দেহের একটা জীবন্ত রাস্তা চলে গেল একেবারে টামবারানের দরজা পর্যন্ত। মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে মেহমানদেরকে এগোতে অনুরোধ করল আদিবাসীরা।

'কি বলে?' ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ওদের গাঁয়ে স্বাগত জানাচ্ছে। এটাই ওদের নিয়ম। মহিলাদের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে আমাদের।'

'বলে কি!' প্রতিবাদের সুরে বলল মুসা, 'মেয়েদেরকে মানুষ মনে করে না নাকি?'

'মনে তো হয় না।'

রবিন বলল, 'ওদের বলুন আমরা এ কাজ করতে পারব না।'

'মারাত্মক ভুল হয়ে যাবে সেটা। ওরা অপমানিত বোধ করবে। ধরো, তোমার বাড়িতে কেউ বেড়াতে এল, তুমি হাত বাড়িয়ে দিলে। হাত মেলাতে অস্বীকার করল সে। কেমন লাগবে তোমার?'

'তাহলে আপনি আগে যান।'

'উপায় নেই। বাঁচতে হলে যেতেই হবে।' জুতো খুলে হাতে নিলেন

বাউয়েন। দ্বিধা করলেন। তারপর উঠে পড়লেন প্রথম মেয়েটার পিঠে। ভারি শরীর তাঁর। একটা গোঙানি শোনা গেল। যতটা সম্ভব হালকা পায়ে হাঁটার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু দেহের পুরো ভর ছেড়ে না দিয়ে কি আর হাঁটা সম্ভব। দ্বিতীয় মেয়েটাও ব্যথায় ককিয়ে উঠল। তবে নড়ল না।

কিশোরকে বলল মুসা, 'এবার তোমার সম্মানিত হবার পালা।'

'আমি কেন? তুমি যাও। তোমাকে তো বড় ওঝা ভাবছে ওরা।'

'পারব না। তুমি আগে যাও।'

আগে হোক পরে হোক যেতেই হবে। অযথা তর্ক করল না কিশোর। জুতো খুলে নিয়ে পা রাখল প্রথম মেয়েটার পিঠে। প্রচণ্ড খারাপ লাগছে তার।

তারপর এল মুসার পালা। সবশেষে রবিন। সে সবার চেয়ে হালকা। তার ভারে গোঙাল না কোন মহিলা। ককাল না। ওদেরকে আরও কম কষ্ট দিয়ে দ্রুত পার হয়ে যাওয়ার জন্যে প্রায় দৌড়ে এগোল সে।

তিন

টামবারানের দরজায় পাহারা দিচ্ছে একজন প্রহরী। সসম্মানে সরে গিয়ে মেহমানদের ঢোকার জায়গা করে দিল। ঘরে জানালা নেই। খড়ের চালাটা ঢালু হয়ে নেমে এসে মাটি ছুঁই ছুঁই করছে। ভালমত দেখার জন্যে টর্চ জ্বালল কিশোর।

কাঠের তৈরি অসংখ্য মূর্তি ঘরে। লাল আর হলুদ রঙ করা। মুখগুলো ভয়ঙ্কর। কোনটার দাঁত বেরিয়ে আছে, কোনটার রয়েছে জানোয়ারের মত শিং, আবার কোন কোনটার বিরাট বিরাট চোখ, বিকট লাগে দেখতে।

'শয়তানের মত করে দেবতা তৈরি করে এরা,' বুঝিয়ে দিলেন বাউয়েন। 'ওদের বিশ্বাস, শয়তান হলো মহাশক্তিধর। এ রকম করে তৈরি করার আরেকটা কারণ আছে। ওঝা চায়, এ রকম বিকট চেহারা দেখে ভয় পাক লোকে। তাকে মান্য করুক।'

তবে দেখার মত জিনিস হলো তাকে সাজানো খুলিগুলো। লাল, নীল, হলুদ কিংবা বেগুনী রঙে রঙ করা হয়েছে।

'শত্রুর খুলি,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'যাদেরকে ওরা খুন করেছে।'

কেঁপে উঠল মুসা। 'জায়গাটা ভাল না! কেমন জানি লাগে!'

'লাগবেই। ইচ্ছে করেই এই পরিবেশ তৈরি করেছে ওঝা, মানুষকে ভয় দেখাতে।'

গ্রামবাসীরাও ঢুকল টামবারানে। এক কোণে বড় একটা কাঠের পিপে রাখা হয়েছে। তার ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে ওঝা, যাতে সবাই তাকে দেখতে পারে। সূর্য ডুবে গেছে। মশাল জ্বেলে দেয়া হয়েছে। মশালের কাঁপা আলো, ধোঁয়া, আর অন্যান্য জিনিস মিলে গা ছমছমে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে ঘরের ভেতরে।

বক্তৃতা দিচ্ছে ওঝা।

বাউয়েন জানালেন ছেলেদের, 'গাঁয়ের লোককে বোঝানোর চেষ্টা করছে সে, তার মত বড় ওঝা আর নেই। অনেক ক্ষমতাশালী সে। মনে করিয়ে দিতে চাইছে কারও গায়ে একটা আঙুলও না ছুঁইয়ে কি ভাবে ওদের মেরে ফেলেছে। সে শুধু ওদেরকে বলেছে: তুমি মরবে। কিছু দিন পরেই মরে গেছে ওরা।'

'সত্যি?' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। 'ওরা সে-কথা বিশ্বাস করে?'

'করবে না কেন? নিজের চোখে দেখেছে তো।'

'তা কি করে সম্ভব?'

'খুব সম্ভব। আসলে ওদের স্নায়ুর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল ও। আতঙ্কিত করে দিয়েছিল। অসুখের সময় ডাক্তারের কাছে গেলে আমাদের কি হয়? যদি ডাক্তার বলেন, কিছু না, ভাল হয়ে যাবেন। মনে হয় না সত্যি ভাল হয়ে যাচ্ছি? আর ডাক্তার যদি বলেন, আপনি শেষ। আর তিন হপ্তা টিকবেন কিনা সন্দেহ। রোগীর মনে মৃত্যুভয় ঢুকে যাবে তখন। বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়ে খাওয়া-দাওয়াই হয়তো বন্ধ করে দেবে। সভ্য জগতেই যখন এই অবস্থা, এখানে জংলীদের তো আরও বেশি আতঙ্কিত হওয়ার কথা। ফলে কেউ অসুস্থতায় মরে, আর কেউ মরে আতঙ্কিত হয়ে, হাল ছেড়ে দিয়ে।'

'হুঁ, যুক্তি আছে আপনার কথায়,' মুসা মেনে নিল। 'এখন কি বলছে।'

'বলছে আমাদের চেয়ে সে বড় জাদুকর। প্রমাণ করে দিতে পারবে।'

চার অভিযাত্রীর দিকে ফিরল ওঝা। গম্ভীর কণ্ঠে যা বলল—অনুবাদ করে তিন গোয়েন্দাকে শোনালেন বাউয়েন, 'যা বলি মন দিয়ে শোনো। শয়তানের সমস্ত শক্তিকে ডেকেছি আমি। তোমাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছি। আজ রাতে টামবারানে ঘুমাবে তোমরা। ঘরের সমস্ত প্রেতাত্মা কুনজর দেবে তোমাদের ওপর, তোমাদের মৃত্যু কামনা করবে। মধ্য রাতে মারা যাবে তোমরা। আমি ঘোষণা দিলাম।'

চারজনকে মৃতের ঘরে রেখে বাইরে থেকে তালা আটকে দিল প্রহরী।

মশালগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে। টর্চ জ্বালল কিশোর। টর্চের আলোয় আরও কিম্ভূত লাগল মূর্তিগুলোকে। কুৎসিত, নিষ্ঠুর, শয়তানীতে ভরা চেহারা।

'আমরা বোধহয় মরেই গেছি, না?' মুসা বলল।

'মন শক্ত রাখো,' পরামর্শ দিলেন ক্যাপ্টেন। 'কিচ্ছু হবে না। আমি ঘুমাতে যাচ্ছি।'

শোবার কোন ব্যবস্থা চোখে পড়ল না। বিছানা-টিছানা কিছুই নেই।

'ঠিক আছে,' হাত ওল্টালেন বাউয়েন। 'মেঝেতেই শোব। বালিশের ব্যবস্থা যদি করা যেত।' কিশোরের টর্চ জ্বেলে রেখেছে। বালিশ বানানো যায় এমন কিছু খুঁজতে লাগলেন তিনি। নিদেনপক্ষে এক টুকরো কাঠ হলেও চলে। কিছুই চোখে পড়ল না। শেষে দৃষ্টি স্থির হলো খুলির ওপর।

'ওতেই চলবে,' বললেন তিনি। বড় দেখে চারটে খুলি নামিয়ে এনে তিনটে দিলেন ছেলেদেরকে, একটা নিলেন নিজে।

চিত হয়ে শুয়ে শক্ত হাড়ের ওপর মাথা রাখার চেষ্টা করতে লাগল চার জনে। হচ্ছে না। গড়িয়ে পড়ে যায় মাথা। মুসা তো কিছুতেই পারল না। শেষে দুত্তোর

বলে হাতের ওপরই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। চমকে জেগে গেল একসময়। মানুষের গলা কানে এসেছে।

অঘোরে ঘুমোচ্ছে কিশোর আর বাউয়েন। রবিনের নাক ডাকছে মৃদু শব্দে। ঘড়ি দেখল সে। বারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। প্রায় মধ্যরাত। কিছু ঘটলে দশ মিনিটের মধ্যেই ঘটবে। কি ঘটবে? কচু, মনকে বোঝাল সে। কিছুই ঘটবে না। ভয় দেখাতে চেয়েছে ওঝা। আবার ঘুমানোর চেষ্টা করতে লাগল সে।

কিন্তু শরীরটা খারাপ লাগছে। মাথা ধরেছে। পেটে ব্যথা। নাড়ি দেখল। অস্বাভাবিক গতিতে চলছে। শীত শীত লাগছে। কিশোরকে জাগাবে? ভীতুর ডিম বলে তাকে টিটকারি দেবে কিশোর, এটা সহ্য করতে পারবে না সে।

আসলে অতটা অবজ্ঞা করা উচিত হয়নি ওঝাকে, ভাবতে লাগল সে। সভ্য মানুষেরা অনেক আশ্চর্য আবিষ্কার করেছে, ঠিক, তার পরেও আজকাল বিজ্ঞানীরা অরণ্যের গভীরে চলে যাচ্ছেন আদিবাসীদের কাছ থেকে ওষুধের জ্ঞান আহরণের জন্যে। তাঁদের ধারণা, ভেষজ ওষুধে অনেক জ্ঞান অসভ্যদের। এমনকি ক্যান্সারের ওষুধও নাকি জানে ওরা।

তবে কি বিজ্ঞানীদের কথাই ঠিক? ওঝা কিছু একটা করেছে? যার ফলে চাপ পড়েছে তার মগজে? ব্যথা করছে? এতক্ষণে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করল, কেন ওঝা যখন কাউকে বলে 'তুমি মরবে', সে সত্যিই মারা যায়। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো তার। করল না। মরলে নীরবে মরবে।

কি যা-তা ভাবছে!–নিজেকে ধমক লাগাল সে। মরবে না, এ তো জানা কথাই। অন্তত ওই শয়তান ওঝাটার কথায় তো নয়ই। আসলে অতিরিক্ত ক্লান্তি আর উত্তেজনায় এ রকম হচ্ছে। আবার ঘুমানোর চেষ্টা করল সে।

ঘুমিয়ে পড়ল ও, তবে অশান্তির ঘুম। কারণ অস্থিরতা রয়েছে মনের ভেতর। দুঃস্বপ্ন দেখল, সে মারা গেছে, আর তার খুলিটা রঙ করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে তাকে। মস্ত দরজার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরে। নড়ে উঠল কিশোর আর বাউয়েন। বাইরে অনেক লোকের কলরব। তালা খোলার শব্দ হলো। খুলে গেল দরজাটা।

দরজায় দাঁড়িয়ে ওঝা। পেছনে গাঁয়ের লোক। গলা বাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে দেখার চেষ্টা করছে সত্যিই কাজ করেছে কিনা অভিশাপ।

'মরার অভিনয় করো,' ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর।

চোখ মুদে পড়ে রইল চার জনে। ভেতরে ঢুকল ওঝা। ওরা ভান করে পড়ে আছে কিনা বোঝার জন্যে জোরে জোরে লাথি মারল পাঁজরে। নড়ল না চারজন যেন মরে শক্ত হয়ে গেছে

নিজেদের ওঝার প্রশংসা করে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকজন। মহিলাদের কয়েকজন সহানুভূতি জানিয়ে গোঙাল, কিংবা ককাল

বাইরে বেরিয়ে কর্কশ কণ্ঠে আদেশ দিল ওঝা। ফিসফিস করে বাউয়েন বললেন, 'আগুন জ্বালার নির্দেশ দিচ্ছে সে।'

পাথরের কুড়াল দিয়ে ডালপাতা কাটার শব্দ হলো। খসখস, খুটখাট আরও নানা রকম শব্দের পর জ্বলে উঠল আগুন।

'পুড়িয়ে মারবে নাকি?' মুসার প্রশ্ন।

'চুপ,' কিশোরের ইচ্ছে বুঝে গেছেন ক্যাপ্টেন। 'কোন কথা নয়। নড়বে না। হঠাৎ চমকে দেব ব্যাটাদের।'

আবার কড়া গলায় আদেশ দিল ওঝা। কয়েকজন লোক ঢুকল ঘরে। চারটে 'লাশকে' বের করে নিয়ে গিয়ে রাখল আগুনের ধারে। ইতিমধ্যে বেশ জ্বলে উঠেছে আগুন। বাড়ছে দ্রুত। একটা চক্র তৈরি করে তার ভেতরে রাখা হয়েছে লাশগুলোকে।

জ্বলতে জ্বলতে কেন্দ্রের দিকে এগোচ্ছে আগুন। আরেকটু এগোলেই কাপড়ে ধরে যাবে, তারপর শরীরে। ইতিমধ্যেই ছ্যাঁকা লাগতে আরম্ভ করেছে। রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। ফলে ভেজা ঘাসপাতায় আগুন লেগে প্রচুর ধোঁয়া ছড়াচ্ছে।

'হয়েছে, উঠে পড়ো,' নির্দেশ দিলেন বাউয়েন। 'লাফিয়ে বেরিয়ে যাব আগুনের ভেতর থেকে।'

ধোঁয়ার ভেতরে চারটে লাশকে উঠে বসতে দেখে আতঙ্কে চিৎকার শুরু করল জংলীরা। কয়েকজন ছুটে পালাল। ওদের ধারণা ওগুলো ভূত। লাফিয়ে আগুনের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল ভূতগুলো। রূপান্তরিত হয়ে গেল জীবন্ত মানুষে

একযোগে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল জনতা। জীবনে এত বড় জাদু আর দেখেনি ওরা। এর তুলনায় ওদের নি. .দের ওঝার জাদু কিছুই না। ওঝা নিজেও স্তম্ভিত। বিশ্বাস করতে পারছে না এ রকম কাণ্ড ঘটতে পারে। বরফের মত জমে গেছে যেন সে। ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। ঝুলে পড়েছে নিচের চোয়াল। হয়তো এই প্রথম তার খুনের পদ্ধতি কাজ করেনি। অভিশাপ ব্যর্থ।

খানিক আগেও সদম্ভে চিৎকার করেছে সে। তার ভয়ে ভীত হয়েছে গাঁয়ের নারী-পুরুষ। এখন তার কর্তৃত্ব শেষ। যে কোন সাধারণ লোকের চেয়ে বেশি কিছু নয় আর সে। লোকে চেঁচামেচি করে বলতে শুরু করল, ওঝাকে এখন আগুনে ঝাঁপ দিতে হবে। নইলে জোর করে ধরে তাকে ফেলা হবে আগুনে। ভয় কি? সে তো ওঝাই। জাদু জানালে বেরিয়ে আসুক। নয়তো মরুক। ক্ষমতা নেই, এ রকম ওঝার দরকার নেই গাঁয়ের লোকের।

ভড়কে গেল ওঝা। কেউ কিছু বোঝার আগেই ঘুরে দিল দৌড়। এক ছুটে হারিয়ে গেল বনের ভেতরে।

চার

তীরের কাছে নলখাগড়ার ভেতরে দানবটাকে নড়তে চড়তে দেখল মুসা।

হাতে-মুখে কালি ময়লা লেগে আছে, ধুতে এসেছে সে। পানির কাছে এসে ঝুঁকল। পেছনে গাঁয়ের লোকের উত্তেজিত গুঞ্জন শোনা গেল। তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। 'সাবধান! কুমিরটার চোখ তোমার ওপর। আস্ত

শয়তান। ওরা বলছে ওদের শ'খানেক মানুষকে মেরে [illegible]।

ফিরে তাকাল মুসা। 'তাই নাকি? মিথ্যে কথা [illegible] মারলেও ওটাকে মেরে ফেলত ওরা।'

'না, মারেনি তার কারণ ওটাকে কুমির মনে করে না ওরা। [illegible] কুমিরের রূপ ধরে এসেছে। ওটাকে মারলে ভেতরের শয়তানটা [illegible] উল্টে ভীষণ রেগে গিয়ে পুরো গ্রাম ধ্বংস করে দেবে। তুমি মারতে গেলে [illegible] ওপরও খেপে যাবে ওরা।'

'তাই নাকি?' মুচকি হাসল মুসা। 'তাহলে জ্যান্তই ধরব। চিড়িয়াখানা [illegible] বড় একটা কুমির চেয়েছেই। চমৎকার নমুনা এটা।'

'মাথা খারাপ। এখানকার কুমিরকে তুমি চেনো না। আমেরিকায় যে সব অ্যালিগেটর দেখেছ ওগুলোর সঙ্গে এর অনেক তফাৎ।'

'ক্যাপ্টেন ঠিকই বলেছেন,' রবিন বলল। 'কেন, পড়োনি? কুমির হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সরীসৃপ। আর নিউগিনির এই দক্ষিণ উপকূলে গ্রেট ব্যারিয়ার রীফের ভেতরেরগুলো তো একেকটা দৈত্য।'

'দুনিয়ার সবচেয়ে বড় কুমির,' কিশোর বলল। 'সাংঘাতিক শক্ত এদের চামড়া। পঁয়তাল্লিশ বোরের বুলেট হলে হয়তো মারা যাবে। কিন্তু জ্যান্ত ধরা? অসম্ভব।'

'তারমানে তোমরা চেষ্টা করতেও রাজি নও?' মুসার প্রশ্ন।

নলখাগড়ার বনে কুমিরটার দিকে তাকাল আবার কিশোর। ঘাপটি মেরে পড়ে রয়েছে। ভাবখানা, কিছু জানে না। পানির কাছাকাছি কোন বাচ্চা কিংবা মেয়েমানুষ এলে, আর সামান্যতম অসতর্ক হলেই চোখের পলকে এসে কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে চলে যাবে পানির তলায়।

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তুমি ঠিকই বলছ। চেষ্টা করা উচিত। গাঁয়ের লোকে মারবে না এটাকে। আর এটাও মহা আরামে একের পর এক মানুষ সাবাড় করতে থাকবে। এই মানুষ খাওয়া বন্ধ করা দরকার।'

'কিন্তু ধরবে কিভাবে?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন। 'আর ধরে রাখবেই বা কোথায়?' চরায় আটকা পড়া কাত হয়ে থাকা স্কুনারটার দিকে তাকিয়ে র[illegible]ছেন তিনি।

'সেই ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে। জোয়ার আসছে। ওটাকে নামানোর উপযুক্ত সময় এটাই। সাহায্য করার জন্যে অনেক লোক পাবেন এখন। তলাটা না ভেঙে থাকলেই হয়। আমার বিশ্বাস ভাঙেনি। পানিতে নামাতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। জলজ জীব রাখার বড় বড় ট্যাংকগুলো নিশ্চয় সহজে ফুটো হবে না। ওরকম একটাতেই রাখব দৈত্যটাকে।'

'রাখা তো পরের কথা। ধরতে পারো কিনা আগে দেখো। এক টন ওজনের একটা কুমিরকে কিভাবে ধরো দেখার বড় আগ্রহ হচ্ছে আমার।'

কিশোর ঠিকই বলেছে। লোক জোগাড় করতে অসুবিধে হলো না। তাদেরকে নিয়ে জাহাজ নামাতে চললেন ক্যাপ্টেন।

কুমিরটার দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকাল কিশোর। এতবড় একটা দানবকে কি

করে ধরবে ভাবছে? একশো লোকের শক্তি ওটার গায়ে।

কলরব জুড়েছে বিশজন লোক, যারা বাউয়েনকে সাহায্য করতে গেছে। জোয়ারে বেশ ফুলে উঠেছে পানি। অনেক কায়দা কসরৎ করতে হলো অবশ্য, তবে অবশেষে ঠেলে জাহাজটাকে বেশি পানিতে নামানো গেল। এবারেও কিশোরের অনুমান ঠিক। তলাটার কোন ক্ষতি হয়নি। সোজা হয়ে ভেসে রইল সাইক্লোন।

ডেক থেকে চেঁচিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন, 'কুমিরটাকে ধরে নিয়ে এসো। আমি জায়গা করে রাখছি। হাহ্ হাহ্।'

'এক বান্ডিল দড়ি ছুঁড়ে দিন,' কিশোর বলল।

'কি করবে?' রবিন জানতে চাইল।

'একমাথা ওই গাছের সঙ্গে বাঁধব। আরেক মাথায় ফাঁসি বানিয়ে ল্যাসোর মত ছুঁড়ে মারব কুমিরের মুখে। আটকে দিতে পারলে হাঁ করতে পারবে না। ক্ষতি করার ক্ষমতা অনেকখানি কমবে।'

রবিন চুপ করে রইল। মুসার মনে হলো কাজ হলেও হতে পারে। কুমির ঘাপটি মেরে থাকার সময় অনেক সময় মুখটা ওপর দিকে তুলে রাখে কোণাকুণি করে। ওই সময় তার মুখে ফাঁস পরানো কঠিন নয়।

প্রথমবারের চেষ্টাতেই তার বন্ধ করা চোয়াল আর নাক গলে চোখের কাছাকাছি চলে এল ফাঁস। দড়ি ধরে হ্যাঁচকা এক টান দিতেই আটকে গেল। মুখ আর খুলতে পারবে না কুমির।

গাঁয়ের লোকে দেখছিল, হুল্লোড় করে উঠল। ভীষণ রেগে গেছে কুমির। চোখ জ্বলছে। তেড়ে এল তিন গোয়েন্দার দিকে। ওরা ভাবছে, ডাঙায় রয়েছে। এখানে নিরাপদ। কিন্তু কুমির পানিতে যেমন বিপজ্জনক, ডাঙায়ও কিছুমাত্র কম নয়। চোখের পলকে কাছে এসে লেজের বাড়ি মেরে গোয়েন্দাদের পানিতে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল। অল্পের জন্যে বেঁচে গেল ওরা। শয়তান খেপেছে ভেবে যে যেদিকে পারল দৌড় মারল গ্রামবাসীরা। তবে দড়িটা শক্ত, আর শক্ত করেই গাছের সঙ্গে বেঁধেছে কিশোর। ছুটাতে পারল না কুমির। আবার তাড়া করল ওদেরকে।

গাছটার দিকে তাকাল একবার কিশোর। ওখানে উঠে রেহাই পাওয়া যায় কিনা ভাবল। উঁহু, হবে না। মুসা আর রবিনকে ছুটতে বলে দৌড় দিল টামবারানের দিকে।

লম্বা দড়ি। পেছন পেছন এল কুমিরটা। যে করেই হোক ধরবেই শয়তান ছেলেগুলোকে। ভাবখানা–এত্ত বড় সাহস! তাকে নিয়ে মজা করে!

প্রায় মাটির কাছাকাছি নেমে আসা চালাটায় উঠতে কোন অসুবিধে হলো না ওদের। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওঠার মত করে এক দৌড়ে উঠে পড়ল। কুমিরটাও ছাড়ার পাত্র নয়। উঠে পড়ল পেছন পেছন। তিনটে ছেলে উঠেছে, সেটা আলাদা কথা, কিন্তু একটনী একটা কুমিরের ভার বহন করার মত শক্ত নয় চালাটা। ভেঙে পড়ল।

ছাতের আরেক ঢাল বেয়ে নেমে পড়ল ছেলেরা। মারাত্মক জানোয়ারটা

পেছনে আসছে কিনা দেখারও সময় নেই। একটা ঝোপের ভেতরে লুকানোর পর ফিরে তাকানোর অবকাশ হলো।

টামবারানের ভেতরে তোলপাড় করে ফেলেছে কুমিরটা। মূর্তি উল্টে ফেলছে। লেজের ঝাপটায় তাক থেকে ঝরঝর করে পড়ছে খুলিগুলো। বেরোনোর জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে ওটা। পথ খুঁজছে।

'দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে,' কিশোর বলল। 'তার আগেই ওটাকে পাকড়াও করতে না পারলে...'

'ওই দৈত্যটাকে? কি করে?' মুসা বলল।

'জাল দিয়ে।'

'একটা মিনিটও রাখবে না জাল। ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলবে।'

'হাঙর ধরার তারের জালটা ব্যবহার করা যেতে পারে।'

'হাঙরের লেজও নেই কুমিরের মত, নখও নেই। আটকানো যায়। কিন্তু কুমিরকে?'

'দেখতে দোষ কি?'

তা বটে। দেখতে দোষ কি? আর তর্ক করল না মুসা।

'দৌড়ে যাও। ক্যাপ্টেনকে গিয়ে বলো ওটা ছুঁড়ে দিক।'

টামবারানের ভেতরে ওদিকে নরক গুলজার করছে কুমিরটা। বেরোনোর পথ এখনও খুঁজে পায়নি।

সাংঘাতিক ভারি জাল। ক্যাপ্টেনের একার পক্ষে ওটা ছুঁড়ে দেয়া অসম্ভব। অবশেষে বারোজন লোকের সহায়তায় ওটা জাহাজ থেকে নামিয়ে টামবারানের দরজা পর্যন্ত বয়ে আনা হলো। ছড়িয়ে দেয়া হলো।

দরজাটা খুঁজে পেল কুমির। লেজের বাড়ি মেরে ভেঙে ফেলল কাঠ। হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসেই গুঁতো মারল জালে। জড়িয়ে ফেলল নিজেকে। ছাড়ানোর অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। আরও বেশি করে জড়িয়ে ফেলল নিজেকে। আনন্দে হৈ-হৈ করে চেঁচাতে লাগল কিশোর, মুসা আর রবিন। উত্তেজনায় একটা ব্যাপার লক্ষই করেনি, ফাঁসটা নেমে গেছে নিচে। হাঁ করতে পারছে কুমিরটা, পুরোটা নয় যদিও। তবে ওতেই যথেষ্ট। ধারাল দাঁত দিয়ে দশ সেকেন্ডে তার কেটে পথ বের করে ফেলল। মানুষকে আক্রমণ করতে এল না আর। পানির দিকে ছুটল।

আবার গিয়ে ঢুকল নলখাগড়ার ভেতরে। তার আগের জায়গায়।

দৃঢ় সংকল্প করে ফেলল দুই এনিমেল ক্যাচার, যে করেই হোক কুমিরটাকে ধরবেই। নদীর ভাটির দিকে নিরাপদ জায়গায় এসে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল। আলোচনা করতে লাগল, কি করে ধরা যায় জানোয়ারটাকে।

'চমৎকার একটা নমুনা,' কিশোর বলল আফসোস করে। 'চিড়িয়াখানার পরিচালকের খুব পছন্দ হত। কম করে হলেও সত্তর আশি হাজার ডলার পাওয়া যেত নিয়ে যেতে পারলে। ধরতেই হবে।'

'কিভাবে?' একই প্রশ্ন আরেকবার তুলল মুসা।

পাঁচ

অনেক আলোচনা করেও কোনই উপায় বের করতে পারল না ওরা। অলস ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল পানির দিকে। পানির নিচে আলোড়নটা প্রথম চোখে পড়ল মুসার।

'হচ্ছেটা কি ওখানে?'

কিশোরও তাকাল। নদীর তলায় একটা কার্পেট মত দেখা যাচ্ছে। নড়ছে কার্পেটটা। ডজনখানেক চোখও আছে!

'ফ্ল্যাটফিশ,' হঠাৎ চিনে ফেলল কিশোর।

'ফ্ল্যাটফিশ হতেই পারে না,' মুসা বলল। 'যদ্দূর জানি ওই ধরনের রে থাকে নোনা পানিতে। সাগরে।'

'পানিটা মুখে দিয়ে দেখো।'

আঙুল চুবিয়ে জিভে লাগাল মুসা। মুখ বাঁকিয়ে ফেলল। লবণাক্ত।

'জোয়ার-ভাটা হয় নদীতে, ভুলে গেছো,' কিশোর বলল। 'মনে নেই, নদীর মুখ দিয়ে সাগর থেকে ঢুকেছিলাম আমরা? দিনে দু'বার জোয়ার আসে নদীতে। মিষ্টি পানির সঙ্গে মিশে গেছে নোনা পানি, নোনা করে দিয়েছে। যে কুমিরটা ধরার চেষ্টা করছি আমরা ওটাও নোনা পানির জীব।' ফ্ল্যাটফিশটার দিকে আঙুল তুলল, 'কোন প্রজাতির রে ওটা, ধরতে পারলে বোঝা যাবে।'

পানি ওখানে কম। নেমে জীবটার লেজ ধরে টান দিল কিশোর। বিদ্যুৎ গতিতে শরীর ঘুরিয়ে ফেলল ওটা। গলার নিচটায় হাত লাগল তার। বৈদ্যুতিক শক খেল যেন সে। তারপর আর সাড়া নেই শরীরের, অবশ হয়ে গেল। স্বাভাবিক হতে কয়েক মিনিট সময় লাগল তার।

'নামফিশ।'

'নামফিশটা আবার কি?'

'ইলেকট্রিক রে। মাথার পেছনে রয়েছে ব্যাটারি। ভাগ্য ভাল, ওখানটায় হাত লাগেনি। তাহলে মারাও যেতে পারতাম।'

উজানের দিকে তাকাল মুসা। এখনও একই জায়াগায় নলখাগড়ার ভেতরে শুয়ে আছে কুমিরটা। 'আচ্ছা, কুমিররা কি এ সব মাছ খায়?'

'মনে হয়। কুমির অনেকটা উটপাখির মত। যা পায় গিলে ফেলে। সেজন্যেই ওগুলোর পেটে নানা রকম অদ্ভুত জিনিস পাওয়া যায়। মাছের হাড় আর মানুষের হাড় তো থাকেই, কারণ কুমির সব খায়। মেয়ে মানুষ খায়, ফলে অনেক ধরনের গহনা পাওয়া যায়! টিনের পাত্র, বাসন-পেয়ালা এমনকি পাথরও পাওয়া যায়।'

চকচক করছে রবিনের চোখ। 'একটা বুদ্ধি এসেছে। রে-টাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কুমিরকে খাইয়ে দিই না কেন? অবশ হয়ে যাবে না?'

কিশোর হাসল। ‘বুদ্ধিটা মন্দ না। একটাতে কিছু হবে না ওটার। তবে গোটা কয়েক গিলিয়ে দিতে পারলে কাজ হতেও পারে।’

এবার রে-টার লেজ ধরে টান দিল মুসা। ‘বাপরে, দুশো পাউন্ডের কম হবে না। এই ধরো না তোমরা, হাত লাগাও, আমি একা পারব না। ঘাড় আর গলার কাছে হাত দিয়ো না, সাবধান।’

টেনেটুনে মাছটাকে তুলে এনে কুমিরের কাছাকাছি ফেলল দু'জনে। তারপর দূরে সরে গিয়ে দেখতে লাগল কি করে।

কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে মাছটার দিকে তাকিয়ে রইল কুমির। তারপর হঠাৎ ঝাঁপ দিল সামনে। শক্তিশালী প্রপেলারের মত কাজ করছে লেজটা। ছুটে গিয়ে এক কামড়ে গিলে ফেলল রে-টাকে।

নামফিশের অভাব নেই। আরেকটা ধরে এনে কুমিরের সামনে রাখা হলো। সেটাও গিলে ফেলল কুমির। তারপর একের পর এক ধরে আনা হতে লাগল আর গেলানো হতে লাগল। আট নম্বর মাছটা খাওয়ার পর অলস হয়ে এল কুমিরটার নড়াচড়া। চোখ বুজে এল। মুখ বন্ধ। লেজ নাড়ছে না আর। ভারি একটা কাঠের মত নিথর হয়ে পড়ে রইল দানবীয় শরীরটা।

সাংঘাতিক একটা ঝুঁকি নিল দুই গোয়েন্দা। যে কোন সময় সাড় ফিরে আসতে পারে জেনেও ওটার লেজ ধরে টেনে নিয়ে চলল জাহাজের দিকে। ক্রেন নামানো হতে লাগল জাহাজে তোলার জন্যে।

এতই নিথর হয়ে আছে কুমিরটা, শঙ্কিত হলো মুসা, ‘মরে গেল না তো?’

‘এত সহজে? কুমিরের জান বড় শক্ত। দেখো না, পনেরো মিনিটেই নড়তে শুরু করবে। তার আগেই আটকে ফেলতে হবে।’

ক্রেন দিয়ে তুলে বিশাল একটা ট্যাংকে ঢোকানো হলো কুমিরটাকে। আধ ঘণ্টা পরেও যখন নড়ল না ওটা, কিশোরও ঘাবড়ে গেল।

আরও পনেরো মিনিট পর সাড় ফিরল কুমিরের শরীরে নিজেকে বন্দি অবস্থায় দেখে ভীষণ রেগে গেল। ট্যাংকের ভেতরে লেজের ঝাপটা মারতে শুরু করল। ইস্পাতের ট্যাংক, তা-ও ভয় হতে লাগল মুসার, ভেঙে না ফেলে।

কিশোর বলল, ‘ভয় নেই। বেশিক্ষণ এ রকম করবে না। আস্তে আস্তে অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবে। শান্ত হয়ে যাবে। কুমির ওরকমই। খাবার পেলেই খুশি থাকবে তখন, আর গোলমাল করবে না।’

ছয়

অস্ট্রেলিয়ান উপকূলের একটা জেলখানা। রোদ উঠেছে। কিন্তু কয়েদখানার পুরু দেয়াল ভেদ করে সে আলো পৌঁছুতে পারছে না ভেতরে। ছাত থেকে ঝুলছে অল্প পাওয়ারের একটা বালব।

গায়ে কাঁটা দিল বব অ্যাঞ্জেলের। বিশালদেহী শক্তিশালী মানুষ। বসে আছে দেয়ালে পিঠ দিয়ে। গায়ে জড়ানো কালো একটা কম্বলের দুই কোণ এমন ভাবে বেরিয়ে আছে দু'দিক থেকে মনে হয় মস্ত একটা শকুন ওত পেতেছে খরগোশ কিংবা ইঁদুরের ওপর ঝাঁপ দেয়ার জন্যে।

খাঁচার মত ঘরটার ভেতরে ইঁদুর একজনই আছে, নিরো। ঘুমন্ত। শকুনের নখের কাছেই। নিরো জেলে এসেছে ছুরি মারামারি করে। ছুরি খুব ভাল খেলে তার হাতে।

জেলের ভেতরে এখানে জীবনযাত্রা বড়ই বিষণ্ন। টেলিভিশন নেই। রেডিও নেই। পড়ার বই নেই। দেয়ালে ঝোলানো ছবি নেই। পাথরের ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসে শুধু ঠাণ্ডা ঘামের মত পানি। নাস্তা আসেনি এখনও। তবে সেটা আসার চেয়ে না আসাই ভাল। গেলা যায় না। সারাটা জীবন এভাবেই কাটাতে হবে এখানে থাকলে। কোন বৈচিত্র নেই।

এটা উচিত হয়নি, এতটা শাস্তি–ভাবল বব। অপরাধ সে কিছু করেছে, স্বীকার করে, তবে সেটা আমেরিকায়। এখানে এসে চারটে খুন করার চেষ্টা করছিল, তার মধ্যে মাত্র দুটো সফল হয়েছে। তার জন্যে এই শাস্তি? অন্যায়। একেবারেই অন্যায়।

তবু ভাল যে কথা বলার একজন লোক আছে। তার পাঁজরে লাথি মারল বব।

গুঙিয়ে উঠে চোখ মেলল নিরো। বুক ডলতে ডলতে বলল, 'কি হলো?'

'কিছু না,' শুয়োরের মত ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করল বব। 'গুড মর্নিং জানালাম।'

'চোখ মেলেই তোমার চেহারা দেখার কোন ইচ্ছে আমার নেই। অনেক ভাল ছিলাম, কাল সকালে তুমি এখানে আসার আগে। তোমার মত একটা লোককে কেন যে এখানে ঢোকাল!'

'হয়তো ভেবেছে চমৎকার একটা মানুষের সঙ্গ তোমার দরকার।'

'এই নরকে মরতে এলে কেন?'

'আচ্ছা লোক তো! কাগজও পড়ো না নাকি?' রসিকতা করল বব।

'কাগজ?' বিরক্তিতে মুখ বাঁকাল নিরো। 'ছ'মাস আগে এখানে এনে আমাকে ঢোকানোর পর কাগজ কি জিনিস ভুলেই গেছি।'

'তাই নাকি? বেশ বেশ। তাহলে তো আমার জীবনের অনেক কিছুই তোমার অজানা রয়ে গেছে। অথচ সবাই জানে।'

'আমি বাদে। বলো। শুনে কৃতার্থ হই।'

'বেশ। নিউ ইয়র্কে, গুণ্ডামি করতাম বলে জেলে ভরে দেয়া হলো আমাকে। বহু বছর পর বেরিয়ে আবার একটা দল গড়লাম কায়দা করে চাপ দিয়ে কিছু টাকা আদায় করতে চেয়েছিলাম। ভয় দেখিয়েছিলাম না দিলে শহরটা ধ্বংস করে দেব। আবার ধরে জেলে ভরল আমাকে। কত আর জেলে থাকা যায়? ভাল লাগল না। পালালাম একদিন। একটা জাহাজের খোলে ঢুকে চলে এলাম অস্ট্রেলিয়ায়। জাহাজ থেকে বেরিয়েই দুটো খুন করতে হলো, একটা টাকার জন্যে, আরেকটা আত্মরক্ষার তাগিদে। আরও দুটো করতে চেয়েছিলাম, পুলিশ, মরল না ব্যাটারা। ধরে ফেলা হলো আমাকে। তারপর এখানে না ভরে আর কোথায় ভরবে?'

'তাই তো। ঠিকই করেছে। এখানে ছাড়া আর কোথায় ভরবে?'

'তবে আমি ছাড়ব না ওদেরকে!' রাগে জ্বলে উঠল ববের চোখ।

'কাদেরকে?'

'তিন গোয়েন্দা। আমার বর্তমান অবস্থার জন্যে ওরাই দায়ী। শোধ আমি নেবই।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'আমি জেনেছি, নিউ গিনিতে এসেছে ছেলেগুলো। জন্তু-জানোয়ার ধরতে। আমি ছাড়ব না।'

'কি করে শোধ নেবে? কতদিন জেল হয়েছে তোমার?'

'যাবজ্জীবন।'

'তাহলে? পালানোর মতলব করোনি তো?'

'যত তাড়াতাড়ি পারব পালাব। তারপর রওনা হব নিউ গিনিতে। খুন করব। আমি জেলে বসে বসে পচব; আর ওরা আরামে ঘুরবে, তা হবে না।'

'কিন্তু বেরোবে কি করে এখান থেকে?'

'ব্যবস্থা একটা করবই। আমাকে আটকে রাখতে পারবে না।'

মুচকি হাসল নিরো। 'এক্কেবারে সময়মত এসেছ।'

ঝট করে তার দিকে তাকাল বব। তাকিয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। 'মানে?'

'না, কিছু না।'

কালো হয়ে গেল ববের মুখ। ধাঁ করে লাথি মেরে বসল নিরোর বুকে। গলা টিপে ধরে কঠিন কণ্ঠে বলল, 'জলদি বল্! নইলে শেষ করে ফেলব!'

ভয় দেখা দিল নিরোর চোখে। বুঝল মুখ ফসকে বলে ফেলে মস্ত ভুল করে ফেলেছে। এখন আর সব না বলে পারবে না। তাকে ছেড়ে দেয়ার ইশারা করল।

ছেড়ে দিল বব। 'বল্!'

গলা ডলল নিরো। বিড়বিড় করে বলল, 'মানুষ না, দৈত্য!'

'কি বললে?' ধমকে উঠল বব।

'বলছি, বলছি!' তাড়াতাড়ি গলায় হাত দিল নিরো। আরেকবার লোহার মত আঙুলগুলোর স্পর্শ পেতে চায় না। ফিসফিস করে বলল, 'কাল রাতে আমরা কয়েকজন পালাব। আমাদের সঙ্গে আসতে চাও?'

কুৎসিত হাসি ফুটল ববের মুখে। 'তাহলে কি বললাম এতক্ষণ? এটাই তো চাই আমি।'

'তাহলে মুখ বন্ধ রাখবে। টুঁ শব্দটি করবে না। কেউ যেন কিচ্ছু বুঝতে না পারে। কথা দাও।'

'দিলাম। কিন্তু বেরোবেটা কি করে?'

'পাশের সেলে কয়েক মাস ধরে খুঁড়ছে ওরা। ছোট একটা ছুরি জোগাড় করতে পেরেছিল, তাই দিয়ে। তবে এখন এত বড় করে ফেলেছে, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে যেতে পারবে।'

'গার্ড-টার্ড নেই?'

'আছে। কাছাকাছি মাত্র একজন। তার ব্যবস্থা করা যাবে। তারপর বাইরের দেয়ালের দিকে রওনা দেব। দেয়ালের দুই কোণে দুই টাওয়ারের মাথায় দু'জন গার্ড আছে। তবে আমাদের সেল থেকে অনেক দূর। পাঁচশো গজ হবে। ওরা কিছু

করার আগেই দেয়াল টপকাব আমরা।'

খুব সহজ, ভাবল, বব। বেশি সহজ। এত সহজে কাজ হয়ে যাবে আশা করতে পারল না সে। তবে সেকথা বলল না। বলল, 'দারুণ বুদ্ধি করছে। আমিও আছি তোমাদের সঙ্গে।'

'প্রতিজ্ঞা করো, হয় পালাব, নয় মরব।'

'করলাম। হয় পালাব, নয় মরব।' তবে মরার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ববের। সে শুধু পালাতেই চায়।

ভাবতে লাগল বব। যতই ভাবল, ততই দুর্বলতাগুলো পরিষ্কার হতে লাগল তার কাছে। যে লোকটা প্রথম বেরোবে, সে বেরিয়েই গার্ডের মুখোমুখি পড়বে। বাধা দেয়ার আগে হুইসেল বাজাবে। গার্ড খুন হয়ে যাওয়ার আগেই। তার বাঁশি বাজানো ঠেকানো যাবে না। সতর্ক হয়ে যাবে অন্য গার্ডেরা। ছুটে আসবে চারদিক থেকে। সার্চ লাইট এসে পড়বে আসামীদের ওপর। টাওয়ার থেকে মেশিনগানের গুলি বর্ষণ শুরু করবে ওখানকার গার্ডেরা। দেয়াল পেরোনোর চেষ্টা যে-ই করবে তখন, ঝাঁঝরা করে দেয়া হবে গুলিতে।

নাহ্, এটা কোন বুদ্ধিই হলো না। পালাতে গেলেই মরবে। ভাবতে ভাবতে শেষে এক চিলতে হাসি ফুটল তার মুখে।

খুশি হয়ে নিরো বলল, 'তাহলে বুদ্ধিটা পছন্দ হয়েছে তোমারও।'

'হয়েছে। চমৎকার প্ল্যান। কাজ হবেই।'

তবে সে তার নিজের প্ল্যান করছে মনে মনে তার একলার জন্যে, ওই বোকাগুলোর তাতে লাভ হবে না। জিজ্ঞেস করল, 'শুয়োরের মত এই খোঁয়াড়েই ভরে রাখবে নাকি সারাদিন?'

'না, তা রাখবে না। বের করবে গতর নাড়ানোর জন্যে।'

'গতর নাড়ানো?'

'চত্বরে একটু হাঁটাহাঁটি আরকি।'

'অ। কখন?'

'এগারোটার দিকে।'

এগারোটার সামান্য পরে তালা আর লোহার দরজা খোলার ঝনঝন শব্দ হলো। একজন গার্ড উঁকি দিয়ে হুকুম দিল, 'এই, বেরোও।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল নিরো। বব নড়লও না।

'এসো,' হাত নেড়ে তাকে ডাকল নিরো।

'তুমি যাও,' বব বলল। 'আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। যেতে পারব না।'

নিরোকে নিয়ে চলে গেল গার্ড। খানিক পরে আরেকজনকে টহল দিতে দেখে ডেকে বলল বব, 'আমি একটু ওয়ার্ডেনের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'তাই, না? ওয়ার্ডেন ব্যস্ত। তোমার মত ডাকাতের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর নেই।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল বব। একটা দৈত্য যেন। গার্ড তার চেয়ে অনেক খাটো। 'দেখো, আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বলবে না। তাহলে রিপোর্ট করব বলে দিলাম। জেলের আর দশটা সাধারণ কয়েদীর মত চোরছ্যাঁচড় নই আমি। অত্যন্ত জরুরী

একটা কথা বলার আছে আমার ওয়ার্ডেনকে। তাঁর জন্যে জরুরী, আমার নয়।'

'তা এত জরুরী কথাটা কি, শুনি?'

'তোমাকে বলা যাবে না। শুধু তাঁকেই। আর বেশি বকবক করতে পারছি না। মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমার। জলদি যাও।'

চলে গেল গার্ড। ফিরে এল কয়েক মিনিট পরে। ডাকল, 'বেরিয়ে এসো। ওয়ার্ডেন তোমাকে এক মিনিট সময় দিতে রাজি হয়েছেন।'

পথ দেখিয়ে ববকে জেল-প্রধানের কাছে নিয়ে এল গার্ড। ডেস্কের কাগজপত্রের স্তূপ, তার ওপাশে প্রায় হারিয়ে গেছেন ওয়ার্ডেন। আসামীর দিকে একবার তাকিয়ে ছোট্ট একটা শব্দ করেই আবার কাজে মন দিলেন। এক মিনিট কথা বলার জন্যে পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হলো ববকে। বসার জন্যে একটা চেয়ার খুঁজল।

হিসিয়ে উঠল গার্ড! 'দাঁড়িয়ে থাকো!' চলে গেল সে।

আরও দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হলো ববকে। তারপর মুখ তুলে তাকালেন ওয়ার্ডেন। এই প্রথম যেন দেখতে পেলেন ববকে। 'হ্যাঁ, বলো,' অধৈর্য কণ্ঠে বললেন তিনি। 'কি চাও? দেখছ না আমি ব্যস্ত? কেবল নালিশ নালিশ আর নালিশ! শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গেছি! খাবার খারাপ? গরম? সহ্য করোগে, যাও।'

'আমি নালিশ করতে আসিনি, স্যার।'

'সব এক রকম। নালিশ করতে আসিনি বলে এখনই ককাতে শুরু করবে। যাও, এক মিনিট সময় শেষ। বেরোও। তোমাদেরকে চিনি আমি।'

দাঁড়িয়ে রইল বব। শান্তকণ্ঠে বলল, 'অপমানিত হতে আসিনি আমি এখানে, স্যার।'

জ্বলে উঠল ওয়ার্ডেনের চোখ। 'বেশি কথা বললে ভাল হবে না। জলদি বলো কি জন্যে এসেছ?'

'বললামই তো নালিশ করতে আসিনি। বরং আপনার একটা উপকার করতে এসেছি।'

হেসে উঠলেন ওয়ার্ডেন। 'চমৎকার! কার মুখ দেখে যে আজ ঘুম ভেঙেছিল আমার। ব্যাটা এক কয়েদী এসেছে আমার উপকার করতে। নাম কি?'

'রেভারেন্ড বব অ্যাঞ্জেল।'

'ও, মনে পড়েছে তোমার কেস। আহারে, কি আমার পাদ্রী। নাম্বার ওয়ান খুনী। নিশ্চয় ধর্মের কথা শোনাতে এসেছ। বেরোও। দরজার কাছেই একজন গার্ড পাবে। সে তোমাকে তোমার সেলে নিয়ে যাবে।'

'তা তো যাবই। তবে যাবার আগে আপনার টেবিলের ওপরে একটা বোমা ফেলে যেতে চাই।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ওয়ার্ডেন। পিছিয়ে গেলেন এক পা। ভয়ে ভয়ে তাকালেন ববের দিকে। বোমাটা কোথায় দেখতে চাইলেন।

হেসে ফেলল বব। 'ওই বোমা নয়। কথার বোমা। আমি বলতে এসেছি, পালানোর চেষ্টায় আছে কয়েকজন কয়েদী। ওরা সফল হলে হয়তো চাকরিটাই

খোয়াবেন আপনি। ভাল একজন নাগরিক আর ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টান হিসেবে আপনাকে হুঁশিয়ার করে দেয়াটা দায়িত্ব মনে করলাম, তাই এসেছি।'

হঠাৎ বদলে গেল ওয়ার্ডেনের আচরণ। মিষ্টি হেসে বললেন, 'আগে বলতে হয়। আমাকে তাহলে একথা বলতে এসেছ?'

'হ্যাঁ, এসেছিলাম, কিন্তু আপনি শুনতে চাইলেন না। বরং অপমান করলেন। চলি।' ঘুরে দরজার দিকে রওনা হলো বব।

'এই শোনো শোনো, ভুল করেছি আমি। তোমাকে চিনতে পারিনি।'

'ঠিক আছে, যান, মাপ করে দিলাম।'

'তুমি ঠিকই বলেছ, অঘটনটা ঘটে গেলে চাকরি খোয়াতে হতো আমাকে। আমার অনেক বড় উপকারই করতে এসেছ তুমি। তা কখন ঘটছে ঘটনাটা?'

'কাল রাতে।'

'ক'জন?'

'তা বলতে পারব না। তবে বেশ কয়েকজন মনে হয়। আমাকেও পালানোর দাওয়াত করা হয়েছে।'

'কে করেছে?'

'একজন চমৎকার ভদ্রলোক। আস্ত একটা ইঁদুর। আমার সেল-মেট। নিরো।'

'কি করে বেরোবে?'

'সেলের নিচ দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বের করে নিয়ে গেছে চত্বরে। বাইরে বেরিয়েই আগে ওখানকার গার্ডকে খুন করবে। তারপর দেয়াল টপকে বেরিয়ে যাবে।'

'হুঁ। তাহলে তোমাকেও দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। সেটা না রেখে তুমি এসেছ আমাকে বলে দিতে। যাবজ্জীবন হয়েছে তোমার। ইচ্ছে করলে পালিয়ে যেতে পারতে কালকে। তবে না গিয়ে ভাল করেছ, ঠিক কাজটাই করেছ। একজন ভাল মানুষের কাজ করেছ।'

'আমি শুধু আমার দায়িত্ব পালন করলাম, লজ্জিত কণ্ঠে বলল বব।

'দায়িত্বের কথাটা যদি এখানে আসার আগে মনে থাকত, তাহলে আর আসতেই হত না।'

'তা ঠিকই বলেছেন,' অনুশোচনায় যেন দগ্ধ হচ্ছে ববের অন্তর। 'আগে ভাবিনি, শয়তান ভর করেছিল মাথায়। জেলে ঢোকার পর থেকেই ভাবছি। অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছি এতদিন। শয়তানের প্ররোচনায়। আর করতে রাজি নই। আসলে আমার চলা উচিত ছিল বাইবেলের নির্দেশমত, এখন থেকে তা-ই চলব। ফিরে যাব ঈশ্বরের পায়ের কাছে।'

ববের অভিনয়ে একেবারে মজে গেলেন ওয়ার্ডেন লোকটা যে ভাল হতে চায়, তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই দিয়েছে। পালানোর লোভ সংবরণ করে তাঁকে খবর দিতে এসেছে। 'বেরোক সুড়ঙ্গ থেকে। তারপর দেখবে কারা দাঁড়িয়ে আছে ওদের অপেক্ষায়। তোমার কথা যদি ঠিক হয়, তোমাকে একজন ট্রাস্টি করব আমি।'

চোখ মিটমিট করল বব। যেন অশ্রু ঠেকানোর চেষ্টা করছে। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, ওয়ার্ডেন। আমি আপনাকে বলেছি, কিছু চাইতে কিংবা নালিশ জানাতে

আসিনি। তারপরেও একটা জিনিস চাইব।'

'কী?'

'একটা বাইবেল। সেলের ভেতরে ওটাই হবে আমার একমাত্র ভরসা এবং সঙ্গী।'

নাহ্, লোকটা সত্যি সত্যি বদলে গেছে। বুককেসের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। ছোট এককপি বাইবেল বের করে আনলেন।

এমন ভঙ্গিতে হাত পেতে নিল বব, যেন অমূল্য কিছু নিচ্ছে। 'আপনি বুঝবেন না, ওয়ার্ডেন, কি জিনিস আমাকে দিলেন!' শেষ দিকে সামান্য কেঁপে উঠল তার গলা। বাইবেল বুকে চেপে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে।

করিডর ধরে গার্ডের সঙ্গে চলতে চলতে হাসিতে ফেটে পড়ল সে। দারুণ, ওহ্, দারুণ হয়েছে! তার ভাগ্য বলতে হবে। আসামীরা পালাতে পারবে না কিছুতেই এখন। তবে তার যা লাভ হওয়ার হয়ে গেল। তাকে ট্রাস্টি করবেন ওয়ার্ডেন। বিশ্বাস করবেন। জেলের ভেতরে যেখানে খুশি যেতে আসতে পারবে এখন সে। পালানোর সুযোগ করে নিতে অসুবিধে হবে না।

ফিরে এসে নিরো দেখল, দেয়ালে হেলান দিয়ে ঝিম মেরে রয়েছে বব। সহানুভূতির সুরে বলল, 'ভেবো না। কাল বেরিয়ে যেতে পারলেই অনেকখানি সেরে উঠবে তুমি। মন ভাল হয়ে যাবে।'

অনেক কষ্টে যেন মুখ তুলল বব। 'ভাল বুদ্ধি বের করেছ। আমাকে যে দলে নিয়েছ এজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। নিউ গিনির দিকে খুব শীঘ্রি রওনা হতে পারব আমি।'

সাত

একটা রাত গেল, একটা দিন গেল। তারপর এল জেল থেকে পালানোর সময়।

'অন্যদিনের মতই রাতের খাবার খেতে যাব আমরা,' নিরো বলল। 'তবে এই সেলে আর ফিরব না। পাশের সেল দিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ব।'

তার কথা যেন শুনতেই পায়নি বব। শরীর মোচড়াচ্ছে আর গোঙাচ্ছে।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল নিরো।

'প্রচণ্ড পেটব্যথা। অ্যাপেনডিসাইটিস হয়ে গেল কিনা কে জানে। এতবড় একটা সুযোগ পেয়েও হারালাম। তোমরা যাও। আমি বোধহয় আর পারলাম না।'

'খাওয়ার পর ঠিক হয়ে যেতে পারে। এসো।'

'না, আমি খেতেই পারব না। উহ্, বাবারে! নড়তেই পারছি না! যাও, বন্ধু, যাও, তোমার কথা মনে থাকবে আমার। অনেক ধন্যবাদ। আমার কপালে কষ্ট আছে। তুমি আর কি করবে।'

নিরো বেরিয়ে যেতেই চুপ হয়ে গেল বব। অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল

কখন ঘটে ঘটনা। লোকগুলো খাবার পর এসে পালানোর চেষ্টা করবে তো?

রাতের খাবারের পর কয়েদীরা যার যার সেলে ফিরে যায়, এই স্বাধীনতাটুকু আছে। তখন আর ওদের সঙ্গে গার্ড থাকে না। ইচ্ছে করলে কিছুক্ষণ সোশ্যাল রুমেও কাটাতে পারে। অনেক পরে এসে সেলের দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে যায় গার্ড।

বেশ কিছুক্ষণ পর করিডরে পায়ের শব্দ শুনতে পেল বব। ফিরে আসছে কয়েদীরা। সে জানে, ওদের অনেকেই আর নিজের সেলে ফিরে যাবে না। যেটাতে সুড়ঙ্গ খোঁড়া হয়েছে সেটাতে ঢুকবে।

প্রায় দম বন্ধ করে রইল বব। কান পেতে শুনতে লাগল। সেলের পুরু দেয়ালের জন্যে পাশের সেলে কি হচ্ছে তা-ও কানে আসছে না। পরে সব জানতে পারল সে। সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়েছিল কয়েদীরা। একজন গার্ডকেও চত্বরে দেখতে পায়নি। এতে বরং খুশিই হয়েছিল তারা, যদিও কিছুটা অবাক হয়েছিল। সব যখন বেরোল সুড়ঙ্গ থেকে, চারপাশ থেকে ছুটে এল লুকিয়ে থাকা গার্ডেরা। ঘিরে ফেলল। কয়েকজন কয়েদী দৌড় দিল দেয়ালের দিকে। তাদের ওপর এসে পড়ল সার্চলাইটের আলো। দেয়াল টপকে পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরল তিনজন। বাকিদেরকে ধরে বকরির মত খেদিয়ে এনে ভরা হলো একটা ঘরে। পরে সলিটারিতে পাঠানো হবে।

আধঘণ্টা পরে একজন গার্ড এসে উঁকি দিল ববের ঘরের শিকের ফাঁক দিয়ে। সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিয়ে তালা লাগিয়ে দিল।

'নিরো কোথায়?' জানতে চাইল বব।

'মারা গেছে।' বলে চলে গেল গার্ড।

মুচকি হাসল বব। যাক, একটা কাজ সারা হলো। এই সেলটা এখন শুধু তার একলার। কেউ বিরক্ত করতে আসবে না। নিরো আর তার বোকা দোস্তগুলো বোকামির সাজা পেয়েছে। পালাতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলেছে, ধরা পড়েছে। কিন্তু বব গোলমালও করবে না, ধরাও পড়বে না।

সকালে তাকে অফিসে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো। আগের বার যখন এসেছিল, তাকে দেখেও দেখেননি ওয়ার্ডেন। এইবার ঢোকামাত্র স্বাগত জানালেন। উঠে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। ববের হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন, 'মিস্টার অ্যাঞ্জেল, আমার আর এই জেলখানার জন্যে যা করলেন আপনি, তার জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করতে চাই না। আমার বিশ্বাস, সেল-মেটদের পালানোর খবরটা বলতেও অনেক কষ্ট হয়েছে আপনার, ওদের জন্যে, কিন্তু উচিত কাজটা করতে কিছুতেই পিছপা হননি আপনি।'

চোখে পানি এসে গেল ববের। হাত দিয়ে মুছতে মুছতে বলল, 'আর বলবেন না। ওদের মৃত্যুর সংবাদ শুনে কি যে কাতর হয়ে গেছে মনটা। তখন থেকেই নিরো আর তার দুই সঙ্গীর জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি। ঈশ্বর ওদের আত্মার শান্তি করুন।'

'তা তো করবেনই, আপনি যে রেভারেন্ড। কোন পুরস্কারই আপনি চাননি আমার কাছে, তবু আপনাকে পুরস্কৃত করতে চাই।'

'না না,' জোর প্রতিবাদ করল বব। 'আমি কিচ্ছু চাই না। লোকগুলো মারা গেল আমার কারণে, এই দুঃখই ভুলতে পারব না। আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি শুধু, এর জন্যে পুরস্কার নিতে পারব না।'

হাসলেন ওয়ার্ডেন। 'ঠিক এই কথাই আশা করেছিলাম আমি। আপনার মত একজন ভাল মানুষকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে গর্বই হচ্ছে আমার। আপনাকে বিশ্বাস করা যায় এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছেন আপনি। খোঁয়াড়ে বন্দি হয়ে থাকার আর কোন প্রয়োজন নেই আপনার। অফিসের পাশের ঘরটা আপনার জন্যে ঠিক করে দিয়েছি আমি। শুধু যে ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করবেন, তা নয়, আমার পার্সোনাল অ্যাসিসটেন্ট বানিয়ে নিলাম আমি আপনাকে। আপনি একজন কয়েদী, এ কথাটা মনে রাখতেই হচ্ছে আমাকে। তবে অন্য সব কয়েদীর মত ব্যবহার করা হবে না আপনার সঙ্গে। অনেকখানি স্বাধীনতা দেয়া হবে। তেমন প্রয়োজনে আপনাকে শহরেও পাঠাব আমি। জানি, ফিরে আসবেনই। পালানোর এতবড় সুযোগ যে লোক হাসিমুখে ছেড়ে দিতে পারে তাকে বিশ্বাস করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই আমার। এখন আসুন, আপনার ঘর দেখিয়ে দিই।'

একটা দরজা খুলে দিলেন তিনি। সরে দাঁড়ালেন ববের ঢোকার জন্যে। ঘরটা অফিসের চেয়ে ছোট, তবে ববের সেলের চেয়ে প্রায় তিনগুণ বড়। জানালায় শিক নেই। দেয়ালে ছবি ঝোলানো রয়েছে, মেঝেতে কার্পেট। ইলেকট্রিক হীটার আছে, একটা রেডিও আছে, আর আছে কফির জন্যে একটা হট-প্লেট। ইজি চেয়ার আছে। বেশ বড় একটা ডেস্কের ওপাশে রয়েছে সুইভেল চেয়ার। ঘরটা ববের অফিস। পাশে আরও একটা ঘর। সেটা বেডরুম। লাগোয়া বেশ সুন্দর একটা বাথরুম আছে।

'পছন্দ হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন ওয়ার্ডেন।

'আমার জন্যে অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে,' গম্ভীর হয়ে বলল বব। 'আমি এ সব চাই না।'

ফুলে উঠলেন ওয়ার্ডেন। এই লোকটার আচরণ ক্রমেই মুগ্ধ করছে তাঁকে। 'আর কিছু করতে হবে কিনা আপনার জন্যে তা-ই বলুন।'

'আরও? এর বেশি আরও? তবে হ্যাঁ, একটা কাজ করতে পারেন।'

'কি?' আগ্রহী হয়ে জানতে চাইলেন ওয়ার্ডেন।

'আমাকে এখানে পাদ্রীর কাজ করার সুযোগ দিলে বাধিত হব। আমার সঙ্গী আসামীদেরকে আমি ঈশ্বরের বাণী শোনাতে চাই। তাদের মনে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাতে চাই। আমার বিশ্বাস,' বাইবেলটা বুকে চেপে ধরল বব। 'এর ভেতরের ভাল ভাল কথা শুনলে ওরাও অনেক ভাল হয়ে যাবে।'

'অবশ্যই শোনাবেন,' অনুমতি দিয়ে দিলেন বব। 'ওই চোর আর ডাকাতগুলো যদি কিছুটা ভাল হয়, আমার ক্ষতি কি?'

সন্তুষ্ট হয়ে অফিসে রওনা হতে গিয়ে ঘুরলেন ওয়ার্ডেন। বললেন, 'ও, হ্যাঁ, আরেকটা কথা। আপনার ডেস্কে একটা বোতাম লাগানো রয়েছে। টিপলেই একজন গার্ড আসবে। আপনার যে কোন আদেশ পালন করার নির্দেশ দিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে।'

দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন ওয়ার্ডেন।

সুইভেল চেয়ারে গিয়ে বসল বব। বোতাম টিপল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল গার্ড।

'আমার নাস্তা,' বব বলল।

'কফি আর রোলস?'

'না। রুটি আর পানি।'

হাঁ হয়ে গেল গার্ড। একটা মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে রইল কয়েদীর দিকে। তারপর বেরিয়ে এল। তার ওপর আদেশ রয়েছে ওয়ার্ডেনের, এই কয়েদী যা চায় তাই দিতে হবে।

কুৎসিত মুখে চওড়া হাসি ফুটিয়ে আরাম করে চেয়ারে হেলান দিল বব। নিজের চালাকির প্রশংসায় নিজেই পঞ্চমুখ হলো মনে মনে। আসল কাজটা হয়ে গেছে। এইবার শুধু সুযোগের প্রতীক্ষা।

শুকনো রুটি কোনমতে চিবিয়ে পানি দিয়ে গিলল বব। বেরুতে হলে এ ভাবে আরও কিছুদিন কষ্ট করতে হবে তাকে। নিরোকে না পেলে এখানে পৌঁছতে পারত না সে। নিরো তাকে সাহায্য করতে চেয়ে মস্ত ভুল করেছিল। জীবন দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। তাতে কিছুই এসে যায় না ববের। ওয়ার্ডেনকে জানিয়ে দিয়ে ঠিক কাজটাই করেছে। নিজে বাঁচলে বাপের নাম। নিরো মরলেই তার কি, তার সঙ্গীরা সলিটারিতে গেলেই বা তার কি?

সলিটারি হলো একটা জীবন্ত কবরখানা। ওখানে যাদেরকে পাঠানো হয়, তারা কোন সঙ্গীর মুখ দেখে না, কারও সঙ্গে কথা বলতে পারে না, যে ঘরে রাখা হয় সেটা একজন মানুষের জায়গা হয় ওরকম একটা বাক্সের সমান, শুধু রুটি আর পানি খেয়ে বাঁচতে হয়। পালানোর চেষ্টা করা একটা সাংঘাতিক অপরাধ। ওরকম অপরাধীদের কোন সুযোগ সুবিধা দেয়া হয় না। এই যন্ত্রণা থেকে বাঁচার একটাই উপায়। পাষাণ দেয়ালে বাড়ি মেরে মাথা ফাটিয়ে আত্মহত্যা করা।

এ সব ভাবনা একটুও বিচলিত করল না ববকে। হেলান দিয়ে আয়েশ করছে চেয়ারে। তবে যত আরামেই থাকুক, সে এখনও কয়েদী। আর তার শত্রুরা রয়েছে মুক্ত। আরামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হোক না সেটা নিউ গিনিতে। দাঁতে দাঁত চেপে আরেকবার প্রতিজ্ঞা করল বব, যে করেই হোক, বেরিয়ে যাবেই সে। প্রতিশোধ নেবেই। তিন গোয়েন্দাকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত শান্তি নেই তার।

দু'দিন পরে ওয়ার্ডেন ববকে ডেকে পাঠালেন। শহরে গিয়ে কয়েদীদের রেশন নিয়ে আসতে বললেন।

চোখ পড়ল ববের পোশাকের ওপর। 'ওসব কয়েদীর পোশাক খুলে ফেলুন তো,' বললেন তিনি। 'আমার এক সেট কাপড় দিচ্ছি। দেখুন, লাগে কিনা ছোটই হবে।' ববের বিশাল কাঠামোর ওপর চোখ বোলালেন তিনি নিজেও বেশ বড় শরীরের মানুষ, তবে ববের চেয়ে ছোট, কোন সন্দেহ নেই। 'এই যে লিস্ট। আর এই যে টাকা। পাঁচশো লোকের খাবার আনতে হবে।'

অনীহা দেখিয়ে বলল বব, 'এত বড় দায়িত্ব দিচ্ছেন আমাকে?'

'আপনি আমার অ্যাসিসটেন্ট।'

'তা হোক। টাকাটা আমাকে নিতে বলবেন না, প্লীজ। লোভ জাগানোর মত কোন জিনিসেই আর হাত ছোঁয়াতে চাই না আমি। চিঠি লিখে দিন, জিনিস নিয়ে আসি। বিল দিয়ে টাকা নিয়ে যাক ওরা।'

'হাত ছোঁয়ালেও কোনদিনই আর খারাপ হবেন না আপনি,' হেসে বললেন ওয়ার্ডেন। 'টাকা নিয়ে যান। বাকিতে কেনার নিয়ম নেই জেলখানার।' এক টুকরো কাগজ ববের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আর এটা আপনার পাস। গেটে দেখালেই গার্ডেরা ছেড়ে দেবে। জিনিস কিনতে যত দেরি হয় হোক। তাড়াহুড়া করবেন না। দরকার হলে একটু আনন্দও করে আসতে পারেন। এই যেমন সিনেমা দেখা...'

'তওবা! তওবা!' আধ হাত জিভ বের করে ফেলল বব। দাঁতে কাটল। শিউরে উঠল। 'ওরিব্বাবা, আর বলবেন না! মাপ চাই! যে জীবন ফেলে এসেছি, আর কোনদিন তাতে ঢুকতে চাই না। ঠিক আছে, দিন, কি কি আনতে হবে। চট করে গিয়ে নিয়ে আসি। বাইরের চেয়ে এখন ঘরে বসে থাকতেই ভাল লাগে আমার। বাইবেল আর ঈশ্বরে যে এত আনন্দ, আগে যদি জানতাম!'

সেদিন বাজারে গেল আর এল বব। জেল থেকে বেরোতেই অবশ্য পেছনে যে চর লেগেছে টের পেয়েছে। ওয়ার্ডেন লাগিয়েছেন, বুঝতে অসুবিধে হয়নি তার। তাকে বিশ্বাস করা যায় কিনা দেখতে চেয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস পুরোপুরি অর্জন করল সে।

আট

কয়েক দিন পর এল পালানোর সুযোগ। ববকে আবার বাজারে যেতে বললেন ওয়ার্ডেন। গেটে পাস দেখিয়ে লম্বা লম্বা পায়ে জেলখানার সীমানা থেকে বেরিয়ে এল বব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি নেয়ার ভুলটা করল না। আধ মাইল পায়ে হেঁটে এগোল। কেউ অনুসরণ করছে না এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিল। তারপর একটা ব্যস্ত চৌরাস্তার কাছে এসে ট্যাক্সি নিল। এয়ারপোর্টে যেতে বলল। আরাম করে হেলান দিয়ে বসল সীটে। পকেটে হাত বোলাল একবার। ফুলে রয়েছে নোটের বান্ডিল।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে ঢুকে গেল সে। সোজা চলে এল কাউন্টারে। জিজ্ঞেস করল, 'পোর্ট মর্সবির প্লেন কখন?'

ডিপারচার বোর্ডের দিকে তাকিয়ে ক্লার্ক জানাল, 'পনেরো মিনিটের মধ্যেই ছাড়বে।'

'ফার্স্ট ক্লাসের একটা টিকেট, প্লীজ।'

'নাম?'

'হামবার ডাবলিন।'

বানান করে করে লিখল ক্লার্ক। 'লাগেজ?'

'নেই।'

মুখ তুলল ক্লার্ক। অবাক হয়েছে। বব বুঝতে পারল, ব্যাখ্যা দরকার। কিছুটা কৈফিয়তের সুরেই বলল, 'আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'ও। ভাল।' টিকেটের দাম জানাল ক্লার্ক। মিটিয়ে দিল বব। গুনে নিয়ে টিকেট দিয়ে ক্লার্ক বলল, 'প্লেনে লোক ওঠানো শুরু হয়েছে। ছ'নম্বর গেট দিয়ে চলে যান।'

গেট পেরিয়ে ওপাশে এসে হেঁটে চলল বব। ফিরে তাকিয়ে দেখল মেইন গেটের কাছে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে ট্যাক্সি চালক, তার ফেরার। একটা মুহূর্ত সময় নষ্ট করল না বব। দ্রুত চত্বর পেরিয়ে এসে উঠে পড়ল বিমানে।

জানালার ধারে সীট পড়েছে ববের। তাকিয়ে দেখল, আর ধৈর্য রাখতে পারেনি ট্যাক্সি চালক। ভেতরে ঢোকার জন্যে তর্ক করছে গেটম্যানের সঙ্গে। কিন্তু টিকেট ছাড়া তাকে কিছুতেই ঢুকতে দিতে রাজি নয় গেটম্যান। মুখ তুলে তাকিয়ে ববকে দেখতে পেল ড্রাইভার। ঘুসি দেখাল। মুচকি হেসে হাত নাড়ল বব।

আকাশে উড়ল বিমান। মুখ ঘোরাল উত্তরে, গ্রেট ব্যারিয়ার রীফের দিকে। অনেকগুলো দ্বীপ পেরিয়ে এল বিমান। তারপর যেন মেঘের ভেতর থেকে উদয় হলো বিশাল পর্বতের চূড়া। নিউ গিনি। উপকূলের পোর্ট মর্সবি শহরের বিমান ঘাঁটিতে ল্যান্ড করতে চলেছে বিমান। বব বুঝতে পারছে, তার দেরি দেখে এতক্ষণে নিশ্চয় ভাবনা শুরু হয়ে গেছে ওয়ার্ডেনের। আরেকটু পরেই পুলিশকে সতর্ক করে দেবেন তিনি। খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যাবে।

মর্সবি শহরটা চেনে বব। আগে এসেছিল। পুলিশের ভয় না থাকলে সোজা হোটেলে চলে যেত সে। এখন সেটা উচিত হবে না। সকালের আগেই হোটেলে হানা দেবে পুলিশ।

বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল বব।

'কোন হোটেলে?' জানতে চাইল ড্রাইভার।

'হোটেল নয়। বন্দরে।'

মেরিনার একধারে অসংখ্য ছোট ছোট জলযান নোঙর করে আছে। চার্টার অফিসে এসে ঢুকল বব। 'একটা স্পীড বোট চাই। হাই পাওয়ারড ইঞ্জিন। কেবিন থাকতে হবে।'

'ওই যে, ওটা হলে কেমন হয়?' হাত তুলে দেখাল ক্লার্ক।

'দেখতে তো ভালই। স্পীড কত?'

'বিশ নট।'

'ট্যাংক বড় তো?'

'কত দূর যাবেন?'

'ট্রোব্রিয়ান্ড আইল্যান্ড,' মিথ্যে কথা বলল বব।

'যেতে পারবেন। ট্যাংক ভরা আছে।'

'ভাড়া কত?'

'রোজ ষাট ডলার।'

'ফেয়ার এনাফ। তবে আগে একবার চালিয়ে দেখতে চাই। সম্ভব?'

'আধঘণ্টা সময় দিতে পারি। তাতে যদি হয় নিয়ে যেতে পারেন। কি নাম আপনার?'

'রেভারেন্ড হামবার ডাবলিন।'

'ও, আপনি পাদ্রী,' শ্রদ্ধা দেখা দিল ক্লার্কের চোখে। 'তাহলে তো কথাই নেই। নিয়ে যান, ফাদার। যতক্ষণ খুশি চালিয়ে দেখুন। পছন্দ হলে তবেই নেবেন।'

বোটে উঠল বব। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। যানটাকে বের করে নিয়ে এল জেটির বাইরে। সরে চলে এল অনেক দূর। যখন মনে করল ক্লার্ক আর দেখতে পাবে না তখন মুখ ঘুরিয়ে চলতে শুরু করল ট্রোব্রিয়ান্ড আইল্যান্ডের ঠিক উল্টো দিকে। নিউ গিনির উপকূল ধরে কোরাল সাগর দিয়ে।

এখন তার একমাত্র চিন্তা, অস্ট্রেলিয়ান পুলিশ-পেট্রলের আওতার বাইরে চলে যাওয়া। নিউ গিনির এই পুব অংশটা অস্ট্রেলিয়ান সরকারের দখলে। পশ্চিম অংশ ইন্দোনেশিয়ার। ওখানে ঢুকে পড়তে পারলে আর ভাবনা নেই। এতই বুনো জায়গাটা, ইন্দোনেশিয়ান পুলিশ আসেই না। আর অস্ট্রেলিয়ান পুলিশেরও ঢোকা ওখানে বেআইনী।

সে নিশ্চিত, তিন গোয়েন্দারা ওদিকেই গেছে। কারণ ওরা নানারকম জীব-জন্তু ধরতে চায়। ওসব জানোয়ার ওদিকটাতেই বেশি। তা ছাড়া আমেরিকা থেকে বেরোনোর আগে খোঁজখবর করে যা বুঝেছে, তাতে কিশোর, মুসা আর রবিনের ওদিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অস্ট্রেলিয়ার এই অঞ্চলে যৌবনে বহুদিন কাটিয়ে গেছে বব। ভালমতই চেনে এদিকের অঞ্চল। স্থানীয় আদিবাসীদের ভাষাও জানে। বিশ মাইল গতিতে বাইশ ঘণ্টার মত লাগবে তার ইন্দোনেশিয়ার সীমান্তে পৌঁছতে। তারমানে সেদিন সারারাত চলতে হবে, পরদিনও প্রায় সারাদিন। ঘুম এখন তার জন্যে হারাম।

আরেকটা ব্যাপার। খাবার। বোটে নেই। বাইশ ঘণ্টা না খেয়ে থাকতে হবে তাকে। ইন্দোনেশিয়ায় ঢুকে আদিবাসীদের কোন গ্রামে ঢুকতে পারলে তারপর খাবার জুটবে কপালে। গ্রামে ঢোকাটা ওখানে বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। জংলীরা অনেক জায়গায়ই নরখাদক রয়ে গেছে আজও। অস্ট্রেলিয়া আর ইন্দোনেশিয়ান সরকার মিলে অনেক চেষ্টা করেও পুরোপুরি ঠেকাতে পারেনি। কাজেই খাবার জোগাড় করতে গিয়ে নিজেই খাবার হয়ে যাওয়ার ভয় আছে। তবে একটা ভরসা, তাকে খাবার না-ও বানাতে পারে। কারণ সে বয়স্ক। মাংস তেমন ভাল হবে না। শ্বেতাঙ্গরা বেশি নোনতা। তার ওপর রয়েছে তামাকের কড়া গন্ধ। খুব একটা পছন্দ করে না জংলীরা, জানা আছে তার। তবু, বলা যায় না, বেশি ক্ষুধার্ত হয়ে থাকে যদি ওরা···

রাতে ঘুম তাড়ানো একটা মহাসমস্যা হয়ে দাঁড়াল তার জন্যে। তবু, সজাগ রইল। বোট চালাল একনাগাড়ে। দুপুরের দিকে ঢুকল টোরেস স্ট্রেইটে। থার্সডে আইল্যান্ড পেরিয়ে এল। বিকেলের দিকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। পৌঁছে গেছে অ্যারাফুরা সাগরে। এটা ইন্দোনেশিয়ার সীমানা। মেরাউকে তেল নেয়ার জন্যে

থামল সে। তবে খাবার কিনে আনার সময় নেই। অস্ট্রেলিয়ার সীমান্তের বেশি কাছাকাছি রয়েছে। বলা যায় না, ইন্দোনেশিয়ান পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে এখানে হানা দিয়ে বসতে পারে অস্ট্রেলিয়ান পুলিশ। তেল ভরেই বন্দর থেকে পালাতে হলো ববকে।

আরেকটু এগিয়ে অনুমান করল, এখানে আশেপাশেই কোথাও রয়েছে কিশোররা। অনেক নদী আছে এখানে। ওগুলোরই কোনওটা ধরে ঢুকেছে। ধীরে ধীরে বোট চালাল সে। প্রথম যে গ্রামটা চোখে পড়বে তাতেই নামবে। বিয়ান পেরিয়ে এসে একটা ছোট গ্রাম দেখতে পেল। ওখানকার গ্রামবাসীরা তার সাদা চামড়া আর বোটের দিকে এতই কৌতূহলী চোখে তাকাতে লাগল, জিজ্ঞেস না করেই বুঝতে পারল ওখানে আসেনি তিন গোয়েন্দা। তাকে ওরা দেবতা ভেবে বসল। কাজেই ববও এমন আচরণ করতে লাগল যেন সে সত্যিই দেবতা। ওদেরকে বোঝাল দেবতারও খাবার দরকার হয়। ওদের খাবার আনার নির্দেশ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে খাবার নিয়ে হাজির হলো ওরা। খাবারের চেহারা দেখেই খিদে নষ্ট হয়ে গেল ববের। ধোঁয়ায় সেদ্ধ করা ঘাসফড়িং। রক্তে ভিজিয়ে সেদ্ধ করা শুঁয়াপোকা। পচা গাছের গুঁড়িতে এক রকম কিলবিলে সাদা পোকা পাওয়া যায়, কয়লায় ঝলসে এনেছে ওগুলোও। রক্তের যে ঝোলটা করা হয়েছে, সেটা মানুষের না জানোয়ারে তা-ও বোঝার উপায় নেই।

তবু খিদে হলো খিদে। খালি পেটে থাকার চেয়ে ওসবই খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল বব। চোখ বন্ধ করে কোনমতে গিলে নিল নদীর পানি দিয়ে। জেল থেকে বেরোনোর পর এই প্রথম তার মনে হলো, যতটা ভেবেছে আসলে ততটা বুদ্ধিমান বোধহয় নয় সে। তাহলে জেলখানায়ই থাকত, আর ইচ্ছেমত খাবার খেতে পারত। অখাদ্য কুখাদ্য এই তো সবে শুরু, আরও কত গিলতে হবে কে জানে।

এখানে থাকার আর কোন মানে নেই। দেবতা চলে যাচ্ছে দেখে তাকে ঠেকাতে উদ্যত হলো লোকেরা। তাদেরকে ভজিয়েভাজিয়ে অনেক কষ্টে এসে বোটে উঠল সে। তারপর আর একটা মুহূর্তও ওখানে নয়। সরে চলে এল যত দ্রুত পারল।

রাতে নদীর মাঝখানে বোট নোঙর করে ঘুমাল। ভোরের দিকে মুষল ধারে বৃষ্টি শুরু হলো। উঠে পড়ল বব। আবার রওনা হলো। নদীর তীরে যত গ্রাম দেখল সবগুলোতে থেমে কয়েকজন বিদেশীর খোঁজ নিল। পাওয়া গেল না। যতক্ষণ না নদীর পাড়ে একজন ওঝার সঙ্গে দেখা হলো।

আদিবাসীদের ভাষায় জিজ্ঞেস করল বব, 'কয়েকজন বিদেশী মানুষকে দেখেছ? একটা জাহাজে করে এসেছে।'

সরু হয়ে এল ওঝার চোখের পাতা। 'কি দরকার তোমার? ক্ষতি করবে না ভাল করবে?'

একটু ভেবে জবাব দিল বব, 'ক্ষতি।'

হাসল ওঝা। 'তাহলে বলতে পারি। এর পরের উপত্যকাটায় রয়েছে ওরা। আইল্যান্ডের নদীর উজানে।'

'তুমি কি করে জানলে?'

'আমি ওদের দেখেছি। ওই গাঁয়ের ওঝা ছিলাম আমি। গাঁয়ের লোককে আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে ওরা। ফলে আমাকে পালাতে হয়েছে। ওদেরকে কি করতে চাও তুমি?'

'খুন।'

'ভাল। মন্ত্র পড়ে তোমাকে ফুঁ দিয়ে দেব আমি যাতে কোন ক্ষতি না হয় তোমার। ওদেরকে তো অভিশাপ দিয়েই রেখেছি। কুড়াল আর তীর-ধনুকও দেব, আর একটা বল্লম।'

একটা রিভলভার পেলে এখন সব চেয়ে বেশি খুশি হত বব। নেই যখন কি আর করা। ওসব অস্ত্র নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। পাথুরে উপকূল ধরে আইল্যান্ডে নদীর উজানে চলল সে।

পথে আর কোন গ্রাম চোখে পড়ল না। প্রথম যেটা দেখা গেল সেটা অনেক বড়। দূর থেকেই লোকের কলরব কানে এল। একটা খাঁড়ির ভেতরে বোট ঢুকিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গুড়ি মেরে এগোল বব।

গাঁয়ের কাছাকাছি এসে নদীর দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল জাহাজটা। সাইক্লোন।

না, আর কোন সন্দেহ নেই। ওঝা ঠিকই বলেছে।

যাক, অবশেষে শেষ হলো তার খোঁজা। শত্রুদের পেয়েছে। এখন প্রতিশোধ নিতে হবে। আরাম করে একটা ঝর্নার ধারে লুকিয়ে বসে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা শুরু করল সে।

নয়

'ভাবতেই জানি কেমন লাগে,' কিশোর বলল। 'এই যে মানুষগুলো, আমাদেরই মত হাত-পা-চোখ-মুখ। অথচ স্বভাব সেই দশ হাজার বছর আগের পাথরের যুগের মানুষের মত। আমাদেরই জাতভাই, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।'

'না হলেও করতেই হবে,' রবিন বলল।

নদীতে সাঁতার কাটছে দু'জনে। সামান্য দূরে পানিতে মুখ ডুবিয়ে ভেসে রয়েছে মুসা। কুমিরের ভয় আর করে না এখন ওরা। অভ্যাস হয়ে গেছে। সহজ সরল আদিবাসীদের সহজ ভাষা অনেকখানি শিখে নিয়েছে। তাদের সঙ্গে এখন কথা বলতে পারে। গাঁয়ের মোড়ল নগোর সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে। ওরা যে জন্তু-জানোয়ার ধরতে এসেছে, প্রয়োজন, এ কথাটা অনেক কষ্টে তাকে বোঝাতে পেরেছে কিশোর।

পরদিন নগো আর তার কয়েকজন লোক নিয়ে জানোয়ার ধরতে বেরোল তিন গোয়েন্দা।

বাইরের জগৎ সম্পর্কে কিছুই জানে না নগো। কিন্তু তার নিজের এলাকা খুব ভাল চেনে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে প্রতিটি গাছের নাম, ফুলের নাম বলে যেতে থাকল তার নিজের ভাষায়। বলে আর সেটার ইংরেজি নাম জিজ্ঞেস করে কিশোরকে, বলে দেয় কিশোর। লোকটার স্মরণশক্তি খুব ভাল। ঠিক মনে রাখছে। কিছু কিছু নামের উচ্চারণ নিয়ে অবশ্য অসুবিধে হচ্ছে, এই যেমন ইউক্যালিপটাস। অনেক কষ্টে বলতে পারছে আইক্-আ-লুপ-টাস। তবে কিশোরের ধারণা, ভালই বলতে পারছে নগো। কারণ সে নিজেও স্থানীয় নাম নিয়ে অসুবিধেয়ই পড়ে যাচ্ছে, যেমন, 'প্যারাফিটিকাপ' উচ্চারণ করছে যেটাকে সেটাকে অন্য ভাবে উচ্চারণ করে জংলীরা।

জানোয়ার ধরার জন্যে নানা রকম সরঞ্জাম নিয়ে এসেছে ওরা। বস্তা, দড়ি, শক্ত জাল। বন্দুক আনেনি। ওরা ধরতে এসেছে, খুন করতে নয়। তবে একটু পরেই আনেনি বলে আফসোস করতে লাগল কিশোর-মুসা, যখন নিউ গিনির ভয়ঙ্কর দুই প্রাণীর সামনে পড়ল।

একটার নাম তাইপান। নিউ গিনির দেড়শো প্রজাতির সাপের মধ্যে সব চেয়ে বিষাক্ত এবং বৃহত্তম সাপ।

আরেকটা তো যেন উঠে এসেছে রূপকথার বইয়ের পাতা থেকে, কিংবা প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবী থেকে। জীবন্ত এক ড্রাগন। সবই ঠিক আছে, পারে না শুধু রূপকথার গল্পের মত মুখ দিয়ে আগুন বের করতে। প্রথমবার দেখে বিজ্ঞানীরা তো বিশ্বাসই করতে পারেননি ওই জীব আজও বেঁচে আছে পৃথিবীতে। ছয় কোটি বছর আগে পৃথিবীর বুকে পদচারণা ছিল ওই জীবের, জানতেন তাঁরা, ফসিল পেয়েছেন। একসময় অনেক জায়গাতেই বাস করত ওরা। এখন নিউ গিনির দু'চারটে জায়গা বাদে আর কোথাও ওদের দেখা মেলে না। প্রথম ড্রাগনটা আবিষ্কৃত হয় কমোডো নামে ছোট্ট একটা দ্বীপে, সে-জন্যেই নামকরণ করা হয়ে যায় কমোডো ড্রাগন। গিরগিটির এক দানবীয় প্রজাতি।

তবে বন্দুক আনলেও লাভ হত না। ওই জীবকে মারতে আসেনি ওরা, ধরতে এসেছে। নিয়ে যেতে পারলে অনেক দামে বিক্রি করতে পারবে।

মানুষের দিকে ফিরেও তাকাল না জীব দুটো। একে অন্যকে খুন করার প্রাণান্তকর চেষ্টায় ব্যস্ত।

সাপটার শরীর বাদামী আর হলুদ। দশ ফুট লম্বা। পেঁচিয়ে ধরেছে ড্রাগনের শরীর। নরম একটা জায়গা খুঁজছে যেখানে ছোবল দিতে পারে। কিন্তু সে-রকম জায়গা পাচ্ছে না। শক্ত আঁশে ঢাকা ড্রাগনের চামড়া। প্রায় ইস্পাতের মতই শক্ত। দেখতে কুমির আর বিশাল গুঁইসাপের মিশ্রণ। সাপের জিভের মত চেরা হলদে রঙের জিভটা বার বার বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের মত যেন ছিটকে বেরোচ্ছে আর ঢুকছে মুখের ভেতরে। বড় বড় চোখা দাঁতগুলো কামড় বসাতে চাইছে সাপের পিচ্ছিল শরীরে। কুমিরের মতই মাংসাশী। সাপটাকে মারতে পারলে চমৎকার একটা ডিনার হবে।

সাপটা যতই ছোবল মারছে ততই রেগে যাচ্ছে ড্রাগন। ভীষণ হিসিয়ে উঠে বাতাস গিলে ফুলিয়ে প্রায় দ্বিগুণ করে ফেলেছে শরীরটা। বিশাল লেজটা নাড়ছে

এদিক ওদিক। সাপের চামড়ায় দাঁতের সঙ্গে সঙ্গে নখও বসাতে চাইছে।

ভালমত লড়াই চালানোর জন্যে পেছনের পা আর লেজের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে ড্রাগন। বারো ফুট উঁচু। সহজেই হরিণ কিংবা বড় বুনো শুয়োরকে খুন করে ফেলতে পারে ওরা। তাইপানের ভাগ্য অনিশ্চিত। হেরে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবে এখনও বলা যায় না কিছুই।

'কেউ কাউকে ছাড়বে না,' কিশোর বলল। 'তার আগেই আলাদা করে দেয়া দরকার। চারজনে সাপের লেজ চেপে ধরবে, আর চারজনে ড্রাগনের। টেনে সরিয়ে নিতে হবে ওগুলোকে। মুসা, তুমি আর রবিন সাপটাকে বস্তায় ভরার চেষ্টা করো। আমি ড্রাগনের দায়িত্ব নিচ্ছি।'

কয়েকবার করে নির্দেশ দিল নগো। কিন্তু নড়ছে না লোকগুলো। মারাত্মক জানোয়ারগুলোকে যতটা ভয় তার চেয়ে বেশি ভয় ওগুলোর ভেতরের শয়তান প্রেতাত্মাকে। ওদের কাছে যে কোন খারাপ জীবের মানেই হচ্ছে ওর ভেতরে দুষ্ট প্রেত রয়েছে।

ওদের ভয় ভাঙানোর জন্যে এগিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। দু'জন চেপে ধরল সাপের লেজ, আরেকজন ড্রাগনের। টানতে শুরু করল।

আবার নির্দেশ দিল নগো। ভয় পুরোপুরি কাটল না লোকগুলোর। ভয়ে ভয়ে এগোল জীবদুটোর দিকে।

শক্তিশালী লোক ওরা। কিন্তু টেনে আলাদা করতে পারছে না জীব দুটোকে। যেন আঠা দিয়ে সেঁটে দেয়া হয়েছে পরস্পরের শরীর। মিনিট দশেক টানাটানির পর সরে এসে বিশ্রাম করতে বসল লোকগুলো। হাঁপাচ্ছে।

ধরে রেখেছে এখনও কেবল কিশোর, মুসা আর রবিন। মুসা আর রবিনের অতটা ভয় নেই, কারণ সাপের লেজ বিপজ্জনক নয়। বিপদটা হলো কিশোরের। ড্রাগনের লেজ আর মুখ দুইই সমান ভয়ঙ্কর। এ হলো কুমিরের জাতভাই, যে কুমিরের লেজের এক বাড়ি সহজেই চিত করে দিতে পারে মানুষকে। লেজ দিয়ে বাড়ি মেরে গণ্ডারকেও নদীর কিনার থেকে পানিতে ফেলে দিতে পারে কুমির। সুতরাং ড্রাগনের লেজের ক্ষমতাও অনুমান করা যায়।

একেবারে নিথর হয়ে মাটিতে পড়ে আছে লেজটা। চেপে ধরে টানছে কিশোর। শান্ত হয়ে অনেকক্ষণ একভাবে পড়ে থাকায় আরও ভাল করে ধরতে গেল সে, আর তখনই তাকে চমকে দিয়ে নড়ে উঠল ওটা। এমন জোরে বাড়ি মারল উড়ে গিয়ে মাটি থেকে আট ফুট উঁচু একটা ডালের ওপর পড়ল কিশোর।

ডাল থেকে ময়দার বস্তার মত মাটিতে আছড়ে পড়ল সে। শ্বাস নিতে পারছে না, হাঁ করে রয়েছে। শরীরের অনেক জায়গায় ছিলেছড়ে গেছে ড্রাগনের লেজের আঘাতে আর ডালের খোঁচায়। মনে হলো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। হারাল না কেবল মনের জোরে। উঠেও দাঁড়াল একসময়। ভারী নিঃশ্বাস ফেলছে। টিপেটুপে দেখতে লাগল হাড় ভেঙেছে নাকি কোথাও। মনে মনে বলল, ভাগ্যিস, মাত্র বারো ফুট লম্বা ওটা। ছয় কোটি বছর আগের জাতভাইদের মত চব্বিশ ফুট নয়। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালে দোতলার সমান হয় না। ওরকম দানবের লেজের বাড়ি খেলে আর বাঁচতে হত না এতক্ষণ।

তবে এই একতলার সমানটাই যেন খুন করে ফেলতে পারে তাকে, আন্দাজ করতে পারেনি। কেবল সাপটার সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত রয়েছে বলেই এদিকে নজর দিতে পারছে না। নইলে এটাও সহজেই খুন করে ফেলতে পারে তাকে।

দুর্বল ভঙ্গিতে একটা ডাল আঁকড়ে ধরে চোখ মুদল কিশোর। মাথা পরিষ্কার আর স্নায়ুগুলোকে শান্ত করতে চাইছে। দৌড়ে এল মুসা আর রবিন।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'এখানে এলে কি করে?' সাপের লেজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ব্যাপারটা ওদের চোখে পড়েনি।

'আমি কি আর আসতে চেয়েছি। ড্রাগনটা পাঠাল।'

'লাগেনি তো কোথাও?'

'না, এই একটু আঁচড়। তেমন কিছু না।'

একটা বুনো খেজুর গাছ খুঁজে পেয়েছে গাঁয়ের লোকে। বিশ্রাম নিতে বসে সেই ফল খেতে লাগল। কিশোরদের কাছে কয়েকটা ফল নিয়ে এল নগো। খেয়েদেয়ে শরীরে শক্তি করে নিয়ে আবার আগের কাজে ফিরে গেল সবাই।

আন্তরিক ইচ্ছে থাকলে হয়তো কাজটা এত কঠিন লাগত না গাঁয়ের লোকের কাছে। ভয়টা বেশি পেয়েছে তার কারণ মেঘে ঢেকে ফেলেছে আকাশ। ওদের ধারণা মেঘের মধ্যে রয়েছে হাজারো শয়তানের বাস। রোদ ঢেকে দেয়াতে বিচিত্র ছায়া পড়েছে বনতলে। আধো অন্ধকারে ওই দুই 'প্রেতের' সঙ্গে যুদ্ধ করা এখন একটা ভয়ানক ব্যাপার।

ভয় আর শয়তান তাড়ানোর জন্য গলা ফাটিয়ে গান শুরু করল লোকগুলো। সেই সঙ্গে অহেতুক চিৎকার। তার সাথে মিলিত হলো সাপ আর ড্রাগনের হিসহিসানি। এরকম অদ্ভুত কলরব কমই শুনেছে ছেলেরা।

একসারিতে লেজ চেপে ধরে ওগুলোকে টানছে সবাই। দড়ি টানাটানির মত করে। কাজেই আলাদা যখন হলো জীবদুটো, সারির একেবারে মাথার কাছে পেল কিশোর আর মুসাকে। পলকে ড্রাগনের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল মুসার ওপর। তীক্ষ্ণ হিসহিসানি তুলে খাড়া হয়ে উঠে জড়িয়ে ধরল তাকে। পিঠে বিঁধে যাচ্ছে তীক্ষ্ণ নখ। টেনে তুলে নিল ওপরে। চোখে চোখে তাকাল।

মুসার মনে হলো কুৎসিত হাসি হাসছে ড্রাগনটা। জিভ বের করে দিচ্ছে।

'বেশ,' মুসা ভাবল। 'তুমি পারলে আমি পারব না কেন?' সে-ও জিভ বের করে দিল ড্রাগনের দিকে। জীবটার একফুট লম্বা জিভের কাছে তারটা হাস্যকর রকম খুদে দেখাল।

ভারি মজা তো! তাকিয়ে রয়েছে গাঁয়ের লোকে। মানুষ আর ড্রাগনে এরকম ঝগড়াঝাঁটি। দাঁত দেখাল জীবটা। দুই ইঞ্চি লম্বা একেকটা দাঁত, তীক্ষ্ণধার। নিজেরগুলো দেখিয়ে আর লজ্জা পেতে চাইল না মুসা। ওই দাঁতের সঙ্গে তার দাঁতের কোন তুলনাই হয় না। তবে একটা কাজ সে করল। আরেকবার ড্রাগনটা তার দিকে জিভ বের করে দিতেই কামড়ে ধরল সেটা।

জীবনে অনেক লড়াই করেছে জীবটা, অনেক ভাবে আক্রান্ত হয়েছে, তবে এরকম হেনস্তা আর হয়নি। বাহুর বাঁধন ঢিল হয়ে গেল ওটার। মাটিতে খসে পড়ল মুসা। ড্রাগনটাও হামাগুড়ি দিয়ে সরে যেতে শুরু করল।

এত কষ্ট করার পর এত সহজে ছাড়ার ইচ্ছে নেই মুসার। নগোর সাহায্যে তারের একটা জাল খুলে নিয়ে চড়িয়ে দিল দানবটার ওপর। জালের একমাথা বেঁধে ফেলল গাছের সঙ্গে।

এত জোরে হিসহিস করতে শুরু করল ড্রাগনটা, এক মাইল দূর থেকেও শোনা যাবে। কামড়ে, দাপাদাপি করে জাল ছাড়ানোর চেষ্টা করল। পারল না। জালটা যেমন শক্ত, গাছটা আরও শক্ত।

'ধরেছি! ধরেছি!' কথাটা শেষ করতে পারল না মুসা। পিঠে এসে আঘাত করল কি যেন। তীক্ষ্ণ তীব্র ব্যথা। পড়ে গেল সে।

দশ

এসব দেখার অবসর নেই কিশোরের। সে তখন লড়াই করছে সাপটার সঙ্গে। তাইপানের ঘাড় চেপে ধরে বস্তায় ঢোকানোর চেষ্টা করছে। তাকে সাহায্য করছে রবিন। কিন্তু ড্রাগনের সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষমতা রাখে যে জীব তাকে কি আর সহজে কব্জা করতে পারে? দু'জনেরই হাত গলেই অদ্ভুত কায়দায় পিছলে যাচ্ছে ওটা। একবার হাত থেকে ফসকালে আর বাঁচতে পারবে না জানে ওরা। বিষাক্ত ছোবলে মারা পড়বে। সাহায্যের জন্যে চিৎকার করে উঠল কিশোর। সাহায্য আসতে সময় লাগল। এরকম একটা 'প্রেতে'র মুখোমুখি হতে চাইছে না কেউ।

শেষমেষ সাহস করে পাথরের কুড়াল হাতে এগিয়ে এল একজন। এক কোপে সাপের মাথাট আলাদা করে দেবে।

'না না!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'মেরো না! জ্যান্ত ধরব! বস্তায় ভরতে হবে!'

অবাক হলো লোকটা। এই বিদেশীগুলোকে বুঝতে পারে না। কি যে করতে চায় ওরা! তার মতে সবচেয়ে সহজ কাজ হলো এখন কোপ মেরে সাপের মাথা আলাদা করে ফেলা। তারপর ধড়টাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ঝলসে খেয়ে ফেলা। অনেক মাংস হবে। সারা গাঁয়ের লোক খেতে পারবে। তা না করে ওটাকে জ্যান্ত বস্তায় ভরার কি মানে?

কিছুই করছে না লোকটা। ওদিকে মুসা আর রবিনের অবস্থা কাহিল। কিছুতেই কাবু করতে পারছে না সাপটাকে। যে কোন মুহূর্তে হাত থেকে ছুটে গিয়ে ছোবল মেরে বসতে পারে। অবশেষে ওদের সাহায্যে এগিয়ে এল ডিয়া। ওদেরই বয়েসী এক কিশোর। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে মোটামুটি বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।

গাঁয়ের আর সবার মতই তাইপানকে ভয় করে সে। তবে তাই বলে বন্ধুদেরকে তো আর মরতে দিতে পারে না।

সাপের লেজটাই বেশি যন্ত্রণা দিচ্ছে। চেপে ধরল ডিয়া। ড্রাগনের লেজের মত এত শক্তিশালী নয় তাইপানের লেজ। তবু মানুষের জন্যে অনেক বেশি।

হ্যাঁচকা টানে ছাড়িয়ে নিল ডিয়ার হাত থেকে। পর মুহূর্তে তার গোড়ালি পেঁচিয়ে ধরে মাটিতে ফেলে দেয়ার চেষ্টা শুরু করল।

সাপের সঙ্গে আগে আর এভাবে লড়াই করেনি ডিয়া। ঘাবড়ে গেল। তবে পিছিয়ে এল না। দ্বিগুণ বিক্রমে প্রতিযোগিতা করতে লাগল। টেনে পা থেকে লেজটা ছাড়িয়ে নিয়ে ঢুকিয়ে দিল বস্তার ভেতরে। ছাড়ল না। ঠেলে ঢোকাতে শুরু করল বাকি শরীরটা। তাকে সাহায্য করল রবিন। সাপও কম যায় না। বস্তার ভেতরে চাবুকের মত বাড়ি মারতে লাগল লেজ দিয়ে। বস্তার ভেতরে-বাইরে জমে থাকা ধুলোর মেঘ উড়তে লাগল।

চুপ করে দেখছে গাঁয়ের লোক। সাহায্য করতে এগোচ্ছে না। বোকা ছেলেগুলো বোকামি করে যদি মরেই যায় তাতে তাদের কি, ভঙ্গিটা এমন।

সাপের শরীরের আরেকটু ওপরে চেপে ধরল ডিয়া। ইঞ্চি ইঞ্চি করে ঠেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে বস্তার ভেতরে। বস্তার মুখটা ফাঁক করে রেখেছে রবিন। ঘাড় চেপে ধরে রেখেছে কিশোর। সাপের লেজটা আর বিরক্ত করতে পারছে না তাকে। শরীরটা আরেকটু ঢোকার অপেক্ষা করল সে। তারপর কায়দা করে মাথাটাও ঠেলে দিল বস্তার ভেতরে।

এরপর আর বিশেষ সুবিধে করতে পারল না তাইপান। বস্তার ভেতরে ঢুকতেই হলো তাকে। যতই লেজ নাড়ুক, হিসহিস করুক, কোন কিছুরই তোয়াক্কা করল না কিশোর, রবিন বা ডিয়া।

কাজ হয়ে গেছে ভেবে মুহূর্তের জন্যে ঘাড়ে ঢিল দিয়েছিল কিশোর, পলকে বস্তার ভেতর থেকে মুখ বের করে ফেলল তাইপান। ছোবল মারল কিশোরকে সই করে। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে চট করে হাতটা বাড়িয়ে দিল ডিয়া। সাপের দাঁত এসে বিঁধল তার তালুতে।

ঘাড় ধরে টেনে সাপের মুখটা সরানোর চেষ্টা করতে লাগল কিশোর। বেশির ভাগ সাপ ছোবল মারার পর মুখ সরিয়ে নেয়। কিন্তু তাইপান তা করে না। দাঁত বিঁধিয়ে রাখে। শত্রুর শরীরে যত বেশি বিষ ঢালতে পারে ততই যেন আনন্দ।

আবার এগিয়ে এল কুড়ালওয়ালা লোকটা। কিশোর প্রায় বলেই ফেলেছিল কোপ মেরে শয়তানটার মাথা আলাদা করে দিতে। কিন্তু বলল না। সাপটাকে সামলানোর শেষ চেষ্টা করল। পুরো শরীরটা তো প্রায় ঢুকিয়েই ফেলা হয়েছে, এখন শুধু মাথাটা আবার ঢোকাতে পারলেই হয়। টান দিয়ে ডিয়ার হাত থেকে ছাড়িয়ে আনল দাঁতগুলো। দাঁতের মাথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা বিষ ঝরছে। ঠেলে আবার মুখটা বস্তার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ধরে রাখল। যেটুকু শরীর বেরিয়ে ছিল সাপটার, মোচড়াতে গিয়ে সেটুকুও ঢুকে গেল বস্তার ভেতরে। একটা মুহূর্ত দেরি করল না আর কিশোর। বস্তার মুখ আটকে বেঁধে ফেলল।

ভেতরে শরীর শক্ত করে ফেলেছে সাপটা। অনেকটা রিঙের মত হয়ে গেল। গড়াতে শুরু করল বস্তাটা। গড়িয়ে চলল লোকগুলোর দিকে। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে দিশেহারার মত ছুটে পালাতে লাগল ওরা। তবে বস্তার ভেতরে অন্ধকার। আর সাপকে শান্ত করতে হলে অন্ধকারই প্রয়োজন। বেশিক্ষণ আর গোলমাল করল না ওটা। চুপ হয়ে গেল।

উদ্বিগ্ন হয়ে ডিয়ার ক্ষত পরীক্ষা করতে বসল কিশোর।

'ও কিছু না,' ডিয়া বলল। সামনের দিকে চোখ পড়তে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, দেখো না!'

উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল মুসাকে। বেহুঁশ মনে হচ্ছে। পিঠ থেকে সোজা হয়ে রয়েছে তিন ফুট লম্বা একটা জিনিস। পেছনে পাখির পালক লাগানো একটা তীর। মাথাটা গেঁথে গেছে মুসার পিঠে।

ছুটে গেল ডিয়া। তীরটা খোলার চেষ্টা করতে লাগল। জোরে টান দিলে মাংস ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে। সেটা করাই প্রয়োজন, গেঁথে আটকে থাকার চেয়ে। যত বেশিক্ষণ থাকবে তত বেশি বিষ ছড়াবে রক্তে।

হ্যাঁচকা টানে তীরটা খুলে আনল সে। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। ওই রক্তপাত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্ধ করতে না পারলে রক্তক্ষরণেই মরে যাবে মুসা। অসহায় দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল ডিয়া। মেডিসিন কিট সাথেই রাখে। বিপজ্জনক কাজে এসেছে। দরকার পড়তেই পারে। তাড়াতাড়ি রবিনকে সেটা খুলতে বলল। তাতে ব্যান্ডেজ খুঁজল কিশোর। নেই। পরিষ্কার কাপড় হলেও চলত। কোথায় পাবে? শার্ট পরে আসেনি। গাঁয়ের লোকেরা কিছুই পরে না।

এই সময় সাহায্য করতে এগিয়ে এল একজন লোক। তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটা দান করে দিল মুসার ক্ষত বাঁধার জন্যে। জিনিসটা মুসারই ছিল, চুরি করে কেটে নিয়েছিল লোকটা, পছন্দ হয়ে যাওয়ায়। মুসার প্যান্টের একটা পা। প্যান্টটা ধুয়ে রোদে শুকাতে দিয়েছিল সে, কেটে নিয়েছিল লোকটা। নেয়াতে ভালই হয়েছে, কাজে লেগে গেল এখন। একটুকরো দড়ির সাহায্যে ওটা দিয়ে শক্ত করে ব্যান্ডেজ বাঁধল কিশোর আর ডিয়া মিলে।

হুঁশ ফিরছে মুসার। চোখের পাতা নড়ছে।

জরুরী একটা কাজ শেষ। বাকি রয়েছে আরেকটা। ডিয়ার হাতের ব্যবস্থা করা। সেদিকে মন দিল কিশোর। কনুইয়ের নিচে আর ওপরে পেঁচিয়ে দড়ি বেঁধেছে, যাতে বিষ আর ওপরে উঠতে না পারে। অ্যানটিটক্সিন বের করে সিরিঞ্জে ভরে ইনজেকশন দিল।

চকচকে বাদামী ছিল মুখটা ফ্যাকাসে ধূসর হয়ে গেছে ডিয়ার। কণ্ঠ ভারী, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না ঠিকমত। মাতালের মত টলছে।

গুঙিয়ে উঠল মুসা। জ্ঞান ফিরে আসছে। উঠে বসল। মাথা ঘুরছে। যে কোন সময় আবার পড়ে যেতে পারে।

ভীষণ দুর্বল লাগছে ডিয়ারও। মনে হচ্ছে বেহুঁশ হয়ে যাবে। বমি পাচ্ছে। ঝুলে পড়েছে চোখের পাতা। বড় হয়ে যাচ্ছে চোখের মণি। যতই বড় হচ্ছে, দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে আসছে তার।

'নার্ভাস সিসটেমকে অকেজো করে দিচ্ছে বিষ,' কিশোর বলল। 'রক্ত জমাট বেঁধে যাচ্ছে। ডিয়া, শুয়ে পড়ো। চুপ করে শুয়ে থাকো কিছুক্ষণ।'

শুয়ে পড়ল ডিয়া। বলল, 'আমাকে নিয়ে অযথা ভাবছ। আমি ভাল আছি।' বলল বটে, কিন্তু জিভ এত ভারী হয়ে উঠেছে, নড়াতেই পারছে না।

কয়েক মিনিট চুপচাপ পড়ে থেকে উঠে দাঁড়াতে গেল। কিন্তু এমন করে টলে

উঠল, কিশোর আর রবিন তাকে ধরে না ফেললে পড়েই যেত।

'ওকে গাঁয়ে নেব কি করে?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর।

'বয়ে নেব,' নগো বলল।

তাহলে ড্রাগনটার কি হবে? ওটাকে বয়ে নেবে কে? ভাবল কিশোর। এত কষ্ট করে ধরা হয়েছে। জাহাজে নিয়ে যাওয়া দরকার।

সমস্যার সমাধান করে ফেলল মনে মনে। চারটে দড়ি হলেই হয়ে যাবে। ছুরি দিয়ে বড় একটা দড়িকে চার টুকরো করে ফেলল। প্রতিটা বিশ ফুট লম্বা।

এইবার জীবটাকে বাঁধতে হবে। ভয়ানক বিপজ্জনক কাজ। ওটার লেজ আর দাঁত এড়িয়ে কাজটা করা খুবই কঠিন। তবু করতে হবে।

জালের নিচ দিয়ে দড়ি ঢুকিয়ে দিল কিশোর। অনেক চেষ্টার পর ড্রাগনের কাঁধের কাছে পেঁচিয়ে ফেলল। তার হাত কামড়ে দিতে চাইল ড্রাগনটা বার বার, পারল না। কারণ জালের নিচে মাথাটা প্রায় নাড়তেই পারছে না। যেটুকু সরাতে পারছে তাতে কিশোরের হাত পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না তার মুখ।

আরেকটা দড়িও ওটার কাঁধে পেঁচাল কিশোর। দুটো দড়ির মাথা দু'পাশ দিয়ে বের করে রাখল।

কাঁধ বাঁধা শেষ। এইবার বাঁধতে হবে লেজের গোড়া। কাঁধ বাঁধার চেয়ে কঠিন।

তবে কঠিন কাজটাও শেষ হলো। সঙ্গে আসা লোকগুলোকে ডেকে কি করতে হবে বুঝিয়ে দিল কিশোর। প্রতিটি দড়ির মাথা ধরতে হবে দু'জন করে লোককে। আটজন লোক মিলেও যদি একটা জীবকে সামলাতে না পারে তাহলে আর কিছু করার নেই।

'শক্ত করে ধরে রাখো,' বলল সে। 'আমি জাল সরিয়ে নিচ্ছি।'

ভারী জালটা সরাতে অনেক কসরত করতে হলো তাকে। ভাঁজ করল। ভাবছে, ওটা কে বয়ে নেবে? ড্রাগন সামলাবে সাতজন লোক। নগো আর আরেকজন লোক বয়ে নেবে ডিয়া ও মুসাকে। তাকে আর রবিনকে মিলে বইতে হবে সাপের বোঝা। তাহলে?

জাল বইবার আর কেউ নেই। হঠাৎ বুদ্ধিটা মাথায় এল তার। মুচকি হাসি ফুটল মুখে। অত চিন্তার কি আছে। ড্রাগনটাকেই তো ব্যবহার করা যায়।

গাঁয়ে ফিরে চলল দলটা। চারটে দড়ির রাশ দানবটাকে সোজা পথে চলতে বাধ্য করল, যদিও প্রতি মুহূর্তেই চেষ্টা করছে লোকগুলোকে তার পথে সরিয়ে নেয়ার জন্যে।

ডিয়াকে বয়ে নিতে দরদর করে ঘামছে নগো। ছেলেটা প্রায় তার সমান ভারী। মুসাও কম ভারী না। তাকে বইতে হিমশিম খাচ্ছে দশাসই জংলী লোকটা। শেষে তার কাঁধ থেকে নেমে পড়ল মুসা। লোকটার হাত ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে চলল। কাঁধে চড়ার চেয়ে এটাই বরং ভাল লাগছে তার।

ড্রাগনের পিঠে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে ভাঁজ করা জাল। আরও অনেকখানি জায়গা খালি রয়ে গেছে। নগোর মনে হলো অহেতুক নষ্ট হচ্ছে মুল্যবান জায়গা। ডিয়াকেও ওটার পিঠে চাপাল সে। ভাবখানা, আমাদেরকে যখন কষ্ট দিচ্ছ, তুমি

মিয়া আরামে যাবে কেন? তবে এসব ওজন যেন ওজনই নয় ড্রাগনটার কাছে। দিব্যি বয়ে নিয়ে চলেছে। ড্রাগনের পিঠে সওয়ার হওয়াটা কেমন মজার সেটা উপভোগ করার মত অবস্থা নেই এখন ডিয়ার। ধরে রাখার শক্তিও নেই। কাজেই পাশে পাশে হাঁটতে হচ্ছে নগোকে, তাকে ধরে ধরে। যাতে পিঠ থেকে পড়ে না যায়।

অল্পক্ষণেই বুঝে গেল, এর চেয়ে বয়ে নেয়াটা অনেক সহজ এবং আরামের ছিল, এতই যন্ত্রণা দিচ্ছে ড্রাগনটা।

গাঁয়ের কাছে পৌঁছল অদ্ভুত মিছিল। দানবটাকে দেখার জন্যে বেরিয়ে এল গ্রামবাসীরা।

ডিয়াকে ঘরে নিয়ে যেতে চাইল তার বাবা-মা। কিশোর বাধা দিয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ জাহাজে থাকুক। ভাল হোক, তারপর নিয়ে যেও।'

ডিঙিতে করে তীরে এসে নামলেন ক্যাপ্টেন বাউয়েন। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে ড্রাগনটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জাহাজে নিয়ে যেতে হবে নাকি! সর্বনাশ! দুই টনের কম হবে না! কি করে নেব! তুলবই বা কি করে? ক্রেনের শক্তিতে কুলাবে না।'

এবারও বুদ্ধি বের করল কিশোর। সে শুনেছে, কমোডো ড্রাগন খুব ভাল সাঁতরাতে পারে। সেই আটজন লোককেই দড়ি ধরে সাঁতরে নিয়ে যেতে বলল।

কুমিরেরা কৌতূহলী হয়ে দেখতে এল। জাতভাইকে চিনতে পেরেছে মনে হয়। তবে ঝগড়া বাধানোর কোন চেষ্টা করল না।

সাপটাকে ডিঙিতে করে বয়ে আনলেন ক্যাপ্টেন। জাহাজে তোলা হলো ওটাকে। একটা খাঁচায় ভরে দেয়া হলো। তাইপানকে নিয়ে খুব একটা ঝামেলা হলো না।

ক্যাপ্টেনের ভয় ছিল ড্রাগনটাকে তোলা নিয়ে। কিন্তু ওটার ভার সহ্য করে ঠিকমতই যখন তুলে নিল ক্রেন, অবাক হলেন তিনি। তারপরের সমস্যা, ওটাকে কোথায় রাখা হবে?

কিশোর বলল, 'তেমন শক্ত খাঁচা তো আর নেই, কুমিরেরটা বাদে। একসাথেই রাখা হোক দুটোকে। আমার মনে হয় না ঝগড়া করবে। কেউ কাউকে তো আর খেতে পারবে না। অযথা মারামারি করে লাভ কি।'

ঠিকই অনুমান করেছে সে। ঝগড়া তো করলই না দুই দৈত্য, বরং ভাবই করে নিল যেন।

একটা বাংকে আরাম করে শুইয়ে দেয়া হলো ডিয়াকে। তার চিকিৎসা পরে করতে পারবে, কারণ অ্যান্টিটক্সিন দেয়া আছে; মুসারই কোন ব্যবস্থা হয়নি। তার চিকিৎসা আগে করা দরকার।

শক্ত করে প্যান্টের পা বাঁধা থাকায় রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে তার। সেটা খুলে নিয়ে ক্ষতস্থান স্টেরিলাইজ করে নিয়ে ভাল মত ব্যান্ডেজ করে দিল কিশোর আর রবিন মিলে।

অনেকটা সুস্থ বোধ করল মুসা।

এরপর ডিয়ার দিকে মন দিল কিশোর আর রবিন। কথা বলার মত যখন

অবস্থা হলো ডিয়ার, প্রথমেই জানতে চাইল মুসা কেমন আছে।

'দুর্বল,' মুসাই জবাব দিল। 'তবে আরও অনেক খারাপ হতে পারত।'

'তা পারত। যে লোকটা তীর মেরেছে সে তোমাকে খুন করার উদ্দেশ্যেই মেরেছিল।'

'কে হতে পারে বুঝতে পারছি না। তোমাদের গাঁয়ের কেউ।'

'না। আমাদের গাঁয়ের কেউ তোমাকে খুন করার চেষ্টা করবে না।'

'তাহলে অন্য গাঁয়ের কেউ? অন্য কোন গোত্রের হতে পারে।'

'তারা কেন ওকে মারতে চাইবে?' কিশোরের প্রশ্ন। 'উঁহু, অন্য কেউ। যার রাগ আছে তোমার ওপর।'

'কে সেই লোক? কার পাকা ধানে মই দিলাম?'

'ওঝাটা হতে পারে। তার পাকা ধানে তো অবশ্যই মই দিয়েছি আমরা। তাকে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করেছি।'

'দু'জনেই ভুল করছ তোমরা,' ডিয়া বলল। 'কারণ একটা জিনিস চোখে পড়েছিল আমার।'

'কি জিনিস?' জানতে চাইল কিশোর।

'গাছের নিচে তখন বেশ অন্ধকার ছিল। তবু মনে হলো লোকটাকে দেখেছি। ধনুক হাতে। ওঝা নয়। তোমাদেরই মত পোশাক পরা।'

হেসে উঠল মুসা। 'এখানে ওরকম কে আসবে? একমাত্র বাউয়েন ওরকম পোশাক পরেন। তিনি তো আর আমাকে খুন করতে চান না। তুমি ভুল দেখেছ। তা দেখতেই পারো। সাপের বিষ মাথা খারাপ করে দিয়েছিল তোমার। দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। নাও, এখন ঘুমাও। ঘুমালে ভাল লাগবে।'

কিশোর বলল ডিয়াকে, 'তোমাকে একটা ধন্যবাদ দিতে চাই, ডিয়া।'

'কিসের জন্যে?'

'আমার জীবন বাঁচানোর জন্যে। আমাকেই কামড়াতে চেয়েছিল সাপটা। তুমি হাতটা বাড়িয়ে না দিলে...'

'বাদ দাও ওসব কথা।' চোখ মুদল ডিয়া। ঘুমিয়ে পড়ল।

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। নিচুস্বরে বলল, 'ভাল একটা বেকায়দায় পড়া গেল। মুসা খেয়েছে তীর। ডিয়া সাপের কামড়। সারতে কত সময় লাগবে কে জানে! আদৌ সারবে কিনা সেটাও বুঝতে পারছি না!'

এগারো

পরদিন সকালে নাস্তা নিয়ে এল নগো। ওদের দেশের সবচেয়ে ভাল খাবার। সাধারণত মুসাই নাস্তা বানায়। আজ কিছু বানাতে পারবে না আন্দাজ করতে

পারল মোড়ল। কারণ পিঠে তীর খেয়েছে। শরীর খারাপ। তাই বৌকে দিয়ে খাবার রান্না করে কলাপাতায় জড়িয়ে জাহাজে এসে হাজির হলো।

আসলেই শরীর খারাপ মুসার। শুয়ে আছে। তবে ডিয়া অনেকখানি সেরে উঠেছে। খিদেও পেয়েছে। খাবার দেখে চোখমুখ উজ্জ্বল হলো তার।

খিদে মুসারও পেয়েছে। কিন্তু খাবারের চেহারা দেখে মুখ বাঁকাল সে।

এত খুশি হয়ে যা এনেছে নগো, তা হলো বিশাল এক বাদুড়, সেদ্ধ করা। ক্যাপ্টেন একবার তাকিয়েই বিড়বিড় করলেন, 'ঈশ্বর!'

এ ধরনের কথাবার্তা শোনেনি নগো। মনে করল, বাউয়েনও খুশি হয়েছেন খাবার দেখে।

'আমি খাব না,' রবিন বলল।

'না না,' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। 'এভাবে মানা করলে নগো কষ্ট পাবে। গাঁয়ের মোড়ল সে। তাকে কোনভাবেই চটানো যাবে না। কি আর হবে বাদুড় খেলে। ওরা মানুষ, আমরাও মানুষ। ওদের কিছু না হলে আমাদেরও হবে না।'

সাধারণ বাদুড় নয় ওটা। এক ডানার প্রান্ত থেকে আরেক ডানার প্রান্ত কম করে হলেও পাঁচ ফুট হবে।

'এত কুৎসিত জিনিস জীবনে দেখিনি আমি,' রবিন বলল। 'আর এটাকে কি বাদুড় মনে হচ্ছে নাকি? ডানা না থাকলে তো একটা শেয়াল। পাথর দিয়ে বাড়ি মেরে চেহারা বিকৃত করে দেয়া হয়েছে।'

হাসল কিশোর। 'এ জন্যেই এটাকে বলে ফ্লাইং ফক্স, অর্থাৎ উড়ুক্কু বাদুড়। ফ্রুট ব্যাটও বলে, কারণ ফল ছাড়া কিছুই খায় না এরা। আমাদের তালিকায় ফ্লাইং ফক্সের নামও আছে। ধরে নিয়ে যেতে হবে। নগো হয়তো বলতে পারবে কোথায় পাওয়া যায় এগুলো।'

বুঝতে পারল নগো। বলল, 'জানি, কোথায় পাওয়া যায়। অনেক দূর। বড় একটা গুহার ভেতরে। চলো না, আজকেই যাব।'

*

মুসা যেতে পারল না। ডিয়াও পারল না। তবে কিশোর আর রবিন সুস্থই আছে। শেষ বিকেলে নগোর সঙ্গে ওরা চলল বাদুড় ধরতে।

জাহাজে থাকতে ভাল লাগছিল না ডিয়ার। বাংকে থাকার অভ্যাস নেই। তাই ওদের সঙ্গে নেমে এল। নিজের বাড়িতেই থাকবে। তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বনের পথ ধরল গোয়েন্দারা।

চলতে চলতে আচমকা থেমে গেল কিশোর। পেছন ফিরে তাকাল। কেন যেন তার মনে হয়েছে, ওদেরকে অনুসরণ করা হচ্ছে। কিন্তু কাউকেই চোখে পড়ল না। কোন শব্দ নেই, শুধু গাছের পাতায় বাতাসের শিরশির কাঁপন।

গভীর একটা উপত্যকা ধরে চলল ওরা। দুই পাশে বড় বড় গাছ। সামনে পাহাড়ের গায়ে বিরাট এক গুহামুখ। যেন পাহাড়টা তার কালো মুখ হাঁ করে রেখেছে। হঠাৎ সেটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা কালো প্রাণী, ওদের মাথার ওপর দিয়ে দাঁড়কাকের মত ধীরে ধীরে ডানা দুলিয়ে উড়ে চলে গেল। চিনতে অসুবিধে হলো না ওদের। সকালে যাকে ধরে নাস্তা বানিয়ে খেয়েছে তারই

স্বজাতি। মুখটা শেয়ালের মুখের মত। চোখা কান। বড় বড় চোখ। ফ্লাইং ফক্স।

আরেকটু এগোতে মাথার ওপরে খসখস শোনা গেল। গাছের ডাল থেকে মাথা নিচের দিকে করে ঝুলে রয়েছে হাজার হাজার বাদুড়। জোরে চিৎকার করে উঠল মুসা। ডানা ঝটপট করে উড়ে গেল বাদুড়গুলো। আকাশ কালো করে দিল ওগুলোর ছড়ানো ডানা।

কিছুক্ষণ পর আবার এসে এক এক করে ঝুলতে শুরু করল ডালে।

সাথে করে খাবার নিয়ে আসা হয়েছে। ব্যাগটা রবিনের হাতে। বের করতে বলল কিশোর। নগোকে নিয়ে খেতে বসল ওরা। খাওয়া শেষ হলে মোড়ল বলল, 'গুহার ভেতরে ঢুকতে হবে। বৃষ্টি আসছে।'

সঙ্গের জিনিসপত্র তুলে নিয়ে গুহার ভেতরে ঢুকল ওরা। সমান একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ল। রাতে ঘুমাতেও পারবে এখানে। বসে বসে কথা বলল খানিকক্ষণ। তারপর শুয়ে পড়ল।

হঠাৎ চমকে জেগে গেল রবিন। হাতে কিসে যেন কামড়ে দিয়েছে। ব্যথাটা অদ্ভুত। যেন জ্বলন্ত সিগারেটের আগুন চামড়ার কাছাকাছি ধরে রাখা হয়েছে, তারই আঁচ লাগছে চামড়ায়। চট করে কথাটা মনে পড়ে গেল তার। বাদুড়! নিশ্চয়ই ভ্যাম্পায়ার ব্যাট! অনেক অভিযাত্রীরই এই অভিজ্ঞতা হয়েছে, বইয়ে পড়েছে সে। রক্ত খেতে এসেছে বাদুড়টা।

আস্তে করে আরেক হাত তুলল রবিন। যেখানে আঁচ লাগছে দ্রুত সে-জায়গাটায় নামিয়ে আনল হাতটা। আশা করেছিল বাদুড়টাকে ধরতে পারবে। নেই ওটা। চটচটে আঠাল তরল পদার্থ লাগল হাতে। তারমানে রক্ত! এ ভাবেই রক্ত পান করে রক্তচোষা বাদুড়। এত সাবধানে চামড়ায় ফুটো করে ফেলে টেরও পায় না তার শিকার। তারপর চেটে চেটে রক্ত খায়। তখনও টের পায় না শিকার। খুবই বিস্ময়কর! রক্তচোষা বাদুড় নাম না রেখে রাখা উচিত ছিল রক্তচাটা বাদুড়। যা-ই হোক, কথা হলো, ভ্যাম্পায়ার ব্যাট বাস করে আমাজানে। নিউ গিনিতে আছে বলে শোনেনি। ...যাকগে, ওসব পরে ভাবা যাবে। আপাতত রক্তক্ষরণ বন্ধ করা দরকার। নইলে বিপদ হয়ে যাবে। নাগোকে ডাকল সে।

ডাকাডাকিতে মোড়লের সঙ্গে সঙ্গে কিশোরও জেগে গেল।

মোড়ল দেখেটেখে বলল, 'কই, রক্ত কই?'

'এ তো পানি। বৃষ্টির পানি পড়েছে। ঘুমাও।'

পরদিন সকালে রহস্যের সমাধান হলো। রাতে তাকে কিসে কামড়েছিল জানতে পারল রবিন। এক ধরনের পিঁপড়ে। আগুনে পিঁপড়ে বলে ওগুলোকে। কাছেই বাসা দেখা গেল। পিঁপড়ের জগতের দৈত্য বলা যায় এদেরকে। দুই ইঞ্চির বেশি লম্বা।

দ্রুত নাস্তা শেষ করে গুহা থেকে বেরোল ওরা। এবার আসল কাজ। বাদুড় ধরতে হবে। বৃষ্টি থেমেছে। ডালে ঝুলে রয়েছে বাদুড়গুলো। রবিন আর কিশোর তাকিয়ে আছে ওগুলোর দিকে।

কিন্তু সেদিকে চোখ নেই নগোর। সে তাকিয়ে রয়েছে নিচের দিকে। মাটি পরীক্ষা করছে। বলল, 'রাতে কেউ এসেছিল।'

মাটিতে পায়ের ছাপ দেখতে পেল দুই গোয়েন্দাও। অস্পষ্ট ছাপ।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের গাঁয়ের কেউ?'
'না। গাঁয়ের লোকেরা তোমাদের মত জুতো পরে না।'
'জুতো শুধু আমাদের তিনজনের পায়ে আছে। আমাদেরই কারও হবে ওই ছাপ।'
মাথা নাড়ল নগো। পরিষ্কার একটা ছাপ দেখিয়ে বলল, 'ওখানে তোমাদের পা রাখো তো।'
ছাপটার ওপর একে একে জুতো রাখল কিশোর আর রবিন। নিজেরাই দেখতে পেল তফাৎটা।
'দেখলে?' নগো বলল। 'অনেক বড়। তোমাদের চেয়ে অনেক বড় কোনও মানুষ। আমার ধারণা বিদেশী মানুষ। সে-ই তোমার বন্ধুকে তীর মেরেছিল।'
'কিন্তু আমাদের পিছু নেবে কেন?' নিজেকেই প্রশ্নটা করল কিশোর। 'আর যদি নিয়েই থাকে, তাহলে ক্ষতি করার ইচ্ছে তার নেই। এই লোক মুসাকে তীর মারেনি। আমাদের খুন করার ইচ্ছে থাকলে কাল রাতে গুহায় ঢুকে সে-চেষ্টা করত।'
'চেষ্টা করেনি তা বলতে পারো না।'
'মানে?'
রবিনের দিকে তাকাল নগো। 'পিঁপড়েগুলো বাঁচিয়ে দিয়েছে তোমাদেরকে। রাতে ঠিকমত ঘুমাতে দেয়নি। এই লোকটা বৃষ্টির মধ্যে বাইরে অপেক্ষা করছিল। আমরা গভীর ভাবে ঘুমালেই ঢুকে পড়ত। তারপর খুন করত তোমাদের। আমি বলছি, আবার চেষ্টা করবে সে।'
দিনটা চমৎকার। ঝকঝকে রোদ। রাতের আতঙ্কের ছিটেফোঁটাও নেই আর কিশোরের মনে। কাজেই ভয় পেল না সে। বরং রাতে বাদুড়ে কামড়েছে বলে ভয় পেয়েছিল ভেবে লজ্জাই লাগছে। নগোকে বলল, 'তোমার কথা ঠিক না।'
'আমি বলছি ঠিক। তোমাদেরকে সাবধানে থাকতে হবে।'
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরবে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল রবিন। এ সব জংলী মানুষদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অনেক বেশি প্রখর। বলতে গেলে অনেকটা এই ইন্দ্রিয়ের জোরেই বেঁচে থাকে ওরা এ সব মারাত্মক বিপজ্জনক জঙ্গলে। আর তর্ক করল না সে। বলল, 'ঠিক আছে, থাকব। এখন বাদুড় ধরা দরকার।'
'খাওয়ার জন্যে?' জানতে চাইল নগো। 'না নিয়ে যাওয়ার জন্যে?'
'নেয়ার জন্যে। জ্যান্ত ধরতে হবে। মারা চলবে না।'
এই জন্তু-জানোয়ার ধরার ব্যাপারটা এখনও বুঝতে পারেনি নগো। ওরাও ধরে, কিংবা মারে। তবে সেটা একটা কারণে, খাওয়ার জন্যে। আরও একটা কারণে মারে, আত্মরক্ষার তাগিদে। কিন্তু শুধু শুধু এভাবে ধরে নিয়ে গিয়ে খাঁচায় ভরে রাখার মানে সে বুঝতে পারে না।
বোঝার চেষ্টাও করল না। মাথা ঝাঁকাল শুধু।

*

বাদুড় রাখার জন্যে সঙ্গে করে থলে নিয়ে এসেছে কিশোর।

মাটি অনেক ওপরে, পঞ্চাশ ফুট ওপরের ডালে ঝুলে আছে ওগুলো। ধরবে কি করে?

সমাধান করে দিল নগো। তীর দিয়ে বাদুড় মারা সবচেয়ে সহজ। জ্যান্ত ধরতে হলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

কয়েকটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে একটা গাছে উঠে গেল নগো। চিতার মত নিঃশব্দে হামা দিয়ে এগিয়ে গেল একটা ডাল বেয়ে। ফ্লাইং ফক্স ভীষণ চালাক, একেবারে শেয়ালের মতই। সামান্যতম শব্দ পেলেই উড়ে যাবে। আস্তে করে উঠে বসল নগো। তারপর পাথর ছুঁড়ল। ডানা ঝাপটে উড়ে গেল বাদুড়ের দল। কিছু কিছু রয়ে গেল। সেগুলো সবই বাচ্চা। একটা বাচ্চাকে সই করে আবার পাথর ছুঁড়ল সে। লাগাতে পারল না। তৃতীয়বারের চেষ্টায় লাগল বাচ্চাটার গায়ে। ডাল থেকে খসে গেল ওটার নখ। মাটিতে পড়ে গেল। ধরে ফেলল কিশোর।

নেমে এল নগো। জানাল, বাচ্চাটাকে খোলা জায়গায় ফেলে রাখলে ওটাকে তুলে নেয়ার জন্যে নেমে আসবেই মা। মাটিতে বাদুড়েরা অসহায়, ভাল হাঁটতে পারে না। পাখির মত ঝট করে উড়েও যেতে পারে না। ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে থাকতে হবে। যেই মা-টা নামবে অমনি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ওটার ওপর। ধরে ফেলতে হবে। বাদুড় ধরার আদিম পদ্ধতি এটা।

বাচ্চাটাকে একটা জায়গায় রাখল নগো। যাতে নড়তে না পারে সেজন্যে এক ডানা ছড়িয়ে তাতে পাথর চাপা দিয়ে দিল। কাছাকাছি একটা ঝোপ আছে। তাতে ঢুকে পড়ল কিশোর আর রবিন। আরেকটাতে ঢুকল নগো। কিশোররা যেটাতে ঢুকেছে, তাতে কাঁটা আছে। খোঁচা লাগল চামড়ায়। কিছু করার নেই। কোন ঝোপই এখানে কাঁটাশূন্য নয়। বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে রইল ওরা।

মা নামছে না। কিশোরের মনে হতে লাগল, নামবে না। হয়তো এখানে কাজে লাগবে না আদিম পদ্ধতি। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, না লাগার কোন কারণ নেই। বাদুড়দের স্বভাব নিশ্চয় বদলে যায়নি।

যায়নি যে তার প্রমাণ পেল শিগ্গিরই। ডানা ঝাপটে নেমে এল মা। বাচ্চাটার ওপর বসে ওটাকে তোলার চেষ্টা করতে লাগল। কাঁটার পরোয়া করল না আর কিশোর। ঝোপ থেকে বেরিয়ে ছুটে গেল। ধরে ফেলল বড় বাদুড়টাকে। রবিনও বেরিয়ে এসেছে তার পিছু পিছু। তার হাতের থলেতে পুরল। বাচ্চাটাও জীবিতই আছে। ব্যথা পেয়েছে, তবে মরেনি। সেবাযত্ন করে সুস্থ করে নেয়া যাবে ভেবে ওটাকেও নিয়ে নেয়া হলো।

একটা বাদুড়ই যথেষ্ট। অযথা বেশি ধরার দরকার নেই। নগোকে নিয়ে গাঁয়ে ফিরে চলল দুই গোয়েন্দা। বেশ ওজন বড় বাদুড়টার। অনেক বড়।

নগোর হুঁশিয়ারি মনে আছে তার। অসাবধান হলো না গোয়েন্দারা। বিশাল পায়ের ছাপের অধিকারী মানুষটার ব্যাপারে সতর্ক রইল।

প্রায় দুই ঘণ্টা হয়ে গেল। তবু লোকটার দেখা নেই। সতর্কতায় ঢিল পড়ল দু'জনেরই। এই সময় ঘটল ঘটনা। অতর্কিতে। আগে আগে হাঁটছে নগো। ঠিক তার পেছনেই রয়েছে কিশোর। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল, বড় একটা কি যেন গাছ থেকে পড়ছে নগোর ওপর। বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে। এক

ধাক্কায় সরিয়ে দিল মোড়লকে।

অনেক ভারী একটা ডাল। মাথায় পড়লে মারা পড়ত নগো। তাকে সরাতে গিয়ে ডালটা লাগল কিশোরের গায়ে। আঘাত মারাত্মক না হলেও মাথার একপাশ আঁচড়ে গেল তার, ডান পায়ে ব্যথা পেল।

ওকে জড়িয়ে ধরল নগো। কৃতজ্ঞতায়। দু'জনেই তাকিয়ে রইল ডালটার দিকে। যেন বিশ্বাস করতে পারছে না ঘটনাটা ঘটেছে।

'নিশ্চয় কাল ঝড়-বৃষ্টিতে ভেঙে ঝুলে ছিল,' আন্দাজ করল রবিন। 'এখন খসে পড়েছে।'

মানতে পারল না নগো। আশপাশের মাটিতে পরীক্ষা করতে করতে আঙুল তুলল। এক জায়গায় চ্যাপ্টা হয়ে রয়েছে ঘাস।

'বড় পা,' বলল সে।

'জানোয়ার-টানোয়ার হতে পারে,' রবিন বলল।

'না। জানোয়ার নয়। মানুষ।'

কি করে বুঝল নগো? রবিনের মনে তার ধারণাই বদ্ধমূল রইল—আগের দিন ঝড়ে ভেঙে আটকে ছিল ডালটা। এখন খসে পড়েছে। কাকতালীয় বলা যায় ব্যাপারটাকে, তবে তা-ই ঘটেছে।

কিন্তু কিশোরের সন্দেহ হলো। চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার। ডালটা পরীক্ষা করে দেখতে দেখতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখো!'

দেখল রবিন। আর স্বীকার না করে পারল না যে ঝড়ে ভাঙেনি। কুড়ালের স্পষ্ট কোপ রয়েছে ডালের গায়ে। ওপরে তাকিয়ে দেখল, যেখান থেকে ভেঙে পড়েছে সেখানেও কুড়ালের কোপের দাগ। মানুষের কাজ, বোঝাই যায়। একটা ব্যাপার বুঝতে পারছে না, একেবারে সময়মত কি করে ওদের ওপর খসে পড়ল ওটা।

রহস্যের সমাধান করে দিল নগো। রাস্তার ওপর একটা লম্বা লতা পড়ে রয়েছে। একটা মাথা হারিয়ে গেছে ঝোপের ভেতরে। ট্রিগারের কাজ করেছে ওটা। মৃত্যুফাঁদ পেতে রেখেছিল কেউ। আগে আগে চলছিল নগো। তার গায়ে বেধে টান লাগতেই খসে পড়েছে ডালটা।

মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল কিশোরের। চারপাশে তাকাল। বিপজ্জনক কিছুই চোখে পড়ল না। গাছের পাতায় রোদ। একজোড়া ঘুঘু ডাকছে ডালে। ঝিমোচ্ছে একটা বার্ড অভ প্যারাডাইস। চমৎকার শান্ত পরিবেশ। সুন্দর। এ রকম একটা জায়গায় খুনের পরিকল্পনা করেছে কেউ ভাবাই যায় না।

আবার চলতে শুরু করল দু'জনে। মৃদু খোঁড়াচ্ছে কিশোর। তবে ব্যথাটা ভুলে গেছে। মন জুড়ে রয়েছে বিরাট পা-ওয়ালা রহস্যময় মানুষটা। যতই এগোচ্ছে, ক্লান্ত হয়ে উঠছে শরীর।

ভারী বোঝা বইতে বইতে রবিনও ক্লান্ত। কয়েকবার করে ওটা নিয়ে নিতে চেয়েছে নগো। দেয়নি রবিন। শেষে প্রায় কেড়ে নিল থলেটা। কাঁধে তুলে নিল। বোঝামুক্ত হয়ে তখন কিশোরকে হাঁটতে সাহায্য করল রবিন। মাটিতে পড়ে থাকা মরা গাছগুলো ডিঙাতে অসুবিধে হচ্ছে কিশোরের।

অবশেষে গাঁয়ে পৌঁছল ওরা। উত্তেজিত হয়ে আছে গ্রামবাসী। বুনো নাচ জুড়েছে কয়েকজনে। ব্যাপার কি জানার জন্যে কৌতূহল হচ্ছে কিশোরের, তবে আগে বাদুড় দুটোকে জাহাজে চালান করা দরকার।

সাইক্লোনের ডেকে দাঁড়িয়ে ওদের দেখতে পেলেন ক্যাপ্টেন বাউয়েন। ডিঙি নিয়ে তীরে চলে এলেন। 'থলেতে কি?'

'বাদুড়,' কিশোর বলল।

'রান্না করে খেতে চাইলে আলাদা কথা। কিন্তু জ্যান্ত বাদুড় এনে আমার জাহাজে তুলবে, সেটি হবে না।'

তর্ক শুরু করল কিশোর। শেষে তার কথা মানতেই হলো ক্যাপ্টেনকে। বড় বাদুড়টাকে আগে খাঁচায় ভরল কিশোর। বাচ্চাটা ভালই আছে, ওটাকেও ভরল। তারপর মুসা কেমন আছে দেখতে গেল।

'আমার জন্যে ভেবো না,' কিশোরকে বলল মুসা। 'দু-এক দিনের মধ্যেই ভাল হয়ে যাব।...তোমার পায়ে কি হলো? খোঁড়াচ্ছ কেন?'

'কিছু না। একটা ডাল পড়েছিল।'

মুসার শরীর এমনিতেই ভাল না। সত্যি কথাটা বলে তাকে আরও দুশ্চিন্তায় ফেলতে চাইল না কিশোর। মৃত্যুর মুখ থেকে যে ফিরে এসেছে জানাল না সে-কথাটা। জিজ্ঞেস করল, 'গাঁয়ে কি হয়েছে? মানুষগুলো তো সব পাগল হয়ে গেছে মনে হয়।'

বারো

'তোমরা যাওয়ার পর অনেক ঘটনা ঘটেছে,' মুসা জানাল। 'একজন লোক খুন হয়েছে।'

'বলো কি! গাঁয়ে?' রবিনের প্রশ্ন।

'না, জঙ্গলে। বল্লম নিয়ে নাকি একটা মানুষ আক্রমণ করেছিল তাকে। টলতে টলতে গাঁয়ে ফিরল লোকটা। মরার আগে সব কথা বলে গেছে। পেছন থেকে এসে বল্লম মেরেছিল খুনী। পড়ে গেল লোকটা। পলকের জন্যে দেখেছে, যে মেরেছে তার পা কুচকুচে কালো।'

'তা কি করে হয়? এখানকার মানুষ তো কালো নয়। বাদামী।'

'ও যা বলেছে তাই বলছি আমি। লোকটা বলেছে, খুনীর পায়ের হাঁটু থেকে নিচের অংশটা কালো।'

'লোকটা কে, চিনতে পেরেছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বহু বছর ধরে পাশের গাঁয়ের লোকের সঙ্গে এখানকার লোকের বনিবনা নেই। শত্রুতা। যে লোকটা মারা গেছে, তার ধারণা, খুনী পাশের গাঁয়েরই লোক। গাঁয়ের লোকে তখন আমার সঙ্গে কথা বলতে এল। যখন দেখল, আমার শরীর

খুব খারাপ, সাহায্য করতে পারব না, তখন ক্যাপ্টেন বাউয়েনকে নিয়ে গেল। তাঁকে জিজ্ঞেস করোগে, সব বলবেন।'

দরজায় গিয়ে ডাক দিল কিশোর। কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন।

'কাল নাকি কে মারা গেছে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছিল?'

'কি আর বলব,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'চিকিৎসা করার জন্যে নিতে এল আমাকে। আমি তো আর ডাক্তার নই। গাঁয়ের লোকের চাপাচাপিতে গেলাম। কোনমতে রক্তটা বন্ধ করতে পারলাম শুধু। বিড়বিড় করে কালো পায়ের কথা বলল লোকটা। তারপরই মরে গেল।'

'তারপর?'

'ভীষণ খেপে গেল এখানকার লোকে। কুড়াল, বল্লম বের করে নিয়ে এল। পাশের গাঁয়ের লোকের সঙ্গে লড়াই করতে যেতে চাইল তখুনি। একজন নেতা গোছের লোক বলল, অন্ধকার হলে যাওয়া উচিত। গিয়ে হঠাৎ করে হামলা চালাবে।

'আমাকেও সঙ্গে নিতে চাইল ওরা। লড়াই করার জন্যে নয়। জাদু দিয়ে কাজ সারার জন্যে। আমি গেলে নাকি ওদের ভাগ্য প্রসন্ন থাকবে। না বলতে পারলাম না। বাধ্য হয়ে সঙ্গে গেলাম।

'পথ খুবই খারাপ। পাহাড় পেরিয়ে ওপাশের উপত্যকায় নামলাম। আমার তো অবস্থা কাহিল, কিন্তু লোকগুলোর কিছুই হলো না। এ সব পথে চলতে চলতে অভ্যেস হয়ে গেছে ওদের।

'অদ্ভুত এক গ্রাম দেখতে পেলাম। ছয় ফুট উঁচু খুঁটির ওপর তৈরি করা হয়েছে কুড়েগুলো। মই দিয়ে ওঠার ব্যবস্থা। বোধহয় নিরাপত্তার জন্যেই অত উঁচুতে ঘর করেছে ওরা। বুনো জানোয়ার আর পাশের উপত্যকার লোকের হঠাৎ আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে।

'একটা ঘরে আলো দেখা গেল। অনেক মানুষের কথাবার্তা শোনা গেল ভেতরে। পা টিপে টিপে এগোলাম আমরা। আলোচনা সভা বসেছে। গাঁয়ের লোক এসে মিলিত হয়েছে ওখানে, মোড়লের ঘরে। আলোচনা করছে, পাশের গাঁয়ের, অর্থাৎ আমরা যেখানে উঠেছি সেখানকার একটা মানুষকেও ছাড়া হবে না। শিশুদেরকেও না। সব খুন করে ফেলা হবে। এমনকি চারজন বিদেশীকেও ছাড়া হবে না।

'কৌতূহল হলো। ঘরের একেবারে নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম ভাল করে শোনার জন্যে। কেন খুন করতে চায় ওরা? ওদের আলোচনা থেকে বোঝা গেল, রহস্যময় কালো পাওয়ালা একজন মানুষ ওদের গাঁয়েরও একজনকে খুন করেছে। আমাদেরকে কেন মারতে চায়, বুঝতে পারলাম। কালো পা মানে, জুতো পরা পায়ের কথা বলছে ওরা। ওদের ধারণা, আমাদেরই কেউ ওদের লোককে খুন করেছে। কাজেই আমাদেরকে মারবে ওরা। আর যেহেতু গাঁয়ের লোকে আমাদেরকে ঠাঁই দিয়েছে, তাদেরকেও ছাড়বে না। তবে ভয়ও পাচ্ছে, ওদের কথা থেকে বোঝা গেল। আমরা যে সাংঘাতিক ক্ষমতাশালী ওঝা, এ কথা ওদেরও কানে গেছে।'

'হুঁ!' আনমনে মাথা দোলাল কিশোর। ভাবছে, তাকে যে লোক খুন করতে চেয়েছিল, এই দুই উপত্যকার মানুষ খুনের পেছনে তার কোনও হাত নেই তো? জিজ্ঞেস করল, 'তারপর? লড়াই হলো?'

'নাহ্। যাদের সঙ্গে গিয়েছিলাম, তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ফেরত নিয়ে এলাম। শুনতে কি আর চায়? ভয় দেখালাম। বললাম, সময় হয়নি, এখন লড়াই করলে ওদের পরাজয় হবে। কারণ শয়তান এখন ওদের বিপক্ষে। শয়তানের ভয়েই ফেরত এসেছে ওরা।'

'আর অন্য গাঁয়ের লোক? ওরা কখন লড়াই করতে আসবে?'

'যে কোনও সময় চলে আসতে পারে। না-ও আসতে পারে। কারণ অনেককেই মনে হলো আমাদের ভয়ে ভীত। যা-ই হোক, হুঁশিয়ার থাকতে হবে আমাদের। যদি আসে, দুটো দলকে থামানোর একটাই উপায়। রহস্যময় সেই জুতোওয়ালাকে খুঁজে বের করা। প্রমাণ করতে হবে, কে খুনটা করেছে।'

'এ কাজ কেন করল লোকটা?'

'একটাই জবাব। দুটো গাঁয়ের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দেয়া। যাতে একদল আরেক দলকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। সোজা কথা, প্রতিশোধ নিতে চায়।'

'কার সঙ্গে ওদের শত্রুতা? আমার তো একটা লোকের কথাই মনে পড়ছে, এ গাঁয়ের সেই ওঝা। কিন্তু সে জুতো পাবে কোথায়?'

'কাল থেকে এ কথাই ভাবছি আমিও,' মুসা বলল।

*

পরদিন সকালে দুঃসংবাদ নিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন বাউয়েন। 'নগোর শরীর খারাপ।'

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'ঠিক বলতে পারব না। হাঁটতে গিয়েছিলাম ডাঙায়। নগোর একজন স্ত্রী বেরিয়ে এসে বলল তার স্বামীর শরীর খারাপ। দেখতে গেলাম। সাংঘাতিক পেট ব্যথা করছে লোকটার। গড়াগড়ি করছে। সারারাতই নাকি এমন করেছে বলল তার বউ। তাকে ভাল করে দিতে অনুরোধ করল। কিন্তু আমি তো ডাক্তার নই।'

কিশোরও ডাক্তার নয়। তবে ওষুধ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান আছে। 'দেখি, আমি গিয়ে দেখি একবার।' কিন্তু পায়ে যে রকম ব্যথা আর ফুলে উঠেছে পা-টা, হাঁটতে পারবে কিনা ভরসা পেল না।

মুসা বলল, 'আমি ভাল হয়ে গেছি, আমি যাব।'

কিন্তু উঠে বসতে গিয়েই ধপ করে পড়ে গেল আবার বিছানায়। পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা করে উঠল। শক্ত কাঠ হয়ে গেছে যেন। নড়াতেই পারে না। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'নাহ্, আমি আর পারলাম না।'

'থাক থাক, তুমি শুয়ে থাকো। উঠতে না পারলে অকারণে জোর করছ কেন?' রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। 'আমাদের ওষুধের বাক্সে ইমেটিক আছে না?'

মাথা দোলাল রবিন। 'আছে।'

'আমার মনে হচ্ছে বিষ। ওকে গিয়ে ইমেটিক দাও।'

'টিমেটিকটা কি?' জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন।

'টিমেটিক নয়, ইমেটিক। পাকস্থলীতে বিষ থাকলে বেরিয়ে যাবে। রাত থেকেই ব্যথা করছে, বেশি দেরি হয়ে গেল কিনা কে জানে। তবু চেষ্টা করতে হবে। পেটের বিষ রক্তে ছড়িয়ে গেলে আর কিছু করার থাকবে না। আপনিও যান রবিনের সঙ্গে। ওর স্ত্রীকে গরম পানিতে লবণ মিশিয়ে গেলাতে বলুন। গলা পর্যন্ত।'

'কিন্তু কে বিষ খাওয়াতে যাবে?' মুসার প্রশ্ন। 'নিজে নিজে তো আর খাবে না। বনের সমস্ত লতা-পাতা-ফল চেনে সে। বিষাক্ত কিছুই খাবে না।'

'চুরি করে তার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে হয়তো কেউ। অচেনা কাউকে কাছেপিঠে ঘুরঘুর করতে দেখেছে কিনা তার বউকে জিজ্ঞেস করতে হবে। রবিন, জিজ্ঞেস কোরো।'

নগোর চিকিৎসা করতে গেল রবিন আর বাউয়েন। শক্তিশালী মানুষটা অল্প কয়েক ঘণ্টায়ই কি রকম কাহিল হয়ে পড়েছে দেখে অবাকই লাগল রবিনের। চেহারাই বদলে গেছে। তার সব বউয়েরা ঘিরে বসে বিলাপ শুরু করেছে, যেন ইতিমধ্যেই মরে গেছে নগো।

তাদেরকে শান্ত হতে বললেন ক্যাপ্টেন। লবণ পানি গরম করে আনতে বললেন। একজন গিয়ে গরম করে আনল। ইমেটিক দিতে বসল রবিন। মোড়লকে জোর করে গরম পানি গেলাতে শুরু করল সে আর ক্যাপ্টেন মিলে। যখন আর গিলতে পারল না নগো, তখন তাকে ধরে উপুড় করে শোয়ানো হলো। পিঠে চাপ দিতেই মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে আসতে লাগল পানি, পেটের ভেতরে যা ছিল সব নিয়ে।

আরও দু'বার তাকে পানি খাওয়ানো হলো। পেটের ভেতরে যা ছিল সব বেরিয়ে এল। আর এক বিন্দু শক্তি নেই নগোর শরীরে। একেবারে নেতিয়ে পড়ল। তবে পেট চেপে ধরে তার চেঁচানো বন্ধ হলো। তাকে আরাম করে শুইয়ে দিতে বললেন তার বউদেরকে ক্যাপ্টেন।

শোয়ানো হলো। চোখ মেলে রেখেছে নগো। তবে কিছু দেখছে বলে মনে হয় না। একেবারে শূন্য দৃষ্টি।

বউদের জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন, 'সন্দেহজনক কাউকে কাল ঘরের কাছে ঘোরাফেরা করতে দেখেছ?' চুপ হয়ে গেল সবাই। শেষে একজন বলল, 'ঠিক বলতে পারব না। আমরা এখানে থাকি না। সব বউয়েরই আলাদা কুঁড়ে আছে। এখানে শুধু মোড়ল থাকে। কালকে তো ও ছিলই না। ওর সঙ্গে বনে গিয়েছিল,' মুসাকে দেখাল সে। 'ঘরটা খালি ছিল। তখন কেউ আসতে পারে। ঢুকলেও কেউ দেখার নেই।'

'আমার মনে পড়ছে,' আরেকজন বলল। 'একটা লোককে দেখেছি। বনের ভেতরে লাকড়ি কুড়াতে গিয়েছিলাম। ওখান থেকে ভালমত দেখা যায় না ঘরটা। তবে মনে হলো কে যেন বেরিয়ে যাচ্ছে।'

'দেখতে কেমন?'

'ভাল করে দেখিনি। তবে আমাদের গাঁয়ের পুরুষদের মত নয়। তোমাদেরই মত কাপড় পরনে ছিল মনে হলো। কি জানি। ভুলও হতে পারে আমার।'

আর কেউ কিছু বলতে পারল না। মোড়লকে চিকিৎসা যা করার করা হয়েছে। এর বেশি আর কিছু করার নেই। কিশোরকে খবরটা জানাতে জাহাজে ফিরে চললেন ক্যাপ্টেন আর রবিন।

*

'যা যা করতে বলেছ করেছি,' কিশোরকে বলল রবিন। 'আর কিছু করার নেই। ভাল তো মনে হলো না।'

'তার মানে বিষই। ছড়িয়ে পড়েছে শরীরে। তার বউদেরকে জিজ্ঞেস করেছ?'

'করেছি। একজন বলল, আমাদেরই মত পোশাক পরা একজন লোককে নাকি মোড়লের ঘর থেকে বেরোতে দেখেছে।'

'হুঁ!' চিন্তিত ভঙ্গিতে বাউয়েনের দিকে তাকাল কিশোর। 'কে হতে পারে?'

'কি করে বলব?'

'আমি একটা কথা ভাবছি,' দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। 'অতিকল্পনাও বলতে পারো।'

'কি?' জানতে চাইল মুসা আর রবিন।

'আমাদের কোন পূর্বশত্রু না তো? প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে এখানে এসে হাজির হয়েছে, করছে এ সমস্ত।'

'কি জানি!' রবিন বলল। 'এতই রাগ আমাদের ওপর যে এখান পর্যন্ত ধাওয়া করে আসবে?'

'আসতেও পারে। ভেবে দেখো সব। মুসার পিঠে তীর মারা হলো। আরেকটু হলেই মাথায় ডাল পড়ে মরতে বসেছিলাম আমি। এখানে আমাদের সব চেয়ে বড় বন্ধু নগোকে বিষ খাওয়ানো হলো। যাতে আমাদের সাহায্য করতে না পারে।'

'অসম্ভব না,' মুসা বলল। 'এতকাল গোয়েন্দাগিরি করে শত্রু তো কম তৈরি করিনি।'

*

ঘণ্টা দুয়েক পর সাঁতার কেটে নদী পেরিয়ে এসে জাহাজে উঠল নগোর একজন স্ত্রী। কেবিনের দরজায় এসে দাঁড়াল। কেঁদে কেঁদে চোখ লাল।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আমার স্বামী মারা গেছে।'

কয়েক সেকেন্ড স্তব্ধ নীরব হয়ে রইল ঘরটা। তারপর কিশোর বলল, 'আসছি আমরা। ওকে কবর দেয়ার সময় হাজির থাকব।' এ ছাড়া আর কিছু বলতে পারল না সে।

'কবর দেয়া হয়ে গেছে।'

'এত তাড়াতাড়ি?'

বুঝিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন, 'এখানে একেক গোত্রে একেক নিয়ম। কেউ কেউ লাশ রেখে দেয় উঁচু একটা মঞ্চে। রোদে শুকিয়ে ধীরে ধীরে মমি হয়ে যায় লাশটা। কেউ আবার সঙ্গে সঙ্গে কবর দিয়ে ফেলে। মরার পর আর এক মুহূর্ত দেরি করে না। এরা সেই দলের। চলো, তার কবরটাই বরং দেখে আসি।'

ডিঙিতে করে তীরে রওনা হলো ওরা। কিশোরের সঙ্গে চলল রবিন আর

বাউয়েন। মুসা এবারেও ওঠার চেষ্টা করে পারল না।

মোড়লের ঘরে নিয়ে আসা হলো ওদের। এক জায়গায় গোল হয়ে বসে বিলাপ করছে স্ত্রীরা। বেড়ার ধারে নতুন মাটি খোঁড়া।

অবাক হলো কিশোর। 'ঘরের ভেতরই কবর দিয়েছ?'

'কেন দেব না?' কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল একজন স্ত্রী। 'বেঁচে থাকতে আমাদের প্রিয় স্বামী ছিল সে। মরার পর কি পর হয়ে গেল? কেন বাইরে ফেলে দেব? তা ছাড়া এটা তারই ঘর।'

কবরের পাশে দাঁড়াল কিশোর, রবিন আর ক্যাপ্টেন। আরেকটা ব্যাপার অবাক করল কিশোরকে। কবরের এক মাথায় একটা গর্ত। ওটা দিয়ে নগোর মুখটা বেরিয়ে আছে। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কি?'

'নেতা গোছের কোনও ভাল মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার মুখের কাছে ওরকম গর্ত করে রাখা হয়।'

'কারণটা কি?'

'যাতে পচে যাওয়ার পরে তার খুলি নি[illegible] গিয়ে টামবারানে সাজিয়ে রাখতে পারে।'

'আমি তো মনে করে[illegible] শুধু শত্রুদের মাথা রাখে।'

'না। যে কোনও [illegible] যে কোনও বিজ্ঞলোকের মাথা রাখে। মৃতের প্রতি সম্মান এভাবেই দেখায় [illegible]রা বিশ্বাস করে, মরে গেলেও খুলির ভেতরে থেকে যায় মানুষের আত্মা। ওই সব ভাল খুলির সামনে গিয়ে তাতে হাত রেখে নত হয়ে শ্রদ্ধা জানায়। প্রার্থনা করে। যাতে ওগুলো থেকে কিছু "ভাল" তাদের ভেতরেও ঢোকে।'

'অদ্ভুত ইচ্ছে! তবে ইচ্ছেটা ভাল। এভাবে ভাল হতে চাওয়াটাও ভাল।'

'আরও একটা ভাল ব্যাপার, মৃতকে মনে রাখে ওরা। আমরা তো কবর দিয়ে এসেই সব ভুলে যাই। এরা ভোলে না। একজন মানুষ যে ছিল ওদের মাঝে, সব সময় মনে রাখে।'

তৃতীয় দিনে কবর থেকে বেরিয়ে এল নগো। এতে অবাক হলো না গাঁয়ের লোক। সমস্ত কুসংস্কার আর জাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী ওরা। তা ছাড়া কবর থেকে উঠে আসার ঘটনা আরও শুনেছে ওরা। কোথায় নাকি কোনও এক শ্বেতাঙ্গ মিশনারীকে কবর দেয়া হয়েছিল। তিন দিনের দিন কবর থেকে উঠে এসেছিল সেই লোক।

কিন্তু কেবিনের দরজায় লোকটাকে দেখে তাজ্জব হয়ে গেল কিশোররা। গাছের ছাল জড়িয়ে মাটি চাপা দেয়া হয়েছিল নগোকে। তেমনি জড়ানোই আছে এখনও। মাটি লেগে রয়েছে। বিকেল হয়ে এসেছে। কেবিনের দরজায় আলো কম। তাই দেখে প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারল না ওরা। মুসা তো 'ভূত ভূত' করে চেঁচাতে লাগল।

কথা বলে উঠল ভূতটা, 'কয়েকটা দিন তোমাদের কোন সহযোগিতাই করতে পারিনি। দুঃখিত। কি করে করব? আমি যে মরে গিয়েছিলাম।'

'তার মানে মরেননি,' বিড়বিড় করল কিশোর।

'নিশ্চয় মরেছি। কয়েক দিন ধরে মরে থেকেছি। বিদেশী মানুষের দেশে চলে

গিয়েছিলাম। ঘুরে এসেছি সে-সব দেশ। ওখানে সবাই সাদা পোশাক পরে। আমার মরে যাওয়া পুরানো বন্ধুদের সঙ্গেও দেখা হয়েছে। তারপর মহান আত্মা আমাকে এখানে ফেরত পাঠিয়ে দিল। চলে এলাম। আবার বেঁচে উঠলাম।'

'কবর থেকে বেরোলে কি করে?'

'রোজই আমার বউয়েরা দেখতে আসে। একজন এসে দেখল আমি মাথা নাড়ছি। অন্যদেরকে ডেকে আনল সে। মাটি সরিয়ে আমাকে বের করল।'

'কি হয়েছে বুঝতে পারছি,' বাউয়েন আর দুই সহকারীকে বলল কিশোর। 'নগো মরেই গিয়েছিল। সাংঘাতিক কাহিল হয়ে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল। বউয়েরা মনে করেছিল মরে গেছে। কবর দিয়ে দিয়েছিল। ভাগ্যিস ওই অদ্ভুত নিয়ম-কানুন চালু রয়েছে ওদের, মৃতের মুখের কাছে গর্ত রেখে দেয়া। তাই শ্বাস নিতে পেরেছিল সে। তিনদিন অচেতন থাকার পর বিষের ক্রিয়া শরীর থেকে শেষ হয়ে গেলে হুঁশ ফিরেছে।'

উঠে গিয়ে টিন আর হাঁড়িপাতিল নাড়তে শুরু করলেন ক্যাপ্টেন। 'ভূত না হলে তো তার খাবার লাগবে। এ[illegible]দিন না খেয়ে থেকেছে। পেটের মধ্যে নিশ্চয় ছুঁচো নাচছে।'

'আমার সন্দেহ আছে,' কিশোর বলল। 'সাধার[illegible] বেহুঁশ নয়, কমায় চলে গিয়েছিল সে। অনেকটা হাইবারনেশন বলা চলে। শী[illegible]কালে শীতপ্রধান অঞ্চলের অনেক প্রাণী গুহায় ঢুকে যে অবস্থায় কাটায়, তেমনি। [illegible]তাতে খিদেটিদে পায় না। শরীরে জমানো চর্বির ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। শীতের শেষে গুহা থেকে যখন বেরোয়, রোগা হয়ে যায় শরীর, কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ থাকে। জন্তু-জানোয়ার যদি এভাবে কয়েক মাস না খেয়ে ঠিক থাকতে পারে, তিনচারদিন না খেয়ে মানুষ পারবে না কেন?' মোড়লের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'খিদে পেয়েছে?'

'না।' কিন্তু যখন সামনে খাবার দেয়া হলো, সুগন্ধ নাকে ঢুকল, মোচড় দিয়ে উঠল পেট। সঙ্গে সঙ্গে খেতে বসে গেল নগো। গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল। খাওয়া শেষে আরাম করে কেবিনের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে স্বপ্নের কথা বলতে লাগল। 'চমৎকার একটা দুনিয়া, বুঝলে। আবার আমি যেতে চাই ওখানে। তবে এবার আর ফেরার ইচ্ছে নেই। এত আরামের জায়গা ছেড়ে কে আসতে চায়?'

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল রবিন। 'লোকটা সত্যিই মনে করছে সে মরে গিয়েছিল!'

তেরো

মেজাজ খিঁচড়ে গেছে বব অ্যাঞ্জেলের।

এত চেষ্টা করছে, অথচ কিছুতেই মারতে পারছে না ছেলেগুলোকে। তার কাজ সে ঠিকমতই করছে, কিন্তু কপাল জোরে যেন অলৌকিক ভাবে বেঁচে যাচ্ছে

ওরা। মরেও মরে না, কি কাণ্ড! ফসকে বেরিয়ে যায়!

খুনগুলোকে দুর্ঘটনা হিসেবে সাজানোর চেষ্টা করছে সে। জানে, ছেলেগুলো মারা গেলে তদন্ত হবেই। কিভাবে মৃত্যু ঘটেছে, বের করার চেষ্টা করবে পুলিস। যদি ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করে বসে খুন হয়েছে ওরা, বব অ্যাঞ্জেলের কপালে দুঃখ আছে। এমনিতেই জেল থেকে পালানোর অপরাধে পুলিস লেগে আছে পেছনে। তার ওপর যদি নতুন করে ওই খুনের অপরাধ প্রমাণ করে ফেলে, তাহলে দুনিয়ার কেউ বাঁচাতে পারবে না ওকে। সেজন্যেই অনেক ভেবেচিন্তে হিসেব করে পা ফেলছে সে। নইলে তো এই জঙ্গলে সহজেই খুন করে ফেলতে পারত তিন গোয়েন্দাকে।

মুসাকে তীর মেরেছে। বোঝাতে চেয়েছে, তীরটা সে নয়, মেরেছে কোনও আদিবাসী। কিন্তু জান খুব শক্ত ছেলেটার। বেঁচে গেল। কিশোরকে মারতে চেয়েছে মাথায় ডাল ফেলে। ওটাও বেঁচে গেল। আর তৃতীয় ছেলেটাকে মারার কোন সুযোগই করতে পারেনি। তা ছাড়া যেন অদৃশ্য কোনও হাত সাহায্য করছে ওদেরকে। গাঁয়ের লোককে বিরূপ করে তোলার জন্যে নগোকে বিষ খাওয়াল। ওই লোকটাও তিনদিন পরে উঠে চলে এল কবর থেকে। কি করে উঠল, বুঝতেই পারছে না সে। ভেবে অবাক হচ্ছে। তবে কি সত্যি কোনও জাদু জানে লোকটা? যা-ই হোক, গাঁয়ের দু'জন লোককেও খুন করেছে বব। লড়াই লাগিয়ে দিতে চেয়েছে। সেটাও এখন পর্যন্ত সাফল্য আনেনি। লড়াই লাগলে গোলমালের ফাঁকে তীর কিংবা বল্লম দিয়ে মেরে ফেলতে পারত ছেলেগুলোকে। দোষটা পড়ত আদিবাসীদের ঘাড়ে।

বব অ্যাঞ্জেল কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তার মনে হতে লাগল, এ সবের পেছনে নিশ্চয় জাদুবিদ্যা কাজ করছে। কোনও অলৌকিক ক্ষমতা সাহায্য করছে ছেলেগুলোকে। আর মোড়লটারও কোনও ক্ষমতা আছে। ওসব নষ্ট করতে না পারলে কিছুই করতে পারবে না বব। সে নিজে জাদু জানে না। কাউকে দিয়ে করাতে হবে। কাকে?

ভাবতে গিয়ে একটা লোকের কথাই মাথায় এল তার। আইল্যানডেন গাঁয়ের ওঝা। গাঁয়ের পুবে পর্বতের দিকে চলে গেছে সে। খুঁজে বের করতে হবে তাকে। তবে তার আগে আরেকটা কাজ জরুরী হয়ে পড়েছে। খাবার জোগাড় করা। পাওয়া যাবে এখানেই, গাঁয়ে। গিয়ে খাবার চাইতে পারবে না। জেনে যাবে তিন গোয়েন্দা।

চুরি করতে গেলেও বিপদ হতে পারে। ধরা পড়ে যেতে পারে সে। অহেতুক ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। গ্রাম আরও আছে পর্বতের ওধারে। সেখানে গিয়ে চেয়ে দেখতে পারে। ওরা আইল্যানডেনদের শত্রু। ওখান থেকে কথাটা ফাঁস না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

খাঁড়ির কাছে চলে এল সে। গাছপালার আড়ালে লুকানো বোটটায় উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। নদী বেয়ে বের করে নিয়ে এল সাগরে। তারপর ঘুরে আরেকটা নদী দিয়ে চলে এল পর্বতের অন্যপাশের গ্রামটার কাছে। বোট ভিড়িয়ে নেমে পড়ল।

তাকে ছেঁকে ধরল গ্রামবাসীরা। তাদের মধ্যে দেখতে পেল সেই ওঝাকে। ভালই হয়েছে। খুশি হলো বব। এক কাজে দুই কাজ হয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে ওঝার মুখে থুথু ছিটাল সে। ওঝাও তার মুখে থুথু ছিটাল। এটা আন্তরিকতা জানানোর রীতি এখানে।

'তোমার সঙ্গে কথা আছে,' বব বলল। 'একা বলব।'

'আমার ঘরে এসো।'

কুঁড়েতে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল ওঝা। চকচক করছে চোখ। 'ছেলেগুলোকে খতম করার খবর দিতে এসেছ নিশ্চয়?'

'না। আমি খাবারের জন্যে এসেছি। বুনো জানোয়ারের মাংস ও ফল খেয়ে আর চলছে না। অন্য কিছু চাই। ব্যবস্থা করতে পারবে?'

'পারব। কিন্তু আমার শত্রুদের কি হবে? তাদেরকে মারলে না কেন?'

'অনেক চেষ্টা করলাম, মরে না। তীর মেরেছি একটাকে, বেঁচে গেল। আরেকটার মাথায় ডাল ফেলে মারতে চাইলাম, পড়লই না। নগোকে বিষ খাওয়ালাম। মারা গেল সে। কবর দেয়া হলো...'

'যাক, একটা তাহলে গেছে।'

'না, যায়নি। তিন দিনের দিন কবর থেকে উঠে পড়ল।'

চমকে গেল ওঝা। চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে রইল ববের দিকে।

'বলো কি? মরে গিয়ে বেঁচে উঠেছে!'

'হ্যাঁ, তাই।'

'খারাপ জাদু,' মাথা নাড়তে লাগল ওঝা। 'খুব খারাপ। তার মানে প্রচণ্ড ক্ষমতা পেয়ে গেছে নগো। মরে গিয়ে যদি বেঁচে উঠতে পারে, আরও অনেক কিছুই করতে পারবে সে। সাংঘাতিক অভিশাপ দিয়ে বসতে পারে তোমাকে।'

মাথা ঝাঁকাল বব। 'এই ভয়টাই আমি করছি। ধরো, আমাকে অভিশাপ দিয়েই বসল নগো, ক্ষতি করতে চাইল, তুমি কি ঠেকাতে পারবে? কিছু করতে পারবে আমার জন্য?'

'অভিশাপটা অকেজো করে দিতে পারি,' ওঝা বলল। বুনো শুয়োরের শির দিয়ে তৈরি একটা মালা বের করল। লকেটের জায়গায় ঝুলছে একটা কুৎসিত দর্শন মরা, শুকনো বিচ্ছু। 'নাও, গলায় পরো। এটা খুব শক্তিশালী তাবিজ। যে কোনও অভিশাপ দূর করে দিয়ে সৌভাগ্য আনতে পারে।'

দ্বিধা করতে লাগল বব। শেষে পরল ওটা, ঝুলিয়ে দিল শার্টের ওপরে।

'না, ওভাবে না,' বাধা দিল ওঝা। 'ভেতরে পরতে হবে। গায়ের সঙ্গে লেগে থাকতে হবে। নইলে কাজ হবে না।'

অগত্যা ভেতরেই ঢোকাল বব। জ্যান্তই হোক আর মৃতই হোক, কাঁকড়া বিছেকে দারুণ ভয় করে সে। ওটার হুল ফোটানোর ক্ষমতা এখন নেই, তবু খোঁচা লাগতে পারে। সেটাও মারাত্মক হতে পারে। কাজ উদ্ধারের জন্যে এখন সব অসুবিধে মেনে নিতে রাজি আছে সে। ওঝাকে বলল, 'পরের বার ভাল খবর নিয়ে আসব।'

'দাঁড়াও, জিনিস দিয়ে দিচ্ছি। যাতে কেবল ভাল খবরই আনতে পারো।'

একটা চামড়ার থলে বের করল সে। পেটটা ফোলা। মুখ খুলে ধরে ভেতরে তাকাতে বলল ববকে। ভেতরে কিছু ডিম দেখতে পেল বব।

'এই ডিম দিয়ে কি করব?'

ববের তাচ্ছিল্য দেখে হেসে উঠল ওঝা। 'তুমি ভাবছ পাখির ডিম? তা না। সাপের। কেউটে সাপ। ফোটার সময় হয়ে এসেছে।'

ভারত আর ইন্দোনেশিয়ার মত নিউ গিনিতেও প্রতি বছর বহুলোক মারা যায় এই সাপের কামড়ে। বাঁচার জন্যে দেবতা হিসেবে পূজা করে এই সাপকে। কামড় দেয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই মারা যায় মানুষ—তবে সেটা বড় সাপের হলে, বাচ্চা সাপের নয়, ববের সে-রকমই ধারণা।

থলেটা ঠেলে সরিয়ে দিল সে। 'এ দিয়ে আমার কোনও কাজ হবে না। এগুলোর বড় হওয়ার জন্যে পাঁচ বছর বসে থাকতে পারব না। ডিমফোটা বাচ্চার বিষই বা কতখানি, আর ক্ষতিই বা কি করবে।'

'ভুল করছ। ডিম থেকে বেরিয়েই খুন করার ক্ষমতা পেয়ে যায় এই সাপ। জাহাজটায় নিয়ে গিয়ে ঢেলে দিয়ে এসো, পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হবে না তোমাকে। এখনই নিয়ে যাও। ডিম ফোটার সময় হয়ে গেছে। আজ রাতেই তোমার শত্রুরা যখন ঘুমিয়ে পড়বে ঢেলে দিয়ে আসবে ডিমগুলো। তারপর দেখবে কি কাণ্ডটা ঘটে। কালকেই রওনা হয়ে যেতে পারবে দেশের উদ্দেশে, এখানে আর বসে থাকা লাগবে না।'

শেষ বিকেলে আবার এনে আগের জায়গায় বোটটা লুকাল বব। খাবার বোঝাই করে নিয়ে এসেছে। তবে এ সব খাবার তার পছন্দ নয়। দেশে থাকতে যে-সব জিনিস খেত, তা নয়। তবু খাবার তো। খেয়ে বাঁচতে হবে। ওঝা নিজে যা খায়, তাই দিয়েছে। শামুক, গোবরে পোকার বাচ্চা, কেঁচো, শুঁয়াপোকা, পাখির মাংস আর মগজ, ঘাসফড়িং, ঝিঁঝি পোকা, মাকড়সা, ব্যাঙ, বান মাছ, বাদুড়, ইঁদুর, গিরগিটি, বুনো জানোয়ারের মাংস, আর জানোয়ারের তাজা রক্ত।

কোনমতে এসব গিলতে হবে ববকে। বেঁচে থাকার জন্যে। তার শত্রুদের শেষ করার জন্যে।

থলের মুখ খুলে আরেকবার ভেতরে তাকাল সে। ডিম ফুটে ইতিমধ্যে বেরিয়ে গেছে একটা বাচ্চা। পুঁতির মত নিষ্প্রাণ চোখ মেলে চেয়ে রইল তার দিকে ফুটখানেক লম্বা বাচ্চাটা।

থলের মুখ বন্ধ করে দেয়ার আগেই পিছলে বেরিয়ে গেল সাপটা। গোখরোরই অনেক প্রজাতি আছে যেগুলো ছাড়া পেলেই পালাতে চায়। কিন্তু কিং কোবরা বা কালকেউটের স্বভাব অন্য রকম। দুনিয়ার সব কিছুর প্রতিই ওগুলোর ঘৃণা। পালাল না বাচ্চাটা। রুখে দাঁড়াল। ফণা তুলে ঘনঘন বের করতে লাগল ছোট কালো জিভটা। চোয়াল ফাঁক করে দেখিয়ে দিল মারাত্মক বিষদাঁত।

ভয় পেল বব। পাওয়ার মতই বটে। কেবিনের দরজার দিকে পিছিয়ে গেল সে। বেরিয়ে গেল ডেকে। তাকে অনুসরণ করল সাপটা। লেজ ধরে ওটাকে তোলার চেষ্টা করল সে, কিন্তু প্রতিবারেই তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ফেলল ওটা।

মহা শয়তান তো! ভাবল বব। সাপটার ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে ধীরে

ধীরে গায়ের জ্যাকেট খুলল। ওটা দিয়ে সাপটাকে চেপে ধরে ছুঁড়ে ফেলল পানিতে। যাক, গেল! ডুবে মরবে।

কিন্তু ববকে অবাক করে দিয়ে ডুবল না বাচ্চাটা। সাঁতরে আসতে লাগল আবার বোটের দিকে। তবে উঠতে পারল না। বোটের গা ঘেঁষে ঘুরে গিয়ে ডাঙায় উঠল। ঢুকে পড়ল ঘাসের ভেতরে।

ওঝার কথা বিশ্বাস করতে শুরু করল বব। এতটুকুন বাচ্চাও বড়গুলোর চেয়ে কম পাজি নয়। পারবে। ওগুলো খুন করতে পারবে কিশোর আর মুসাকে।

গা কাঁপছে তখনও ববের। কেবিনে এসে ঢুকল। খিদে পেয়েছে। কিছুক্ষণ বসে থেকে জিরিয়ে নিয়ে খাবার বের করল। কোনমতে কিছু কুখাদ্য গিলে নিয়ে ইয়া বড় এক আম বের করল। ভাগ্যিস এটা ছিল, নইলে কি যে হত! আম খেয়ে বমি ঠেকাল সে।

খেয়েদেয়ে শান্ত হয়ে ডিমের থলেটা নিয়ে তীরে নামল সে। বনের ভেতর দিয়ে চলল আইল্যানডেন গাঁয়ে। কিছুদূর এগিয়ে সরে এল নদীর কিনারে। শর্টকাট একটা পথ খুঁজে বের করেছে সে। সেটা ধরে এগোল। চেনা হয়ে গেছে পথ। অন্ধকারেও চিনে চিনে চলে যেতে পারবে এখন গাঁয়ে।

আকাশে ক্ষয়া ঘোলাটে চাঁদ। আবছা আলোয় পথ দেখে দেখে এগোল সে। গাঁয়ে এসে যখন ঢুকল সমস্ত গ্রাম তখন ঘুমিয়ে। কি আর করবে লোকে? রাতে কিছুই করার নেই এখানে। সময় কাটানোর কোনও উপায় নেই। তাই সন্ধে হলেই খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

জাহাজটাও অন্ধকার। মনে হয় না কেউ জেগে আছে। তবু সাবধান রইল বব। পা টিপে টিপে চলল। এসে দাঁড়াল পানির কিনারে। ভাল করে তাকিয়ে দেখল নলখাগড়ার ভেতরে কুমির লুকিয়ে আছে কিনা। মনে মনে গাল দিল হতচ্ছাড়া জানোয়ারগুলোকে। শয়তানগুলোর জ্বালায় পানিতেও নামা যায় না নিশ্চিন্তে। দেখা গেল না একটাকেও। পানিতে পা দিল। বরফের মত ঠাণ্ডা। খিঁচড়ে গেল মেজাজ। ভাবল—লোকে যদি জানত, খুন করা কত কঠিন কাজ, তাহলে কিছুটা হলেও সদয় হত খুনীর প্রতি।

কিছুদূর হেঁটে এগোল সে। বেশি পানিতে এসে সাঁতরাতে শুরু করল। থলেটা তুলে রেখেছে ওপরে। ধীরে ধীরে শব্দ না করে সাঁতরাচ্ছে।

জাহাজের কাছে পৌঁছে কান পাতল শোনার জন্যে। আগের মতই নীরব। ঘুমিয়ে আছে সবাই। যাক, ভালই হয়েছে, ভাবল সে।

থলের মুখ খুলল। এখন ছুঁড়ে দিলেই ডেকের ওপর পড়বে ওটা। ডিমগুলো ভেঙে বাচ্চা বেরিয়ে আসবে। কম করে হলেও চল্লিশটা ডিম রয়েছে ভেতরে। এতগুলো বাচ্চা বেরোলে সারা জাহাজে ছড়িয়ে পড়বে। ছেলেগুলোর পায়ের নিচে পড়বেই। ক্যাপ্টেনেরও। কামড় খেয়ে মরবে সবগুলো।

তারপর, এই স্কুনারের মালিক হয়ে বসবে বব। সোজা এটা নিয়ে চলে যাবে থার্সডে আইল্যান্ডে। ওখানে তার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে। ওদের সহযোগিতায় মুক্তো ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে চোরাচালান চালিয়ে যেতে পারবে অস্ট্রেলিয়ার উপকূল থেকে বিভিন্ন দ্বীপে। ওখানে মদের খুব চাহিদা। আদিবাসীদের কাছে মদ বিক্রি

করা বেআইনী। অনেক দিন আগে যখন এখানে এসেছিল বব, চুটিয়ে মদের ব্যবসা করেছিল।

আকাশ কুসুম কল্পনা করতে করতে থলেটা ছুঁড়তে যাবে এই সময় তাকে চমকে দিয়ে বেজে উঠল হুইসেল। নিশ্চয় নজর রেখেছেন ক্যাপ্টেন। অন্ধকারে জাহাজের দিকে মানুষ সাঁতরে যেতে দেখে সাবধান করে দিয়েছেন ছেলেগুলোকে।

তেতো হয়ে গেল ববের মন। ওঝার মন্ত্রে কোনও কাজ হয়নি। অযথা বিচ্ছুটা চামড়ার সঙ্গে লাগিয়ে রেখেছে। সৌভাগ্য বয়ে আনতে পারছে না ওটা।

নাহ্, থলে ছোঁড়া আর হলো না। তীরের দিকে রওনা হতে যাবে, এই সময় আবার বেজে উঠল বাঁশি। শেষ হলো বিচিত্র একটা কঁক শব্দ দিয়ে। ও, এই ব্যাপার। এতক্ষণে চিনতে পারল বব। বার্ড অভ প্যারাডাইজ। একজন আদিবাসী একটা পাখি দিয়ে গেছে গোয়েন্দাদেরকে। জাহাজে খাঁচায় বসে সেটাই ডাকছে। তীক্ষ্ণ বাঁশির মত ডাক।

হাঁপ ছাড়ল বব। তবু, আর ডেকে থলে ছোঁড়ার বুদ্ধিটা ভাল লাগল না। শব্দ হলে যে কেউ বেরিয়ে আসতে পারে দেখার জন্যে। যা করার নিঃশব্দে করতে হবে। ডেক ছাড়া আর কোথায় ফেলা যায় খুঁজতে শুরু করল সে। একটা কেবিনের পোর্টহোল দেখতে পেল। সাঁতরে কাছে চলে এল ওটার। এক হাত বাড়িয়ে ধার খামচে ধরে শুধু হাতের সাহায্যে উঁচু করল শরীরটা। ভেতরে উঁকি দিল। একটা কেবিন। ডেকে বেরোনোর দরজাটা বন্ধ। ভেরি গুড। থলেটা এখানে ফেললেই বোধহয় ভাল হয়। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোবে। কেউ ঢুকলেই কামড়ে দেবে। তারপর খোলা দরজা দিয়ে ডেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত জাহাজে। প্রতিটি মানুষকে খুন করবে।

আর দ্বিধা করল না বব। থলেটা ভেতরে ঢুকিয়ে ছুঁড়ে মারল। বোধহয় দেয়ালে লেগেই বাড়ি খেয়ে ডিমের খোসা ভাঙার মড়মড় শব্দ হলো। চিৎকার করে উঠল একটা কণ্ঠ, 'কে?'

কিছুই দেখার প্রয়োজন বোধ করল না আর বব। তাড়াতাড়ি সাঁতরে চলল তীরের দিকে। ডাঙায় উঠে হারিয়ে গেল বনের ভেতরে। ভাবল, পরে আবার ফিরে আসবে এখানে। জংলীদের সাথে মিলে কবর দেবে লাশগুলোকে, মায়াকান্না কাঁদবে। নিজের অজান্তেই মুচকি হাসি ফুটল তার ঠোঁটে।

*

চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। 'কি হলো?'

'আজ আবার কিছু ঘটেছে,' জবাব দিল মুসা।

'কাণ্ডটা শুরু হলো কি!' রবিন বলল।

'পোর্টহোল দিয়ে কি যেন ঢুকল মনে হলো। দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ভাঙল,' গাগন বলল।

'স্বপ্ন না তো?' রবিনের প্রশ্ন।

'উঁহু। জেগে ছিলাম। প্রথমে পাখিটা চিৎকার করে উঠল। একটু পরেই পোর্টহোল দিয়ে কেবিনে এসে পড়ল কি যেন।'

‘বাদুড়-টাদুড় হতে পারে। ভুল করে ঢুকে পড়েছে। ঘুমাও।’

‘বাদুড় ওভাবে ঢুকতেই পারে না।’ ঘুমাল না কিশোর। বরং আলো জ্বেলে দেখল। চেঁচিয়ে উঠল, ‘সর্বনাশ! কিলবিল করছে সাপের বাচ্চা!’

সামান্য তন্দ্রা যা-ও বা ছিল মুসা আর রবিনের, দূর হয়ে গেল। পুরোপুরি জেগে গেছে। লাফিয়ে উঠে বসতে গিয়ে কেবিনের ছাতে বাড়ি লাগল মুসার মাথা। ওপরের বাংকে রয়েছে সে। নিচে তাকিয়ে দেখল মেঝেতে শুধু সাপ আর সাপ।

বাংক থেকে ঘুমজড়িত কণ্ঠে ক্যাপ্টেন বললেন, ‘কি বললে? সাপ?’ নিচে তাকালেন। ‘ও, বাচ্চা সাপ। কিছু করবে না।’

কিন্তু কিশোর চিনতে পেরেছে বাচ্চাগুলোকে। আসার আগে চিড়িয়াখানায় অকারণে যাতায়াত করেনি। ফণা তুলে রেখেছে কয়েকটা বাচ্চা। মারাত্মক বিষাক্ত কালকেউটের বাচ্চা, চিনতে অসুবিধে হলো না তার।

‘কেউটে!’ বলল সে। ‘ছোট বটে। কিন্তু ওরকম একটাই আপনাকে খুন করে ফেলার জন্যে যথেষ্ট।’

দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে ফার্স্ট-এইড কিটটা। হাত বাড়িয়ে পেড়ে নিল সেটা। ‘কামড় খাওয়ার আগেই তৈরি হয়ে যাওয়া ভাল।’

সিরিঞ্জে অ্যান্টিটক্সিন ভরে প্রথমে মুসাকে ইনজেকশন দিল সে। তারপর রবিন আর ক্যাপ্টেনকে। সব শেষে নিজেও নিল।

দরজার দিকটা দেখিয়ে মুসা বলল, ‘ভয় দেখিয়ে হয়তো বের করে দেয়া যাবে।’

‘খবরদার,’ বাধা দিল কিশোর। ‘খুলো না। জানোয়ারগুলোকে কামড়ে মেরে ফেলবে।’

‘না বের করলে তো আমাদেরকে মারবে। অ্যান্টিটক্সিন যে কাজ করবেই, শিওর হয়ে বলতে পারো না।’

‘করবে। আর কামড় খেতে যাবই বা কেন আমরা। সতর্ক থাকব। নড়বে না। চুপ করে শুয়ে থাকো।’

স্নেক গ্লাভস পরল কিশোর। একটা ব্যাগ বের করল। বলল, ‘যে-ই ছুঁড়ে দিয়ে থাকুক, একটা মস্ত উপকার করেছে আমাদের।’

হাঁ হয়ে গেছেন ক্যাপ্টেন। ‘খুব ঠাণ্ডা মাথার ছেলে তুমি। এ রকম সময়ে সাপের বাচ্চা ধরতে যাচ্ছ।’

হেসে উঠল কিশোর। ‘ধরার এটাই সবচেয়ে ভাল সময়।’

মোটা দস্তানায় হাত ঢাকা। সাপের দাঁত ওটা ভেদ করে চামড়ায় ঢুকতে পারবে না। পায়ে পরেছে ভারি বুট। সেখানেও কামড় বসাতে পারবে না সাপ। সব রকমে তৈরি হয়েই সাবধানে এগোল বাচ্চাগুলোর দিকে। খপ করে একটা বাচ্চার ঘাড় চেপে ধরে থলেতে ঢোকাল।

‘আমি আসি?’ মুসা বলল। ‘তোমাকে সাহায্য করব।’ হাত নিশপিশ করছে তার।

রবিনও সাহায্য করতে চাইল।

'চুপ করে বসে থাকো,' দু'জনকেই বলল কিশোর। 'সবাই মিলে কামড় খাওয়ার দরকার নেই।'

কিন্তু ততক্ষণে বুট পরতে শুরু করেছে মুসা। অনেক শুয়ে থেকেছে। কিছু একটা করতে চায়। নেমে পড়ল মেঝেতে। সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে সাপ। সেগুলোর মাঝখান দিয়ে চলার সময় রীতিমত জংলী-নৃত্য নাচতে হলো তাকে। সে-ও হাতে দস্তানা পরে নিয়েছে। দু'হাতে দুটো বাচ্চা ধরে থলেতে ঢোকাল। কিশোরের চেয়ে ভাল পারছে সে। ছোবল মারার চেষ্টা করছে সাপ। ঝট করে হাত সরিয়ে আনছে মুসা। পরক্ষণে আরেক হাত দিয়ে ঘাড় চেপে ধরছে।

সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে সাপের বাচ্চা। বাংকে বসে তাকিয়ে আছে রবিন। কিশোর আর মুসাকে সাহায্য করার জন্যে নামবে কিনা বুঝতে পারছে না। দ্বিধা করতে করতে শেষে মুসার মত বুট পরে নেমেই পড়ল।

ক্যাপ্টেনের মনে হলো, ভারি কিছু দিয়ে শরীরটাকে ঢেকে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ। কম্বল দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে ফেললেন তিনি। অযথা শরীর খোলা রেখে কামড়ের ঝুঁকি নেয়ার কোনও মানে হয় না।

পায়া বেয়ে উঠে পড়ল একটা বাচ্চা। হঠাৎ ক্যাপ্টেনের বুকে শিরশির করে উঠল কি যেন। আতঙ্কে চিৎকার করে এক টানে কম্বল সরিয়ে বুকে থাবা মারলেন তিনি। ঘরের মাঝখানে উড়ে গিয়ে পড়ল সাপের বাচ্চা। এমন জোরে চেঁচাতে লাগলেন যেন মেরে ফেলা হচ্ছে তাঁকে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় শাসালেন, 'আর কোনদিন যদি তোমাদের মত পাগলকে জাহাজ ভাড়া দিই তো আমার নাম বাউয়েন নয়!'

তার কথা যেন কানেই ঢুকল না তিন গোয়েন্দার। সাপ কুড়াতে ব্যস্ত ওরা।

অবশেষে যে ক'টা সাপ চোখে পড়ল ওদের সব তুলে থলেতে ভরল ওরা। ক্যাপ্টেনকে খেপানোর জন্যেই কিশোর বলল আরেক দিকে তাকিয়ে, 'যা পেলাম তা তুললাম। কিন্তু দু'তিনটে যে বাংকের তলায় ঢুকে গেছে ওগুলোর কি করি।'

'কিচ্ছু করার দরকার নেই!' ফেটে পড়লেন বাউয়েন। 'ওগুলো ওগুলোর জায়গায় থাক। খোঁচাতে হবে না। ঘুমোতে দাও আমাকে। কয়েকটা বাচ্চা সাপ, তা নিয়ে আবার এত কাণ্ড...'

'কয়েকটা বাচ্চার দাম কত জানেন? কম করে হলেও পাঁচ হাজার ডলার।' থলের মুখ বন্ধ করতে করতে কিশোর বলল। তারপর যেন নিজেকেই বোঝাল, 'আজ রাতটা ব্যাগের মধ্যেই থাক। কাল খাঁচায় ঢোকাব।'

*

বাকি রাত অস্থিরতা আর উত্তেজনার মধ্যে কাটাল বব। ভাল ঘুম হলো না। ভোর হতেই উঠে চলে এল বিদেশীদের কবর দেয়ার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। কিন্তু গাছের আড়াল থেকে জাহাজের দিকে তাকিয়েই বোকা হয়ে গেল সে। কালো হয়ে গেল মুখ। ডেকে টেবিল চেয়ার পেতে নাস্তা করতে বসেছে তিন গোয়েন্দা আর ক্যাপ্টেন।

চোদ্দ

আবার জন্তু-জানোয়ার ধরতে বেরোল দলটা। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে ডিয়া আর নগোও চলল। কমবেশি সুস্থ হয়ে গেছে সবাই। বনের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে ধরার মত জানোয়ার খুঁজতে লাগল ওরা, একমাত্র ডিয়া বাদে। নিচের দিকে তাকিয়ে পথ চলছে সে। জানোয়ারের কথা একবারও ভাবছে না। সে খুঁজছে মাথা। একটা মাথা ইতিমধ্যেই পেয়েছে, তবে তত ভাল না। ভাল জিনিস চায় সে।

'বেরোনোর পর থেকে একটা কথাও বলোনি।' মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

মুখ তুলে তাকাল ডিয়া। বাদামী মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ। 'না, তেমন কিছু না।'

'তেমন কিছু তো বটেই। কি হয়েছে? বলো?'

'লোকেরা...আমাকে নিয়ে মজা করে।'

'কেন?'

'আমি কোনও মাথা জোগাড় করতে পারিনি বলে।'

'কিসের মাথা?'

'মানুষের,' হাতেরটা দেখাল ডিয়া। 'এ রকম।'

'কি দরকার?'

'বড় মানুষ হওয়ার জন্যে। যতদিন একটা মাথা জোগাড় করতে না পারব ততদিন বড় হলেও বড় ধরা হবে না আমাকে, পুরুষ বলা হবে না। কেন, তোমাদের দেশে কারও মাথা কাটতে হয় না?'

'আমাদের দেশে একটা মাথা কাটলেই জেলে যেতে হবে।'

জেল কি সেটা বোঝাতে অনেক বেগ পেতে হলো মুসাকে।

কি বুঝল ডিয়া কে জানে, শুধু বলল, 'ও। তাহলে টামবারানে রাখার জন্যে মাথা পাও কোথায়?'

'আমাদের দেশে টামবারানও নেই।'

'বলো কি? অবাক কাণ্ড!'

'হ্যাঁ, তোমার কাছে অবাক লাগবে। তোমাদের রীতিনীতি যেমন আমাদের কাছে লাগে।'

'তাহলে পুরুষ যে হয়েছ কি দিয়ে প্রমাণ করবে?'

'পুরুষের মত আচরণ করব, তাহলেই হবে। ভাল করে ভেবে দেখো, কারও মাথা কাটলেই পুরুষ হওয়া যায় না। ধরো, এর জন্যে কোনও মেয়েলোক কিংবা শিশুর মাথা তোমাকে কাটতে হলো। ওরা তো তোমাকে বাধা দিতে পারবে না, গায়ের জোরে পারবে না। তাহলে বীরত্বটা দেখালে কোথায়?'

'অত শত বুঝি না। মাথা একটা দরকার, জোগাড় করতেই হবে। নইলে পুরুষ হতে পারব না। ছোট মানুষই থেকে যাব। পাহাড়ের ওপারের গাঁয়ে যাবে আমার সঙ্গে? শত্রুদের গাঁয়ে? বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকব। খেলতে খেলতে কোন ছেলেমেয়ে চলে এলে ধরে মুণ্ডটা কেটে নিয়ে চলে আসব।'

'ডিয়া, কাজটা কি ভাল হবে মনে করো?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না ডিয়া। মাথা নিচু করে হাঁটতে লাগল। একসময় স্বীকার করল, 'না, তা হবে না। কিন্তু এটাই আমাদের রীতি। আমার একটুও ভাল লাগে না এসব খুনোখুনি। ঘৃণা করি আমি। কি করব, বলো?'

'না করলেই পারো। তুমি বড় হয়েছ। বুদ্ধি হয়েছে। বিবেচনা আছে। নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কেন করবে এ রকম একটা খারাপ কাজ?'

ডিয়ার জন্যে এটা একটা নতুন [illegible]না। এমন ভঙ্গিতে মুখ তুলে তাকাল মুসার দিকে, যেন এই প্রথম দেখছে ওকে। 'কিন্তু আমাদের রীতি?'

'বদলে ফেলো। গাঁয়ের সব ছেলেদের নেতা হতে পারো তুমি। ওদেরকে বোঝাতে পারো। ওরা তোমার দলে চলে আসবে। তোমার কথা মেনে নেবে। আসলে খারাপ কাজকে কেউই পছন্দ করতে পারে না। অনেক ভাল ভাল রীতি চালু করতে পারো তোমাদের গাঁয়ে। খারাপ রীতি বর্জন করাই ভাল মানুষের কাজ।'

জবাব দিল না ডিয়া। নতুন এক জগতের সন্ধান পেয়েছে যেন। চিন্তিত দৃষ্টি। বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। যেন ইতিমধ্যেই বড় হয়ে গেছে।

'ওই যে,' হাত তুলল সে। 'ক্যাঙারু।'

ঝোপের ভেতরে তাকাল মুসা। দেখতে পেল না। 'কই? কোথায়?'

'গাছের ওপর।'

'ক্যাঙারু গাছ বাইতে পারে না।'

'আমাদের এখানকারগুলো পারে। দেখোই না। বললে ধরতে পারি।'

আগে আগে হাঁটছিল কিশোর, রবিন আর নগো। মুসা আর ডিয়াকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে ফিরে এল।

প্রাণীটাকে দেখে কিশোর বলল, 'চমৎকার [illegible]বে। অস্ট্রেলিয়ান ক্যাঙারুর চেয়ে আলাদা। কি নাম দেয়া যায় এটার? গেছো ক্যা[illegible]রু?'

নাম যা খুশি দিকগে, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই ডিয়ার। গাছ বেয়ে উঠতে আরম্ভ করল সে। যেন ওই জীবটার মতই আরেকটা গেছো ক্যাঙারু সে। তাকে উঠতে দেখে আরও ওপরে উঠে গেল জানোয়ারটা। মাদী জীব। পেটের কাছে থলে থেকে উঁকি দিয়ে আছে একটা বাচ্চা। বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রয়েছে কৌতূহলী দৃষ্টিতে।

সাধারণ ক্যাঙারু তার থাবা ব্যবহার করতে পারে না, ছোট আর দুর্বল বলে। কিন্তু গাছে থাকতে থাকতে গেছো ক্যাঙারুর থাবা শক্ত হয়ে গেছে। বড় নখও আছে। গাছের বাকল আঁকড়ে ধরে চড়ার সুবিধের জন্যে।

'লেজটা তো দেখি শরীরের চেয়ে লম্বা,' মুসা বলল। 'বানরের মত লেজে ঝুলতে পারে নাকি?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'না। বানরের মত লেজ নয়। আরেকটা পায়ের মতই

কাজ করে এটা। দেখো ভাল করে, কিভাবে কাজ করছে।'

ডালের ওপর দিয়ে আরও সরে যাচ্ছে ক্যাঙারুটা। যাতে ডিয়া ধরতে না পারে। ডালে হাঁটা সহজ নয়। লেজটা লম্বা করে দিয়ে আরেকটা ডালে ঠেকিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখছে জীবটা, তারপর স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলে যাচ্ছে ডাল দিয়ে।

ডাল ধরে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ডিয়াও এগোতে থাকল। আটকে গেল ক্যাঙারু। আর এগোনোর জায়গা নেই। সবে তার গায়ে হাত ছুঁইয়েছে ডিয়া, এই সময় লাফ দিল ওটা। চল্লিশ ফুট উঁচু থেকে।

'খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'মারা পড়বে তো!'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'বুঝেই লাফ দিয়েছে। মরবে না। দেখো।'

কিশোরের অনুমানই ঠিক। এত উঁচু থেকেও আলগোছে লাফিয়ে নেমে পড়ল ক্যাঙারুটা, কিছুই হলো না। পা তো নয়, যেন ইস্পাতের স্প্রিং। ঝাঁকুনিটা ঠিক হজম করে নিল।

'ধরো! ধরো!' বলে চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

ছুটে গেল কিশোর আর রবিন। দু'দিক থেকে দুটো থাবা ধরে ফেলল। শরীর মুচড়ে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করল ক্যাঙারুটা। শক্ত করে ধরে রাখল দু'জনে।

এগিয়ে এসে ঘাড় চেপে ধরল মুসা। 'কামড়াবে না তো?'

'কি জানি। সরে থাকো। লাথি মারতে পারে। পেছনের পায়ের লাথি খেলে চিত হয়ে যাবে।'

কিন্তু তৃণভোজী প্রাণীটা সে-রকম কিছুই করল না। ভয়ে কুঁকড়ে রয়েছে। নিচু গলায় ওটার সঙ্গে কথা বলতে লাগল মুসা, 'ভয় পাসনে, ক্যাঙারু। কিছু করব না তোকে। মারব না।'

বাচ্চাটাকে দেখতে পেল না। থলের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল কিশোর। আছে। বড় বড় চোখ মেলে থাকা বাচ্চাটা বড়জোর ফুটখানেক লম্বা।

'এত ছোট,' মুসা বলল। 'এইমাত্র জন্মাল নাকি?'

'আরে না। এ তো অনেক বড় হয়েছে। জন্মের সময় মাত্র এক ইঞ্চি লম্বা থাকে ক্যাঙারুর বাচ্চা।'

বাচ্চাটাকে আবার থলেতে ছেড়ে দিল কিশোর।

ভাল একটা জানোয়ার পাওয়া গেছে। ওটার গলায় দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে এগোল দলটা আবার। খানিক দূর এগিয়েই ওপর দিকে তাকিয়ে থেমে গেল মুসা। বড় একটা ইউক্যালিপটাস গাছের নিচু ডালে যেন একটা খেলনা টেডি ভালুক ফেলে রেখে গেছে কোনও বাচ্চা মেয়ে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে মুসা, হঠাৎ যেন প্রাণ পেয়ে গেল খেলনা ভালুক। দ্রুত গাছ বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে চায়। ওটাকে ধরে ফেলল মুসা। ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করল না জীবটা। জুলজুল করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। যেন জানতে চায়, 'শত্রু, না বন্ধু?'

'বন্ধু,' হেসে অভয় দিল যেন জানোয়ারটাকে মুসা। আরও ওরকম জানোয়ারের জন্যে আশপাশের গাছে তাকাতে লাগল।

'অন্য গাছে তাকিয়ে লাভ নেই,' কিশোর বলল। 'ইউক্যালিপটাস ছাড়া আর

কোনও গাছের পাতা খায় না কোয়ালা।'

'এত ছোট। আসলেই কি ভালুক?'

'না। ওই দেখতেই যা ভালুকের মত।'

'কোয়ালা মানে কি?'

'যে পানি খায় না।'

'তা কি করে হয়। পানি ছাড়া প্রাণী বাঁচে না।'

'কোয়ালা বাঁচে। শিশির আর ইউক্যালিপটাসের পাতা থেকে যা রস সংগ্রহ করে তাতেই হয়ে যায়। ভালই হয়েছে। খুশি হবেন চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর।'

ক্যাঙারুর দড়িটা বাড়িয়ে দিয়ে মুসা বলল, 'ধরো। আমি ভালুকটাকে কিছু পাতা খাওয়াই।'

বড় বড় কিছু রসাল পাতা ভেঙে কোয়ালার দিকে বাড়িয়ে ধরল মুসা। বন্ধুত্ব হতে দেরি হলো না। গত কয়েকশো বছরে মানুষ কোয়ালার সঙ্গে কোনরকম শত্রুতা করেনি, ফলে মানুষকে ভয় পায় না এরা। কয়েকটা পাতা খেয়েই আরাম করে এসে মুসার কাঁধে চেপে বসল ওটা। পালাবে বলে মনে হয় না। তবু নতুন ধরা হয়েছে তো। বলা যায় না। তাই একহাতে ওটাকে ধরে রাখল সে।

আরও কিছু ছোট প্রাণী ধরা হলো। এই যেমন গ্রেট ফ্লাইং ফ্যালাঞ্জার। তবে যেটাকে ধরা হয়েছে সেটা তেমন উড়তে পারে না। কারণ এখনও বাচ্চা। ওড়ার কায়দাটা ভালমত রপ্ত করতে পারেনি। বড় হলে গাছ থেকে গাছে সহজেই উড়ে বেড়াতে পারবে উড়ুক্কু কাঠবিড়ালী কিংবা ফ্লাইং ফক্সের মত। উড়তে গিয়ে ডিয়ার সামনে পড়ে গিয়েছিল। খপ করে ধরে ফেলেছে সে।

নগো ধরল একটা কাসকাস। চমৎকার রোমশ চামড়া। লম্বা লেজ। আর বড় বড় চোখ।

খরগোশের আকারের আরেকটা প্রাণী ধরল রবিন। ক্যাঙারু গোষ্ঠীর এই জীবটার নাম ব্যানডিকুট। লম্বা শক্তিশালী পা, পিঁপড়েভুকের মত নাক, আর ধারাল নখ আছে।

একটা বাচ্চা কেশোয়ারী পাখি ধরা হলো। উড়তে পারে না এরা। উটপাখির মত অনেক বড় হয়।

সব শেষে ধরা হলো একটা ওরাং-উটাং। যেটা নিউ গিনিতে দুর্লভ।

সেদিনের মত জানোয়ার ধরা শেষ হলো। গাঁয়ে ফিরে চলল মানুষ আর জন্তুর বিচিত্র দলটা।

পনেরো

পরদিন খারাপ সংবাদ নিয়ে এল ডিয়া। ডেকে দাঁড়িয়ে ছিল তখন মুসা। ছেলেটার চেহারা দেখেই অনুমান করল কিছু হয়েছে। কেঁদে কেঁদে লাল হয়ে গেছে চোখ।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আমার বোন···মারা গেছে।'

বেরিয়ে এল কিশোর। 'কে মারা গেছে?'

'আমার বোন। নদীতে গোসল করতে নেমেছিল। হাঙরে মেরেছে।'

'কি করে বুঝলে?'

'যে মেরেছে সেটার সারা গা সাদা। পিঠে একটা উঁচু পাখনা, সেটা কালো। অনেক বড়। প্রায় এই জাহাজটার সমান। মুখটা দরজার সমান বড়।'

'বাড়িয়ে বলছে,' মুসার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। 'তবে শুনে মনে হচ্ছে সাদা হাঙর। ভয়াবহ খুনী। হাঙর পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক। সেজন্যেই এর নাম রাখা হয়েছে দা হোয়াইট ডেথ বা শ্বেত মৃত্যু।' ডিয়ার দিকে ফিরে বলল, 'চলো, তোমার বোনকে দেখি। সত্যিই মারা গেছে, না শুধু বেহুঁশ হয়েছে। কোথায় ও?'

'চলে গেছে।'

'কই গেল?'

'হাঙরের ভেতরে।'

ক্যাপ্টেন বাউয়েনও শুনছিলেন। বললেন, 'বানিয়ে বলছে। অন্য কিছু হবে। হাঙর থাকে সাগরে। নদীতে আসে না।'

'আমি বিশ্বাস করছি,' কিশোর বলল। 'আপনি সাগর চেনেন, ক্যাপ্টেন, কিন্তু নদী সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন না, বুঝতে পারছি। হাঙরেরা নদীতেও ঢুকে পড়ে। আমাজনের দু'হাজার মাইল ভেতরেও হাঙর পাওয়া গেছে। এমনকি লেক নিকারাগুয়ার মিষ্টি পানিতেও হাঙর বাস করে।'

'দূর,' হাত নেড়ে কিশোরের কথা উড়িয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। 'আমি বিশ্বাস করি না।'

'করবেন, এখনই।' রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিশোর। 'দেখে যান।'

ডেকের কিনারে এসে নিচে তাকালেন বাউয়েন। সাবমেরিনের সমান বিরাট একটা প্রাণী সাঁতার কাটছে। তিন কোনা কালো পাখনা বেরিয়ে রয়েছে পানির ওপরে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে থেকে কিশোরের দিকে ফিরলেন তিনি, 'ঠিকই বলেছ। হাঙরটাই। হোয়াইট শার্ক। যা সাইজ দেখছি, তিন টনের কম হবে না। কিন্তু আস্ত একটা মেয়েকে খেল কি করে?'

'শ্বেত হাঙর আস্ত ঘোড়া খেয়ে ফেলেছে বলে শোনা যায়,' কিশোর বলল। 'ওই দেখুন, কামড়ে এখন আপনার জাহাজটাকেও খেয়ে ফেলার চেষ্টা করছে।'

'আরি! ভীষণ ত্যাঁদড় তো! ব্যাটাকে শায়েস্তা করা দরকার।' দৌড়ে নিচে চলে গেলেন ক্যাপ্টেন। উঠে এলেন রাইফেল নিয়ে। গুলি করলেন। হাঙরের গায়ে লেগে পিছলে গেল বুলেট, গাছে লাগলে অনেক সময় যেমন হয়, তেমনি বিইং করে চলে গেল গাঁয়ের ভেতর।

'বাদ দিন,' কিশোর বলল। 'পারবেন না। বরং পিছলে গিয়ে মানুষের গায়ে গুলি লাগতে পারে ডেথ নীডল নিয়ে আসি।'

যে যন্ত্রটার নাম ডেথ নীডল, ওটা অনেকটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জের মতই দেখতে, তবে অনেক বড়। ভেতরে স্ট্রিকনিন নাইট্রেট ভরা থাকে। ফায়ার করা হয় বন্দুকের সাহায্যে। হাঙরের পুরু চামড়াতেও ঢুকে যায় সুচ, ভেতরের বিষ ছড়িয়ে পড়ে রক্তে। অনেক বড় মাছকেও মেরে ফেলে তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে।

ডেথ নীডল ছুঁড়ল কিশোর। হাঙরের চামড়ায় ঢুকলও। কিন্তু তিরিশ সেকেন্ড পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কিছু ঘটল না। এক মিনিট গেল…পাঁচ…দশ…

নাহ্, কিছুই তো হচ্ছে না!

নদীর পাড়ে এসে জমা হয়েছে গাঁয়ের লোক। অনেকের হাতে তীর-ধনুক। একঝাঁক তীর উড়ে এল হাঙরটার দিকে। কিছু তীর চামড়ায় লেগে পিছলে চলে গেল, কিছু কিছু বিঁধল, বড় জোর একআধ ইঞ্চি। বিঁধে রইল শজারুর কাঁটার মত। পাত্তাই দিল না হাঙরটা।

টারু নামে একটা লোক এগিয়ে এল। গাঁয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ সে। প্রায় সাত ফুট লম্বা। পেটানো স্বাস্থ্য। যেন একটা দৈত্য। চোখা বল্লম হাতে পানির কিনারে এসে দাঁড়াল সে। হুল্লোড় করে উঠল জনতা। হ্যাঁ, কেউ যদি শায়েস্তা করতে পারে হাঙরটাকে, টারুই পারবে, ওদের ধারণা।

তীরে থেকে বল্লম ছুঁড়ল না টারু। নেমে গেল পানিতে। দানবটার মুখোমুখি হওয়ার জন্যে। বল্লম তুলল সে। বাদামী চামড়ার নিচে কিলবিল করে ফুলে উঠল পেশী। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে হাঙরের কপাল সই করে বল্লম ছুঁড়ল। মাংসের অনেক গভীরে ঢুকে গেল ফলা। কিন্তু সামান্যতম কাঁপল না হাঙরটা। কিছুই হলো না ওটার। কপালের ওপর বল্লম বিঁধে রইল পুরাকথার ইউনিকর্নের শিং-এর মত।

তীরের দিকে ফিরে আসছে টারু। বুঝতে পারেনি হাঙরটা তাকে আক্রমণ করবে। লেজের প্রচণ্ড এক বাড়ি দিয়ে তাকে চিত করে ফেলল ওটা। কামড়ে ধরল কোমরের কাছটায়। বড় বড় তিন কোনা দাঁতগুলো বসে গেল মাংসে। চিৎকার করে উঠল টারু।

খেপে গেল ডিয়া। শয়তানটা তার বোনকে খেয়েছে। এখন তারই আরেক গ্রামবাসীকে খেতে চলেছে। দানবটাকে ঠেকানো এখন তার কর্তব্য।

'দেখি, তোমার কুড়ালটা দাও তো,' জরুরী কণ্ঠে কিশোরকে বলল সে। কোন কুড়ালের কথা বলছে বুঝতে পারল কিশোর। সাংঘাতিক ধারাল ইস্পাতের হাত-কুড়ালটার কথা বলছে।

'কি করবে?'

'খুন করব শয়তানটাকে।'

'পাগল। তোমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধা যা পারেনি, তুমি একটা হাতকুড়াল দিয়ে তা পারবে?'

'চেষ্টা তো করতে হবে।'

টারুকে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে হাঙরটা।

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, 'কিছুই করতে পারবে না। গ্রাম কোপাবে আর ওটা চুপ করে থাকবে মনে করেছ?'

'এত কথা শুনতে চাই না। কুড়ালটা দেবে কিনা বলো?'

টারুর আর কোনও আশা নেই, বুঝে গেছে কিশোর। কিছুই করার নেই আর। তবে ডিয়ার সাহসকে মনে মনে শ্রদ্ধা জানাল সে। এনে দিল কুড়ালটা।

'বড় দেখে একটুকরো মাংস দাও,' কুড়ালের ধার পরখ করতে করতে বলল ডিয়া।

বেহুঁশ হয়ে গেছে টারু। কিংবা মরেও গিয়ে থাকতে পারে। ছটফটও করছে না আর। নির্বিবাদেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে যাচ্ছে হাঙরটা।

গরুর রানের একটা বড় অংশ এনে দিল কিশোর। তারপর অবাক হয়ে দেখতে লাগল ডিয়া কি করে।

দেখতে দেখতে টারুকে শেষ করে ফেলল দানবটা। তারপরেও যেন খিদে মেটেনি ওটার। ধীরে ধীরে সাঁতার কাটছে ওই জায়গাতেই। আরও শিকারের আশায়। তার কাছে গেল না ডিয়া। নদীর উজানের কাছে পানিতে একটা পাথর উঁচু হয়ে আছে। হেঁটে ওখানটায় গিয়ে সাঁতরে উঠল পাথরটাতে। হাঁটুপানিতে দেবে রয়েছে পাথরের কিনারা, সেখানে চলে এল সে। তারপর গোশতের টুকরো এক হাতে, আর আরেক হাতে কুড়াল নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

*

গাঁয়ের কাছে আসার আগে খাঁড়িতে ঢুকেছিল হাঙরটা। খাবারের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে। গন্ধ আসছিল বোটের ভেতর থেকে। কাজেই ঢুঁ মেরে বোট ভেঙে খাবার জোগাড়ের চেষ্টা চালিয়েছিল ওটা। বোটের তলায় একটা ফোকর করে ফেলেছে।

ডায়ারি লেখার অভ্যেস আছে ববের। বসে বসে লিখছিল। কাঠ ভাঙার শব্দে চমকে গিয়ে ডায়ারি লেখা বন্ধ করে খাতাটা ব্রীফকেসে ঢুকিয়ে দেখতে গেল কি হচ্ছে। হাঙরটাকে দেখে একটা লাঠি দিয়ে ওটাকে পেটাতে শুরু করল সে।

কেয়ারই করল না হাঙর। সে তখন কিছু হাঁড়ি-পাতিল খুঁজে পেয়েছে। তাতে খাবারের গন্ধ। ওগুলোই টপাটপ গিলতে শুরু করল। হাঙরের খাবারের বাঁধাধরা কোনও নিয়ম নেই। যা পায় তাই গিলতে থাকে।

ববের চেঁচামেচিতেই তার প্রতি আকৃষ্ট হলো হাঙরটা। ফোকরের ভেতর থেকে মাথা বের করল দেখার জন্যে কে তাকে বিরক্ত করছে। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে পানি ঢুকে পড়ল বোটের ভেতরে। তলিয়ে যেতে লাগল দ্রুত। চোয়ালের নাগালে ববকে পেল না বটে হাঙর, তবে লেজ দিয়ে ঠিকই পেল। মারল এক ঝাপটা। উড়ে গিয়ে তীরে পড়ল বব, তার ভাগ্য ভালই বলতে হবে। কারণ পানিতে পড়লে তাকে খেয়ে ফেলত হাঙরটা।

বেহুঁশ হয়ে গেল বব। পড়ে রইল মরার মত।

ডুবে গেল বোট। গেলার মত অনেক জিনিস পেল হাঙর। গিলল সেগুলো। এমনকি ব্রীফকেসটাও। তারপর ধীর গতিতে রওনা হলো গাঁয়ের দিকে। এসে পেয়ে গেল ডিয়ার বোনকে। গিলল তাকেও। আরও খাবারের আশায় ঘুরঘুর করতে থাকল। আর বোকার মত এসে তার চোয়ালে ধরা দিল টারু নামের গ্রামবাসী লোকটা।

*

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ডিয়াকে।

হাঙরের ঘ্রাণশক্তি খুবই তীক্ষ্ণ। রক্তমাংসের গন্ধ পেয়ে চলে এল নদীর উজানে।

কিশোর আর মুসাও বসে নেই। ডিঙিতে করে চলে এসেছে পাথরের চড়াটার কাছে। দ্রুত উঠে পড়ল তাতে। ডিয়াকে সাহায্য করার জন্যে।

হাঙরটা যতই কাছে এল পিছিয়ে যেতে লাগল ডিয়া। মাংসের টুকরোটা নাড়ছে। মাঝে মাঝে পানিতে চুবাচ্ছে। হাঙরের নাকে গন্ধ বেশি যাওয়ার জন্যে।

আচমকা পানিতে তোলপাড় তুলে তীব্র গতিতে ছুটে এল হাঙর। মাংস খাওয়ার জন্যে হাঁ করে রেখেছে মুখ। কিন্তু ধরতে পারল না। তার আগেই নিরাপদ জায়গায় সরে গেছে ডিয়া। ধেয়ে আসায় গতি থামাতে পারেনি হাঙরটা, শরীরের সামনের দিকটা উঠে পড়ল চড়ায়। নামানোর চেষ্টা করতে গিয়ে লেজের বাড়ি মেরে পানিতে ফেনা তুলতে লাগল। কিন্তু ভারি শরীর নামিয়ে আনতে পারছে না কিছুতেই। বোনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে তৈরি হলো ডিয়া। এইবার বাগে পেয়েছে খুনীটাকে।

'বুদ্ধি আছে,' প্রশংসা করল কিশোর। 'গায়ের জোরে কাজ হবে না বুঝতে পেরে মগজ খাটিয়েছে। খুব ভাল।'

'তাকে সাহায্য করতে পারি না কোনভাবে?' মুসার প্রশ্ন।

'দরকার হলে তো করবই। দেখা যাক একা একা কতখানি কি করতে পারে। নিজেকে পুরুষ প্রমাণ করার জন্যে মানুষের মাথা খুঁজছিল সে। মানুষ খুন না করে এখন অন্যভাবে প্রমাণ করুক সে বড় হয়েছে।'

'তা ঠিক,' একমত হয়ে মাথা দোলাল রবিন। 'খুনে হাঙরের মাথাই কাটুক! কিন্তু ওইটুকুন কুড়াল দিয়ে কি পারবে?'

'দেখা যাক।'

এগিয়ে গেল ডিয়া। গায়ের জোরে কোপ মারল হাঙরের ঘাড়ে। বসল না। ফিরে এল কুড়ালের ফলা।

'দেখলে তো,' মুসা বলল। 'আগেই বলেছিলাম, হবে না।'

'দেখাই যাক,' আবার বলল কিশোর।

থামল না ডিয়া। হাঙরটা নেমে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সময় পেলে হয়তো পারেও। কিন্তু নামতে দিল না সে। কুপিয়ে চলল। অবশেষে কেটে গেল চামড়া।

হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। দুই সহকারীর দিকে তাকাল। 'কি বুঝলে?'

'ভালই। তবে এখনও অনেক বাকি। চামড়া কাটতেই এত কষ্ট, হাড় কাটবে কি ভাবে?'

'হাঙরের ঘাড়ে হাড় নেই। শুধুই কার্টিলেজ। কোমলাস্থির মত এক ধরনের জিনিস, হাড়ের চেয়ে অনেক নরম।'

ডিয়ার বিরাম নেই। সে তার কাজ করেই চলেছে। চামড়ার চেয়ে নরম মাংস। কেটে যাচ্ছে সহজেই। অবশেষে সত্যি সত্যি ধড় থেকে মাথাটা আলাদা হয়ে গেল।

'মেরেছে!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'মেরে ফেলেছে!'

'মরেছে কিনা এখনও শিওর না,' কিশোর বলল।

'মানে? মাথা আলাদা করে ফেলল, তারপরেও মরেনি?'

জবাব না দিয়ে ডিয়ার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'খবরদার, মুখের কাছে যাবে না!'

তার আশঙ্কাই ঠিক হলো। হাঁ হয়ে গেল হাঙরের মুখ, তারপর ওপরের চোয়াল ঝপ করে নেমে এল এত জোরে, ভাটিতে থেকে গাঁয়ের লোকেরাও শুনতে পেল সে-শব্দ।

'এ কি করে সম্ভব!' মুসা তো ভীষণ অবাক।

'কেন, আমাজানের পিরানহাদের কথা ভুলে গেছ? একই কাণ্ড করে ওই মাছ। মাথা কেটে ফেললেও বার বার চোয়াল ফাঁক করতে থাকে। কেটে ফেলার পরেও আরও আধঘণ্টা জীবিত থাকে। টিকটিকির লেজ কেটে ফেললে যেমন নাচতে থাকে। সাপকে মেরে ফেললে মোচড়াতে থাকে।'

গাঁয়ের দিক থেকে দৌড়ে এল নগো। উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগল, 'একটা মানুষকে পেয়েছি। বেহুঁশ হয়ে আছে। নদীর কিনারে। তোমাদের মত বিদেশী। তাই তাকে এনে জাহাজের ঘরে ভরে দিয়েছি। তাকে ওষুধ দেয়া দরকার। তোমাদের ওষুধ পেলেই বেঁচে উঠবে।'

হাঙরের চোয়াল খোলা আর বন্ধ করা চলতেই থাকল। দাঁতের কাছাকাছি না গিয়ে ওটাকে বয়ে আনতে সাহায্য করল ডিয়াকে গাঁয়ের লোকে। ধড়াস করে এনে ফেলল উঠানে। আনন্দে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করল ছেলে, বুড়ো, মেয়েরা। নাচতে লাগল মাথাটাকে ঘিরে। এত বড় একটা দানবকে যখন হত্যা করতে পেরেছে ডিয়া, মানুষ মারার আর দরকার নেই। সে পুরুষ হয়েছে একথা একবাক্যে মেনে নিল সবাই।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। ডিয়াকে স্বাগত জানাল। ক্যাপ্টেন বাউয়েনও এসে হাজির হলেন। অনেক প্রশংসা করলেন তার।

তাঁকে একধারে টেনে নিল কিশোর, কথা বলার জন্যে। জিজ্ঞেস করল, 'কেবিনে নাকি একজন লোককে রেখে আসা হয়েছে?'

'কি বলছ? আমি কিছু জানি না। নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে হাঙরের সঙ্গে ডিয়ার লড়াই দেখছিলাম।'

'তাই নাকি? তাহলে এখুনি জাহাজে যাওয়া দরকার। বোধহয় অ্যাক্সিডেন্ট করেছে লোকটা। নইলে নদীর পাড়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকবে কেন? নগো বলল, ওরা নাকি তাকে জাহাজে তুলে দিয়ে এসেছে। চলুন। লোকটার চিকিৎসা লাগবে মনে হচ্ছে।'

ষোলো

নড়ে উঠল বব। চোখ মেলল। গোঙাল। সমস্ত শরীর ব্যথা করছে। কি হয়েছে

ওর? আবছা ভাবে মনে পড়ল একটা হাঙর হামলা চালিয়েছিল ওর ওপর।

কিন্তু এখানে এল কি করে? অপরিচিত লাগছে জায়গাটা। মনে হচ্ছে সাইক্লোনের কেবিনে এনে ঢোকানো হয়েছে তাকে। একেবারে তার শত্রুদের গুহায়।

দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা আর ক্যাপ্টেন। ওদের আসতে দেখেই কম্বল মুড়ি দিয়ে ফেলেছিল বব। এগিয়ে এসে সেটা টেনে সরাল কিশোর। ধীরে ধীরে ঘুরল অন্য দু'জনের দিকে। 'দেখলে বিশ্বাস করবে না! বব অ্যাঞ্জেল!'

আবার গুঙিয়ে উঠল বব।

'দেখি তো কি হলো? গোঙায় কেন?' কিশোর বলল। বেহুঁশ হওয়ার ভান করে রইল বব। তার শার্টের বোতাম খুলল সে। কালচে নীল হয়ে আছে পুরো বুকটা। টিপেটুপে দেখল পাঁজর ভেঙেছে কিনা।

'ভাঙেনি,' দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। 'তবে ব্যথা ভালই পেয়েছে। রবিন, ফার্স্ট এইড কিটটা দাও তো।'

'দাঁড়াও,' বাধা দিলেন ক্যাপ্টেন। 'এই লোকটা খুন করতে চেয়েছিল আমাদেরকে। ধরা যখন পড়েছে, আর ছাড়া উচিত হবে না। সেবা করার দরকার নেই। মরুক। ফেলে দাও পানিতে। কে আর দেখতে আসছে? ও যেমন শয়তান, তেমনি শাস্তি হওয়া উচিত ওর।'

আর চুপ থাকতে পারল না বব। ককিয়ে উঠল, 'না, না, মারতে চাইনি! বিশ্বাস করো! তোমাদেরকে আমি মারতে চাইনি!'

'জেল থেকে বেরোলেন কি করে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ভাল আচরণের জন্যে প্যারোলে ছেড়ে দেয়া হয়েছে আমাকে।'

'আপনার ভাল আচরণ?' মুখ বাঁকাল মুসা। 'বিশ্বাস করতে বলেন?'

'কেন? আমি কি মানুষ নই? জেল যে একজন মানুষকে কিভাবে বদলে দেয় বুঝবে না,' খাঁটি দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল বব। 'জেলে অফুরন্ত সময়। ভাবনাচিন্তা করা যায়। নতুন মানুষ বানিয়ে দেয় মানুষকে। আমার বাবা ছিলেন পাদ্রী। ছোটবেলায় ধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন আমাকে। এতদিন সেটা কাজে লাগাইনি। জেলে গিয়ে আর কিছু করার ছিল না। বাইবেল আঁকড়ে ধরলাম। ঈশ্বরের কথা শোনাতে লাগলাম অন্য কয়েদীদেরকে। ঈশ্বরই আমাকে সাহায্য করেছেন জেল থেকে বেরিয়ে আসতে।'

'এখানে এসেছেন কেন?' প্রশ্ন করল কিশোর। 'আমদের পিছু না নিলে?'

'এমনি এসেছি। তোমাদের পিছু নেব কেন? তোমাদেরকে মাপ করে দিয়েছি আমি। একসময় এখানে বাস করে গেছি আমি। জেল থেকে বেরিয়েই আসার ইচ্ছেটা বড় হয়ে উঠল। এখন আর কারও ওপরই রাগ নেই আমার। একটাই কথা সব সময় বলি এখন–ঈশ্বর সবার মঙ্গল করুন।'

'ইচ্ছে হলো, আর চলে এলেন?' ববকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজি নয় মুসা।

'একসময় মুক্তোর ব্যবসা করেছি আমি এই এলাকায়…'

'নাকি স্মাগলিং করেছেন?'

'তওবা, তওবা! কি যে বলো! অনেক বড় মুক্তোর ব্যবসায়ী ছিলাম আমি। অস্ট্রেলিয়ার উপকূল আর নিউগিনি খুব ভালমতই চিনি। এখানকার জংলী লোকেরা ঈশ্বরের নাম শোনেনি। তাদের ভাল ভাল কথা শোনাতে এসেছি আমি। ডাকাত বব অ্যাঞ্জেলকে ভুলে যাও তোমরা। এখন আমি মিশনারি।'

'তাই নাকি?' ক্যাপ্টেনও বিশ্বাস করতে পারছেন না ববের কথা। খল চরিত্র জীবনে অনেক দেখেছেন তিনি। 'ভাল ভাল কথা শোনাতে, নাকি আমাদেরকে স্বর্গে পাঠাতে?'

তাঁর কথা যেন কানেই যায়নি ববের। কিশোরদের দিকে তাকিয়ে গোঁ-গোঁ করে বলল, 'তোমরা এসেছ কি করে জানব আমি?'

'জানাটা কোন ব্যাপার হলো নাকি?' কিশোর বলল। 'পত্রিকা দেখেছেন। বন্দরে খোঁজ নিলেই কোন জাহাজ কোথায় গেছে, জেনে ফেলা যায়। সব রেকর্ড করা থাকে। আপনার মত লোকের জন্যে জানাটা কিছুই না। আমাদের পিছু নিয়ে চলে এসেছেন এখানে। ছায়ার মত পেছনে পেছনে থেকেছেন। মুসার পিঠে আপনিই তীর মেরেছেন। ডাল ফেলে মারতে চেয়েছো আমাকে। নগোকে বিষ খাইয়েছেন।'

নিরীহ কণ্ঠে বলল বব, 'এসব কথা ভাবছ কি করে তাই বুঝতে পারছি না। এতটা ছোটলোক নই আমি। তা ছাড়া বললামই তো ভাল হয়ে গেছি। আমাকে দিয়ে আর ওসব খুনটুন সম্ভব নয়।'

'তাই নাকি?' ব্যঙ্গ করে বলল মুসা। 'এতটাই বদলে গেলেন?'

'হ্যাঁ। অপরাধ এখন আমার জন্যে অতীত। বহু জেল খেটেছি সারা জীবনে। আর কত? জেল আর বাইবেল পুরোপুরি বদলে দিয়েছে আমাকে। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই বুঝি না আমি এখন। অহেতুক দোষারোপ করছ আমাকে। কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না। দেশে ফিরে গিয়ে আমার নামে বদনাম করার চেষ্টা করলে তোমাদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা ঠুকে দেব আমি, মনে রেখো।' শেষের বাক্যটা হুমকির সুরে বলল সে।

দরজায় দেখা দিল ডিয়া। 'দেখো তো, এটা কি? হাঙরের পেট কেটে পেয়েছি।' একটা ব্রীফকেস উঁচু করে ধরল সে। 'চিনতে পারিনি। তাই নিয়ে এসেছি।'

'দেখি, দাও,' হাত বাড়াল বব। 'ওটা আমার।'

'নেয়ার জন্যে বেশি অস্থির মনে হয়!' সন্দেহ ফুটল কিশোরের কণ্ঠে। 'ব্যাপারটা কি? দেখা দরকার।'

প্রতিবাদের সুরে বব বলল, 'দেখো, ওর মধ্যে আমার ব্যক্তিগত জিনিস আছে। ওগুলো খোলার কোনও অধিকার নেই তোমার।' বুকের ব্যথা অগ্রাহ্য করে উঠে বসে ব্রীফকেসটা নেয়ার চেষ্টা করল সে। ঠেলে আবার তাকে শুইয়ে দিল কিশোর। মরিয়া হয়ে ওঠার চেষ্টা করল বব। পারল না।

মুসা আর বাউয়েন এসে ধরলেন। নড়তে দিলেন না ববকে।

শক্তিশালী লোক বব। এত সহজে হয়তো তাকে আটকানো যেত না। কিন্তু

চাবকিয়ে কাহিল করে দিয়েছে তাকে।
ব্রীফকেসটা খুলল কিশোর। দেখার জন্যে কাত হয়ে এল রবিন। ভেতরে একটা খাতা ছাড়া আর কিছুই নেই।
'দেখলে তো?' বব বলল। 'তোমার কোনই কাজে লাগবে না। ওটা আমার ব্যক্তিগত জিনিস। দেখি, দাও।'
খাতাটা ধরল না কিশোর। ব্রীফকেসটা আবার বন্ধ করতে যাচ্ছে, হাত নাড়ল রবিন, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, নোটবুকের মত লাগছে। ডায়ারিও হতে পারে। খুললে যখন দেখেই দিই।'
হ্যাঁ, ডায়ারিই। চকচক করে উঠল রবিনের চোখ। খুলে জোরে জোরে সবাইকে শুনিয়ে পড়তে শুরু করল:
'মনে হয় আজকে পেয়েছি কালো হারামজাদাটাকে, মুসা আমান। পিস্তল থাকলে ভাল হত, আরও শিওর হতে পারতাম। তবে জংলীদের তীর-ধনুকও কম না, বিশেষ করে ওঝার কাছ থেকে যেটা নিয়েছি। একটা কমোডো ড্রাগনের সঙ্গে লড়াই করছিল ব্যাটা, এই সময় সুযোগ বুঝে তীরটা মেরেছি। পিঠে বিঁধেছে পড়ে যেতে দেখলাম তাকে। হয়তো মরে গিয়েছে তখুনি, ঠিক বুঝতে পারিনি।'
'দারুণ তো,' মুচকি হাসল রবিন। 'তাহলে এই কাণ্ড।'
আরেকটা পাতা পড়ল সে:
'পালের গোদাটাকে খুন করার জন্যে চমৎকার একটা বুদ্ধি করেছি। ভারি একটা ডাল দিয়ে ফাঁদ পেতেছি। ওরকম ভারি ডাল মাথায় পড়লে আর বাঁচতে হবে না বাছাধনকে। লতা দিয়ে বানিয়েছি ট্রিগার। হাঁটার সময় পায়ে লাগলেই টান পড়বে, আর মাথায় পড়বে ডাল, ঘিলু বেরিয়ে যাবে...'
পরের পাতাটা ওল্টাল সে:
'হলো না। কাজ হলো না। লতাটা নগোর পায়ে বেঁধে তার মাথায় পড়তে যাচ্ছিল ডালটা। ছেলেটা লাফ দিয়ে পড়ে তাকে সরিয়ে দিল। নিজেও বেঁচে গেল, মোড়লটাকেও বাঁচিয়ে দিল। কুছ পরোয়া নেই। যাবে কোথায়? আবার চেষ্টা করব। পরের বার খতম না করে ছাড়ব না। কালোটার কি হলো বুঝতে পারছি না। সেই যে জাহাজে নিয়ে গিয়ে তোলা হলো আর দেখা নেই। মরেই গেল? নাকি মরার মত হয়ে আছে, বেরোতে পারছে না কেবিন থেকে? নাকি রাতের বেলায় লাশটা ফেলে দেয়া হয়েছে জাহাজ থেকে? তা তো করার কথা নয়। ওরা মুসলমান। কবর দেয়ার কথা। কিন্তু নতুন কোনও কবর তো চোখে পড়ল না গাঁয়ের আশপাশে। তবে কি লাশ রেখে দেয়া হয়েছে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যে? না, তা-ও নয়। তাহলে বাকি দুটো এত শান্তিতে থাকতে পারত না। বাদুড় ধরতে যেতে পারত না।'
আরও পাতা ওল্টাল রবিন। নগোর নাম লেখা রয়েছে যে পাতাটায় সেখানে এসে থামল। পড়তে লাগল:
'আজকে একটা কাজের কাজ করেছি। আইল্যানডের গাঁয়ের মোড়লের নাম নগো। ওই ব্যাটাই বিচ্ছু ছেলেগুলোকে সামলে রেখেছে, আশ্রয় দিয়েছে। নইলে হয়তো এতদিনে শেষ করে ফেলত নরখাদকের দল। আমাকে আর কষ্ট করতে

হত না। যাই হোক, ওটাকে শেষ করার ব্যবস্থা করেছি। পা টিপে টিপে ঢুকে পড়লাম তার কুঁড়েতে। কাছাকাছি তখন কোনও লোক ছিল না। তার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছি। এই জংলীগুলোর জান বড় শক্ত। কিছুতেই মরতে চায় না। তবে অনেক বেশি মিশিয়েছি। দু'জন মানুষকে মেরে ফেলার জন্যে যথেষ্ট। এখনও কালো ছেলেটাকে দেখছি না। কি যে হলো তার বুঝতে পারছি না। জীবিত থাকলেও অবস্থা খুব খারাপ। কারণ একবারের জন্যেও কেবিন থেকে বেরোতে দেখিনি। তবে ক্যাপ্টেন বাউয়েনকে মাঝে মাঝেই দেখি। তাকেও শেষ করতে হবে। নইলে ফিরে গিয়ে সব বলে দেবে। পুলিস ধরে নিয়ে গিয়ে আবার গারদে ঢোকাবে আমাকে।'

আরও কয়েক পাতা পর:

'যাক, করে এসেছি কাজ। এবার আরাম করে বসে থাকতে পারি। নিরাপদ। ব্যবস্থা হয়ে গেছে আজ রাতে। আমার ওঝা বন্ধু এক থলে গোখরা সাপের ডিম দিয়েছে আমাকে। চল্লিশটার কম হবে না। মারাত্মক বিষাক্ত সাপ। বাচ্চাগুলোও কম না। কামড়ালে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মরে যায় মানুষ। থলের মুখ খুলে কেবিনের ভেতরে ছুঁড়ে দিয়েছি। দেয়ালে বাড়ি লেগে ডিমের খোসা ভাঙার শব্দ শুনেছি। তার মানে বাচ্চা বেরোতে সময় লাগবে না। আর ছোট একটা কেবিনে চল্লিশটা মারাত্মক বাচ্চা কিলবিল করতে থাকলে কিছুতেই বাঁচতে পারবে না বিচ্ছু ছেলেগুলো। ক্যাপ্টেনটাও মরবে। আমি এখন মুক্ত। স্কুনারটা চালিয়ে নিয়ে চলে যাব থার্সডে আইল্যান্ডে। ছদ্মবেশ ধরব। নাম পাল্টে ফেলে আবার সেই পুরানো ব্যবসা শুরু করব। এখন আর ওসব করতে ভাল লাগে না। কিন্তু কি করব, বাঁচতে তো হবে।...'

ডায়ারি থেকে মুখ তুলল রবিন।

কিশোর বলল, 'হলো না, বব, আপনার কোনও আশাই পূর্ণ হলো না। প্রমাণ চেয়েছিলেন না তখন। পাওয়া গেছে। একেবারে আপনার নিজের হাতে লেখা স্বীকারোক্তি। আশা করি কোন বিচারকই এটাকে উড়িয়ে দিতে পারবেন না। আপনার কি মনে হয়?'

'যা-ই হোক, ওটা আমার জিনিস। জোর করে ছিনিয়ে নেয়ার কোনও অধিকার তোমাদের নেই। তোমরা পুলিস নও।'

'তা নই। তবে পুলিসের হাতে যদি তুলে দিই খুশিই হবে ওরা। আপনার কাছ থেকে জোর করে নেয়ার জন্যে আর আমাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে না।'

'এটা কেউটের চেয়েও ভয়ঙ্কর,' বাউয়েন বললেন। 'কোথায় রাখি? ব্রিগে ভরব?'

ব্রিগ হলো একধরনের খাঁচা; আগের দিনে কোন নাবিক কথা না শুনলে শাস্তি দেয়ার জন্যে তাকে ভরে রাখা হত তাতে। আজকাল আর ব্রিগ নেই। বাউয়েনের স্কুনারেও নেই। ব্রিগ বলতে জন্তু-জানোয়ারের খাঁচার কথা বলেছেন তিনি।

প্রতিবাদ করল না বব। জানে, করেও লাভ নেই। কেউ শুনবে না তার কথা। তবে জানোয়ারের পাশাপাশি খাঁচায় আটক থাকার কথা ভাবতে তেতো হয়ে গেল

মন।

'ব্রিগেই ঢোকাব,' কিশোর বলল। 'এখন ঢোকালে [illegible] অবস্থা হয়েছে। কিসে করল?' ববকে জিজ্ঞেস করল সে।

চোখ জ্বলছে ববের। জবাব দিল না।

'চিকিৎসা করবে নাকি?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'হ্যাঁ, করব।'

'তুমি একটা বোকা। এরকম একটা জানোয়ারের চিকিৎসা করে লাভ [illegible] ও না তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল?'

'চেয়েছিল। ধরে নিলাম ও পাগলা কুকুর।'

'কিন্তু পাগলা কুকুরকেও তো গুলি করে মারে মানুষ।'

জবাব দিল না কিশোর। ববের চিকিৎসার ব্যবস্থা করল।

সতেরো

বব কিছুটা সুস্থ হলে তাকে কেবিন থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ডেকের নিচে জানোয়ারের খাঁচায় ভরা হলো। লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করল সে, 'আমাকে কি করবে?'

'তোমার জন্যেই ব্রিসবেনে যেতে হবে আমাদেরকে,' কিশোর বলল। 'পুলিসের হাতে তুলে দেব। তারপর আমাদের পথে আমরা চলে যাব।'

হেসে উঠল বব। 'সবখানেই একটা না একটা ফাঁক থাকে, বুঝলে। আমি বেরিয়ে যাবই। কিছুতেই ওই জেলে আরেকবার ঢোকাতে পারবে না আমাকে।'

'কি করে পালাবেন, শুনি তো?'

'এখনও জানি না। তবে উপায় একটা বেরিয়ে যাবেই।'

ববের কথাবার্তা শুনে অস্থির হয়ে উঠেছেন ক্যাপ্টেন বাউয়েন। অভিযোগের সুরে কিশোরকে বললেন, 'জাহাজ তো বোঝাই করে ফেললে জন্তু-জানোয়ার দিয়ে। যা করেছ তাতে তিনটে সার্কাস চালানো যাবে। আর কত? বাড়ি রওনা হব কবে?'

'হয়ে গেছে,' কিশোর বলল। 'যা যা দরকার ছিল সবই ধরেছি। একটাই জিনিস বাকি এখন। নরখাদকের খুলি।'

'কোথায় পাবে? গাঁয়ে গিয়ে কয়েকটা মুণ্ড কেটে নিয়ে আসবে নাকি?'

'না। ওই টামবারানেই অনেক আছে। ওখান থেকে নিলেই হবে।'

'ওরা তোমাকে নিতে দেবে মনে করেছ? ভুলে যেও না, ওখানকার প্রতিটি খুলিতে একটা করে প্রেত বাস করে। মরেনি কেউ। কেবল রূপ বদল করেছে। বাস করছে এখন খুলির ভেতর। না দেয়ার সেটা একটা কারণ। আরেকটা কারণ, আদিবাসীরা বিশ্বাস করে, প্রেতকে বিরক্ত করলে বেরিয়ে এসে ওদের মারাত্মক

ক্ষতি করতে পারে।'

'সবই জানি। নেয়াটা অত সহজ হবে না। তবু, নগোর সঙ্গে আলাপ করব।'

দুই সহকারীকে নিয়ে নেমে গেল কিশোর। বিশাল কুঁড়েটার দিকে এগোল, যেটাতে শত শত বছরের পুরানো প্রেতও রয়েছে। দরজা খোলাই রয়েছে। ভেতরে ঢুকল দু'জনে। তাকে তাকে সাজানো রয়েছে অসংখ্য খুলি। কালো অক্ষিকোটরগুলো যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে। যেন জেনে গেছে ওদেরকে সরানোর মতলব করছে কিশোররা। বেড়ার একধারে স্তূপ করে রাখা হয়েছে মানুষের হাড়।

'ঢুকলেই জানি কেমন লাগে!' শিউরে উঠল মুসা। 'জংলী যে জংলীই। নইলে এভাবে রেখে দেয় কেউ? এজন্যেই বলা হয় অসভ্য।'

'অযথা গালাগাল করছো ওদের,' হেসে বলল কিশোর। 'ওরা তো শিক্ষার আলোই পায়নি। ইংল্যান্ড আমেরিকার মত জায়গাতেও যদি আজও এসব কাণ্ড করে লোকে, তাহলে এদের আর দোষ কি।'

'আমেরিকায়?'

'কেন ওসোয়ারির কথা শোনোনি?'

'ওসোয়ারি?'

'মৃতের হাড়গোড় ভরা ভল্ট। আমেরিকাতেই আছে। আর ইংল্যান্ডের হাইথে একটা গির্জা আছে। ওটার মাটির নিচে ঘরে সাজানো রয়েছে মানুষের খুলি আর হাড়। পৃথিবীতে এত বড় সংগ্রহ আর কোথাও নেই। দু'হাজারের বেশি খুলি আছে, আর আট হাজারের বেশি উরুর হাড়। গির্জার পাশের গোরস্থানে যখন আর জায়গা থাকে না তখন মাটি খুঁড়ে হাড়গোর সব তুলে এনে জমা করা হয় ওই মাটির তলার ঘরে। নতুন কবর দেয়ার জন্যে জায়গা করে দেয়া হয়। শহরের প্রতিটি লোক বিশ্বাস করে, খুলিগুলোতে ভূতের বাস। মাঝরাতের পর গির্জার কাছে গেলেই নাকি দেখা যাবে মিছিল করে গির্জার চারপাশে ঘুরছে ভূতেরা। আসলে, কিছু কিছু ব্যাপারে মানুষের মানসিকতা আজও সেই আদিমই রয়ে গেছে, তা সে শিক্ষিতই হোক কিংবা অশিক্ষিত।'

জীবিত একটা মানুষকে হেঁটে আসতে দেখে চমকে গেল মুসা। ঘরের ওই ভূতুড়ে পরিবেশে আবছা আলোতে তার মনে হলো কোনও একটা মড়া জ্যান্ত হয়ে উঠে এসেছে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

হেসে উঠল কিশোর। 'ভয় পেয়েছ? ও তো নগো।'

আরও কাছে এল মোড়ল।

'নগো,' কিশোর বলল। 'তোমাকেই খুঁজছিলাম। কয়েকটা মানুষের খুলি দরকার ছিল আমাদের। ব্যবস্থা করা যায়?'

চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবল নগো। তারপর ওদেরকে নিয়ে চলে এল টামবারানের আরেক প্রান্তে। একটা তাকে রয়েছে কয়েকটা খুলি, মানুষের মাথার চেয়ে দুই-তিনগুণ বড়।

'এত্ত বড়!' অবাক হয়ে বলল মুসা। 'দৈত্য ছিল নাকি?'

ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল খুলিগুলো কিশোর। 'এগুলো তো শুয়োরের

খুলি। মানুষের চাইছি।'

মাথা নাড়ল নগো। বুঝিয়ে বলল, 'শুয়োরের খুলিই ভাল। এতে যে প্রেত থাকে তারা ছোট, বেশি ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু মানুষের প্রেতের অনেক ক্ষমতা। খুব ক্ষতি করে দিতে পারে। জেনেশুনে তোমাদেরকে ওই খুলি দিতে পারি না আমরা। তাহলে প্রেতেরা রেগে যাবে। বেরিয়ে এসে সর্বনাশ করে দেবে আমাদের। তোমাদেরকেও ছাড়বে না।'

'কিন্তু ওদেরকে অনেক আদর করে রাখব আমরা,' কিশোর বলল। 'হয়তো আমাদের সঙ্গে যেতে পারলে খুশিই হবে ওরা। নতুন দেশ, নতুন জিনিস দেখতে পাবে। যা কখনও দেখেনি। ক্ষতি না করে আমাদের উপকারই করতে চাইবে তখন।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল নগো। 'তা মন্দ বলোনি। টামবারান থেকে কিছু মাথা সরিয়ে ফেলতে চাইছি এমনিতেও আমরা, ভয়ে পারছি না। বেশি হয়ে গেছে এখানে। আর জায়গাই নেই। নতুনদেরকে রাখব কোথায়? নতুন দেশে যদি ভাল লাগে তাহলে হয়তো রাগবে না প্রেতেরা। তবে, আমাদের গাঁয়ের কাউকে দেয়া যাবে না। তাদেরকে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে অসম্মান করতে পারব না আমরা। শত্রুদের কিছু খুলি হয়তো দেয়া যায়। একা কিছু করতে পারব না আমি। তোমরা দাঁড়াও। আমি চট করে গিয়ে আরও কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করে আসি।'

আধ ঘণ্টা পরে হাসিমুখে ফিরে এল সে। 'রাজি হয়েছে। এক শর্তে। নাচে অংশ নিতে হবে তোমাদের।'

'কিসের নাচ?' মুসা জানতে চাইল।

'প্রেতদেরকে শুভ বিদায় জানাতে হবে। নাচের পর ভালমত খাওয়াতে হবে ওদের, যাতে তোমাদের সঙ্গে যাওয়ার সময় খিদেয় কষ্ট না পায়।'

নিতে দেয়া হবে জানার পর পরই গিয়ে বাছতে আরম্ভ করল কিশোর। কোন খুলি নিলে ভাল হয়, দেখতে লাগল। তাকে সাহায্য করল রবিন।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। সে এ সব জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করার সাহস পাচ্ছে না।

রবিন বলে উঠল হঠাৎ, 'কিশোর, দেখো দেখো, একটা দৈত্যের খুলি!'

খুলিটা তুলতে গেল রবিন। বেজায় ভারী।

'মানুষের তো না। কিসের খুলি?'

কাছে এসে আগ্রহ নিয়ে দেখল কিশোর। 'ঠিকই বলেছ, দৈত্যই। মানুষ নয়। প্রাগৈতিহাসিক হাতি। ম্যামথ কিংবা ম্যাসটোডন হবে। পেল কোথায় এরা! যদি দিয়ে দিত, ভাল হত। যে কোনও মিউজিয়ামকে দিলে লুফে নেবে।'

রবিন তো একা তুলতে পারলই না, কিশোর, মুসা আর নগো হাত লাগানোর পরেও পারল না।

'এত ভারী কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'পাথর আছে। একটা অংশ পাথরেরই বলা যায়।'

হাঁ করে তাকিয়ে রইল মুসা। 'জানোয়ারের হাড়ে পাথর থাকে কি করে?'

'হাড় নিরেট নয়। অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। মাটিতে পড়ে থাকলে

তাতে পানি ঢোকে। মাটির নিচে দিয়ে বয় সেই পানি, সেজন্যে তাতে মেশানো থাকে লোহা, চুন, কোয়ার্জ, ফ্লিন্ট, অ্যাগাট। এ সব আটকে যেতে থাকে হাড়ের ছিদ্রতে। ভারী হয়ে ওঠে। দীর্ঘ দিন মাটির নিচে পড়ে থাকতে থাকতে ফসিলে পরিণত হয় হাড়। এটাও ফসিল। অ্যারিজোনার প্রেট্রিফাইড ফরেস্টে গেলে ফসিল হয়ে যাওয়া গাছ দেখতে পাবে। কাঠ বলে আর কিছু নেই ওগুলোতে। সব পাথর হয়ে গেছে। হাড়ের মত এত ফাঁক নেই গাছের ভেতরে। কাঠেরই যদি এই অবস্থা হয় হাড়ের কি হবে বুঝতেই পারছ।' নগোর দিকে ফিরে বলল, 'এটা কি আমাদের নিয়ে যেতে দেবে? মানুষের নয় যেহেতু, এর প্রেতটাও নিশ্চয় খুব ছোট।'

রাজি হয়ে গেল মোড়ল। এত বড় একটা জিনিস সরিয়ে ফেললে ভালই হয়। অনেক মানুষের খুলি রাখার জায়গা হয়ে যাবে। কয়েকজন লোককে ডেকে নিয়ে এল সে। সবাই মিলে ধরাধরি করে বের করল হাতির খুলিটা।

গাঁয়ের লোকের খুলিতে রঙ করা আছে। কিন্তু শত্রুদের মাথাকে অতটা সম্মান দেখানোর প্রয়োজন মনে করে না এরা। তাই তাতে রং করেনি। সহজেই বোঝা যায় কোনটা শত্রুর আর কোনটা নিজেদের। কিশোর বুঝিয়ে বলল, তার দেশের লোকেরা নিউ গিনির লোকের রঙ করা জিনিস দেখতে পছন্দ করবে। রঙ করে দিতে অনুরোধ করল সে। গাঁয়ের আর্টিস্টকে ডেকে আনতে লোক পাঠাল নগো।

খুশি হয়েই কাজটা করতে বসল আর্টিস্ট। ঝকঝকে উজ্জ্বল রঙ দিয়ে রঙ করে দিতে লাগল।

আগ্রহের সঙ্গে তার কাজ দেখতে লাগল কিশোর মুসা। কারখানায় বানানো রঙ আসে না এই সুদূর দুর্গম বুনো এলাকায়। সব কিছু নিজেকেই তৈরি করে নিতে হয় আর্টিস্টকে। এক ধরনের গাছের ফুলের কুঁড়ি দিয়ে লাল রঙ তৈরি করেছে সে। সাদা রঙ পেয়েছে চুনাপাথর থেকে। হলদে রঙ এক ধরনের মাটি থেকে। কালো রঙ তৈরি করেছে কয়লার গুঁড়োর সঙ্গে এক ধরনের গাছের পাতার রস মিশিয়ে। তার সঙ্গে যুক্ত করেছে নিজের থুথু আর লালা। তুলি হলো ইমু পাখির পালক।

চমৎকার হলো রঙ। এত সুন্দর করে এঁকে দিল আর্টিস্ট, দেখে মনে হচ্ছে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে খুলিগুলো। নিউ গিনির যোদ্ধারা যে সাজে সেজে যুদ্ধে যায়, সে-রকম করে দিয়েছে। অক্ষিকোটরগুলোতে গোল নুড়ি ঢুকিয়ে দিয়েছে, ফলে লাগছে আসল চোখের মতই। ভয়ঙ্কর দেখতে। দেখেই শত্রু পালাতে পথ পাবে না। উইডো স্পাইডার নামে এক ধরনের মারাত্মক বিষাক্ত মাকড়সা ধরে তার কুৎসিত কালো পা ছিঁড়ে ছিঁড়ে আঠা দিয়ে লাগিয়ে ভুরু তৈরি করে দেয়া হয়েছে।

এরপর নাচের পালা। শুভ বিদায় জানাতে হবে প্রেতকে। যারা যারা নাচবে তাদের সবাইকে চিত্রিত করে দেয়া হলো খুলিগুলোর মত করেই। মাথায় পরতে হলো বার্ড অভ প্যারাডাইজ পাখির উজ্জ্বল রঙের পালকের মুকুট। দুই তিন ফুট উঁচু। বিকট শব্দে বেজে উঠল ঢাক। নলখাগড়া দিয়ে তৈরি বাঁশি যেন ত্রাহি চিৎকার জুড়ে দিল তীক্ষ্ণ সুরে। এক ধরনের গিটারও তৈরি করা হয়েছে। কুমিরের

শক্ত চামড়া কেটে তৈরি হয়েছে ওই বাদ্যযন্ত্রের তার। বিষণ্ন টিঁয়াও টিঁয়াও আওয়াজ করতে লাগল ওগুলো। সেই সঙ্গে মিলিত হলো গানের নামে গলা ফাটানো বেসুরো চিৎকার। তাতে বাধ্য হয়ে যোগ দিতে হলো কিশোর, মুসা আর রবিনকে।

শুরু হলো নাচ।

কাণ্ড দেখে গোয়েন্দাদের মনে হলো, অত্যন্ত খুশি হয়েই এখান থেকে বিদায় নিতে চাইবে খুলির প্রেত; জীবনে আর এমুখো হওয়ার কথা ভাবতে চাইবে না।

নাচের পর খাবার পালা। আমেরিকা আর ইউরোপের নাম শুনেছে গাঁয়ের লোকে কিশোরদের মুখে। ওরা জানে ওসব 'গ্রাম' দেখতে কেমন। আরও একটা ব্যাপার বুঝে গেছে এতদিনে, ওখানকার মানুষেরা এতই 'দুর্বল', শীত থেকে বাঁচার জন্যে তাদেরকে কাপড় পরতে হয়। আর তা পরতে পরতে উজ্জ্বল বাদামীর পরিবর্তে তাদের রং হয়ে গেছে কেমন যেন ফ্যাকাসে, সাদাটে। ওরকম বাজে জায়গায় ভাল খাবার পাওয়ার কোনও বন্দোবস্ত হবে না, বুঝতেই পারছে গ্রামবাসীরা, না খেয়ে খেয়ে অভিশাপ দিতে থাকবে প্রেতেরা। আর যাই হোক, খাবার কষ্ট সহ্য করতে পারে না কেউ। কাজেই বিদায় দেয়ার আগে ভাল করে খাইয়ে তো দিতেই হবে তাদেরকে। নিয়ে আসা হলো বোঝা বোঝা খাবার। গোবরে পোকা, মাকড়সা, বিচ্ছু, বোলতা, নানা রকমের শুঁয়াপোকা আর শামুকের স্তূপ এনে রেখে দেয়া হলো খুলিগুলোর সামনে। সময় দেয়া হলো, যাতে খাবারের আত্মাগুলোকে হজম করে ফেলতে পারে ওরা। মাংস খায় না প্রেতরা, শুধুই আত্মা। অবশিষ্ট মাংসগুলো ফেলে দেয়ার কোনও মানে হয় না। সরিয়ে এনে গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল গ্রামবাসীরা।

নানা রকম ভান-ভণিতা করে অনেক কষ্টে সে-সব খাওয়ার জোর অনুরোধ ঠেকাল কিশোররা তিনজনে। মুখ ঘুরিয়ে রইল আরেক দিকে।

খাওয়ার পরে নারকেলের ফুল থেকে তৈরি এক ধরনের মদ প্রচুর গিলল গ্রামবাসীরা। ঢুলুঢুলু হয়ে এল চোখ। টলতে টলতে যার যার ঘরে ফিরে গেল ওরা। নগো, ডিয়া আর অল্প কয়েকজন রয়ে গেল ওখানে। খুলিগুলোকে জাহাজে তুলতে সাহায্য করল ওরা। ওদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল দুই গোয়েন্দা। বলল সারাজীবন মনে থাকবে ওদের কথা।

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজ ছাড়া হলো। নদীর যে পথ দিয়ে ঢুকেছিল সাইক্লোন, সে-পথেই আবার বেরিয়ে যেতে লাগল সাগরের দিকে।

আঠারো

খাবার সময় হলো। চেঁচামেচি শুরু করল বুনো প্রাণীগুলো। ওগুলোকে খাবার দিতে গেল কিশোর আর মুসা।

খাঁচার দরজা খুলে ববকেও খাবার দিল কিশোর। তারপর দরজাটা আবার

লাগিয়ে তালা আটকে দিল।

'একেবারে জানোয়ারই বানিয়ে ফেললে আমাকে?' বব বলল। 'সে-ভাবেই খাবার দিচ্ছ। হাত দিয়ে খেতে হয়। দু'একটা চামচ দিলেও তো পারো। নাকি তারও যোগ্য নই আমি?'

'জানোয়ারের সঙ্গে নিজেকে মেশালে জানোয়ারগুলোকে অপমান করবেন। ঠিক আছে, দিচ্ছি এনে চামচ,' কিশোর বলল।

একটা কাঁটা চামচ এনে শিকের ফাঁক দিয়ে বাড়িয়ে দিল সে।

'আমাকে জানোয়ার বলেছ,' শুয়োরের মত ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করল বব। 'মনে থাকবে আমার।'

'না, জানোয়ার বলিনি,' শুধরে দিল কিশোর। 'বলেছি ওগুলোর চেয়ে খারাপ। আপনার চেয়ে অনেক ভাল ওরা। ওরা সৎ, আপনি তা নন। ওরা ভান করে না আপনার মত, ছদ্মবেশ ধরার চেষ্টা করে না। আপনি একটা নিষ্ঠুর খুনী, অথচ ভান করছেন মিশনারির। খাবার প্রয়োজন না থাকলে কাউকে মারে না ওরা; কিন্তু আপনি? খুন করেন আনন্দ পাওয়ার জন্যে। ওদেরকেই খাঁচায় আটকে রাখতে কষ্ট হচ্ছে আমার। আপনার জন্যে হচ্ছে না।'

'ইচ্ছে করলে যে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারি ভেবেছ একবারও? তখন তোমাদের কি অবস্থা করতে পারি, এ সব বড় বড় কথার বদলা নিতে পারি, ভেবে দেখেছ?'

'তা আর পারবেন বলে মনে হয় না। আর যদি পারেনই, তাতে ভালটা কি হবে শুনি? তীর এখান থেকে দশ মাইল দূরে। কোথায় রয়েছি জানেন? যেখান থেকে মাইকেল রকফেলার ডিঙি থেকে নেমে সাঁতরানো শুরু করেছিল। তীরে পৌঁছতে পারেনি সে। কেন পারেনি কেউ বলতে পারে না। কুমিরে খেয়ে ফেলেছে হয়তো। আপনি কতটা ভাল সাঁতারু জানি না। তবে পালানোর চেষ্টা করবেন না। স্রেফ মারা পড়বেন।'

'পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু মাইকেলটা ছিল একটা গাধা। আমি ওর মত বোকা নই। জানো, অস্ট্রেলিয়ার ওই জেল থেকে একমাত্র আমিই পালাতে পেরেছি। তার মানে অন্যগুলোর চেয়ে আমার বুদ্ধি বেশি। নইলে এক ডজন বন্দুকধারী গার্ডের চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে চলে এলাম, কিছুই করল না ওরা। আর তুমি হাঁদারাম ভাবছ সামান্য একটা খাঁচায় ভরে আটকে রাখতে পারবে আমাকে। দাঁড়াও, আবার পালাব আমি। তোমাদের তিনজনকে শেষ না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।'

'যখন করতে পারবেন তখন বিশ্বাস করব।'

কেবিনে ফিরে এল কিশোর। মুসা আর রবিন ঘুমিয়ে পড়েছে।

জাহাজ চালাতে চালাতে ভোরের দিকে ক্লান্ত হয়ে ক্যাপ্টেনেরও একটু তন্দ্রামত এসেছিল। ছুটে গেল ধোঁয়ার গন্ধে। চোখ মেলে দেখলেন আগুন লেগেছে জাহাজে। প্রচণ্ড চেঁচামেচি শুরু করেছে জানোয়ারগুলো।

কিশোররাও জেগে গেছে। তাড়াতাড়ি কম্বল সরিয়ে ছুটল কি হয়েছে দেখার জন্যে।

...নিচ থেকে উঠছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ফোরপিকে আগুন জ্বলছে। রাতে ... ছিল না বলে প্রধান পালটা নামিয়ে রাখা হয়েছিল। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি খাঁচার কাছে ছুটে গেল কিশোর। বব যেটাতে ছিল ওটার দরজা খোলা। দরজার কাছেই পড়ে রয়েছে একটা কাঁটাচামচ। ইচ্ছে করেই ফেলে রেখে গেছে সে, যেন ওদেরকে ব্যঙ্গ করার জন্যেই। ওই চামচ দিয়েই তালা খুলে পালিয়েছে বব।

পালটা তো শেষই। ওটাকে আর বাঁচানোর চেষ্টা করল না ওরা। বালতি বালতি পানি তুলে এনে ঢালতে শুরু করল আশপাশে আর নিচে যেখানে আগুন লেগেছে সে-সব জায়গায়। কিন্তু কমার লক্ষণ নেই, আরও যেন বাড়ছেই আগুন।

থামল না ওরা। চেষ্টা চালিয়েই গেল।

কিশোর বলল, 'জলদি ওর খোঁজ করা দরকার। সাঁতরে তীরে যাওয়ার চেষ্টা করছে নিশ্চয়। কুমিরের খাবার হয়ে যাবে।'

'মরুকগে না,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'খাক কুমিরে। ওকে নিয়ে এত ভাবছ কেন?'

'জেনেশুনে তা করতে পারি না। হাজার হোক, মানুষ তো। আপনারা দু'জন আগুন নেভান। আমি ডিঙিটা নিয়ে যাচ্ছি।'

ছুটল সে। কিন্তু ডিঙিটা যেখানে রাখা ছিল সেখানে নেই। 'হায় হায়, ডিঙি তো নিয়ে চলে গেছে! অবস্থা তো এখন আমাদেরই খারাপ হয়ে গেল দেখছি। আগুন নেভাতে না পারলে নৌকা নিয়ে যে ভেসে পড়ব তারও উপায় রইল না! মেরে তো রেখে গেল আমাদেরকেই! তার প্রতিজ্ঞা সে রেখেছে।'

আর কিছু করার নেই। আবার আগুন নেভানোয় মন দিল চারজনে। প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল। কাঠ পোড়ার গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। সে-সব শোঁকারও যেন সময় নেই। পানি ছিটিয়ে চলেছে ওরা। অবশেষে পরাজিত হতে আরম্ভ করল আগুন।

ঠিকই বলেছে বব। আসলেই সে চালাক। বুদ্ধি আছে মাথায়। পালিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। তার প্রতিজ্ঞা সে রেখেছে।

ক্যাপ্টেনের কাছে এসে বলল কিশোর, 'জাহাজ নিয়ে খুঁজব নাকি?'

'কি দরকার?' রেগেই গেলেন ক্যাপ্টেন। 'তোমার জন্যেই এ রকম হলো। তখুনি বলেছিলাম, দাও পানিতে ফেলে। মরুক। না, সেবাযত্ন করে বাঁচালে। এখন আরেকটু হলে আমরাই মরেছিলাম। পালটাও শেষ করে দিয়ে গেল।'

'ইঞ্জিনটা তো আছে,' গলায় জোর নেই কিশোরের। আসলেই আছে কিনা, না সেটাও নষ্ট করে দিয়ে গেছে জানে না। তাড়াতাড়ি দৌড় দিল। চলে এল ইঞ্জিন রুমে। স্টার্ট দিতে গিয়ে লক্ষ করল, ওটাকেও খারাপ করার চেষ্টা করেছিল বব, কিন্তু ততটা সময় পায়নি। তবু যা করেছে, সেটুকু মেরামত করতেই দেড় ঘণ্টা ব্যয় হয়ে গেল।

পালের ওপর ভরসা করেই চলে এসব স্কুনার জাতের জাহাজ। সেটা শেষ। ইঞ্জিনের জোরে সুবিধে হয় না তেমন। ধুঁকতে ধুঁকতে চলল। একটাই ভরসা, থামবে না, কোনমতে পৌঁছে যেতে পারবে কোনও বন্দরে। সেখান থেকে পাল

জোগাড় করে নিলেই ঠিকমত চলা যাবে আবার।

জাহাজ চলছে। সামনের অবারিত জলরাশির দিকে তাকিয়ে এক সময় বিড়বিড় করল কিশোর, 'মরবে ও। ওই ডিঙি নিয়ে আর কদ্দূর। জঙ্গলের দিকে গেলে ধরবে নরখাদকেরা, আর অস্ট্রেলিয়ার দিকে গেলে পুলিস। বাঁচতে পারবে না।'

'ওর জন্যে কষ্ট হচ্ছে মনে হয় তোমার?' ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলেন।

'তা কিছুটা যে হচ্ছে না তা নয়,' স্বীকার করল কিশোর।

'আশ্চর্য ছেলে তো! বার বার মেরে ফেলতে চাইল যে লোক তার জন্যেও...' কথাটা শেষ করলেন না বাউয়েন।

কিশোরও জবাব দিল না। তাকিয়ে রয়েছে পানির দিকে। ভাবছে, বেঁচে যদি যায় বব অ্যাঞ্জেল, আবার দেখা হবে। প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষান্ত হবে না লোকটা। আবার আসবে! আসবেই!